ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

জানুয়ারি ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

ব্যাঙ্কিং সংস্কার

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
অতীশা কুমার

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র : এযাবৎ তথা ভবিষ্যৎ
বিবেক কুমার, সংকেত ট্যান্ডন, শুভদা রাও

অনুৎপাদক সম্পদ : সমাধান কোন পথে ?
দীপক নারাঙ্গ

বিশেষ নিবন্ধ
ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের পুনর্মূলধনীকরণ
আশুতোষ কুমার

অন্যান্য নিবন্ধ
ভারতমালা : মহাসড়ক উন্নয়নে নবদিগন্তের সূচনা
যুদ্ধবীর সিং মালিক

ফোকাস
দেউলিয়া বিধি : সমস্যা মোকাবিলার নতুন পথ
ইন্দিভজল ধাসমানা

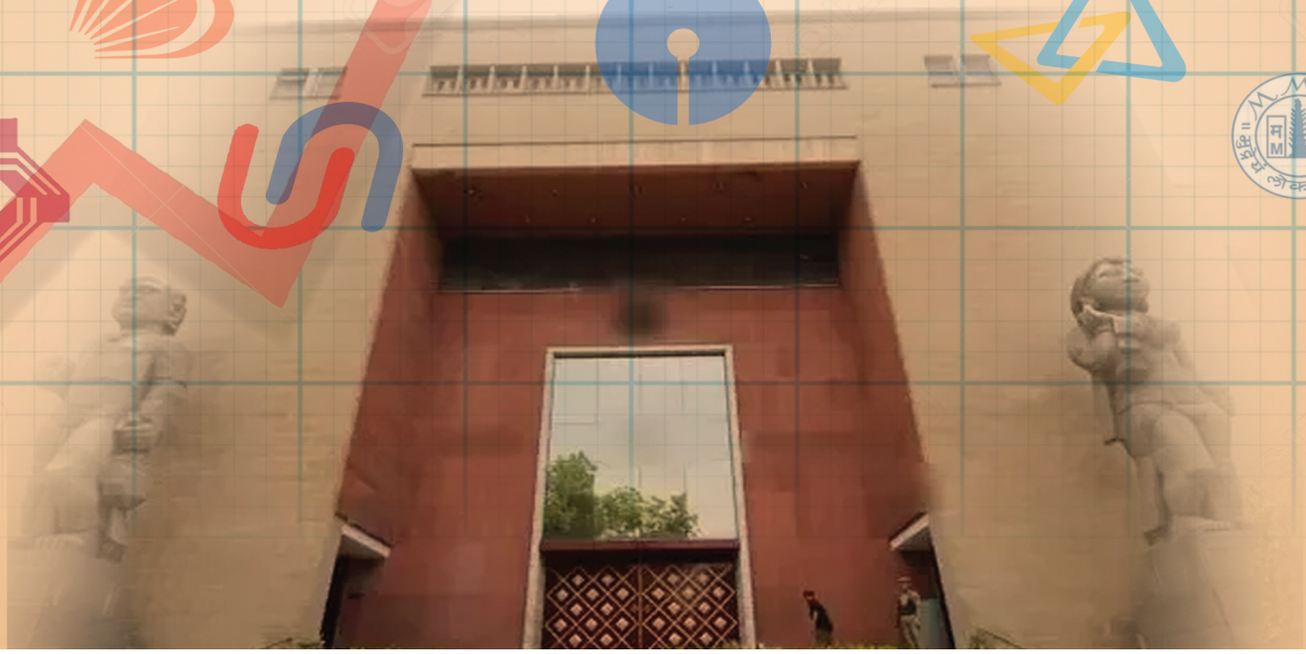

জাতির উদ্দেশে আইএনএস কালভরি উৎসর্গ

গত ১৪ ডিসেম্বর মুম্বাইতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজ, আইএনএস কালভরি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আইএনএস কালভরি সাবমেরিনটিকে "মেক ইন ইন্ডিয়া" কর্মসূচির সার্থক উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেন। যারা এই ডুবোজাহাজের নির্মাণ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সকলের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

ফ্রান্স ও ভারতের মধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব যে দ্রুত হারে বাড়ছে, এই সাবমেরিন নির্মাণকে তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, আইএনএস কালভরি ভারতীয় নৌসেনাকে আরও সামর্থ্য জোগাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একুশ শতককে 'এশিয়ার শতক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একথার সাথে তিনি আরও যোগ করেন, এটাও নিশ্চিত যে, একুশ শতকে উন্নয়নের রাস্তাটা এই ভারত মহাসাগরের পথ ধরেই এগোবে। সেই কারণেই সরকারের নীতিতে ভারত মহাসাগর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে।

'সাগর' বা SAGAR—Security and Growth for All in the Region (অর্থাৎ, এই অঞ্চলের সকলের জন্য নিরাপত্তা ও বৃদ্ধি)—শব্দবন্ধটির মধ্যে দিয়েই এই ভাবনা সুস্পষ্টতর হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোটা পরিবেশটাই গত তিন বছরে পালটে যেতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, আইএনএস কালভরি নির্মাণের সময় যে দক্ষতা অর্জন করা গেছে তা ভারতের জন্য এক অনবদ্য সম্পদ।

শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ সানাতে দক্ষ, ডিজেল তথা বিদ্যুৎ শক্তি চালিত এই ডুবোজাহাজটিকে মাজাগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য তৈরি করেছে। এধরনের মোট ছ'টি সাবমেরিনকে ভারতীয় নৌবাহিনীতে শামিল করা হবে। আইএনএস কালভরি তার প্রথমটি। "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগের জবরদস্ত সাফল্যের প্রতীকও বটে। ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হাতে নেওয়া হয়েছিল এই প্রকল্প।❑

জানুয়ারি, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট — অতীশা কুমার — ৫
- ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র : এযাবৎ তথা ভবিষ্যৎ — বিবেক কুমার, সংকেত ট্যান্ডন, শুভদা রাও — ১০
- অনুৎপাদক সম্পদ : সমাধান কোন পথে? — দীপক নারাঙ্গ — ১৪
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক চাঙ্গা করতে মিশন ইন্দ্রধনুষ — ডি. এস. মালিক — ১৮
- প্রসঙ্গ ক্রেডিট রেটিংয়ে ভারতের সাম্প্রতিক উন্নতি — প্রভাকর সাহু, ভবেশ গর্গ — ২১
- গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা : সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ — মঞ্জুলা ওয়াধাওয়া — ২৬
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ব্যাঙ্কের ভূমিকা — চরণ সিং, শিবকুমার রেড্ডি কে. — ৩২
- ব্যাঙ্কিং পরিষেবার উন্নতিতে অশেষ কাজে আসবে 'বিগ ডেটা' — চতুর্ভুজ বারিক, শ্রীকান্ত শর্মা — ৩৯
- ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক : ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব — — ৪৩
- অনলাইন ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সাইবার সুরক্ষা — আর. সুব্রহ্মণীকুমার — ৪৭

বিশেষ নিবন্ধ

- ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের পুনর্মূলধনীকরণ — আশুতোষ কুমার — ৫২

ফোকাস

- দেউলিয়া বিধি : সমস্যা মোকাবিলার নতুন পথ — ইন্দিভজল ধাসমানা — ৫৫

অন্যান্য নিবন্ধ

- ভারতমালা : মহাসড়ক উন্নয়নে নবদিগন্তের সূচনা — যুদ্ধবীর সিং মালিক — ৫৯

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো — ৬৩
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৬৫
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৬৬
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৬৭
- যোজনা কলাম — সংকলন : যোজনা ব্যুরো — ৮৬
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

ব্যাঙ্কিং সংস্কার

সঞ্চয়ের ধ্যানধারণার অস্তিত্ব গোটা বিশ্বজুড়ে সর্বকালে সব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেই ছিল। প্রাচীন যুগে সব দেশেই ঘড়া-জাতীয় পাত্রে স্বর্ণমুদ্রা জমিয়ে তা মাটির নিচে গর্ত করে পুঁতে রাখার চলন ছিল আমব্যাপার। প্রজাদের কাছ থেকে নানারকম কর বা শুল্কের আকারে অর্থ আদায় করে তা রাজকোষাগারে জমা করা হ'ত। অধীনস্ত ভূস্বামীদের তথা সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থও রাজকোষাগারের কলেবর বৃদ্ধি করত।

আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার চলন হওয়ার সাথে সাথে সঞ্চিত টাকাপয়সার দেখভালের বিষয়টি ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে ন্যস্ত হয় ব্যাঙ্কের হাতে। মানুষ দেখেন, ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের কষ্টার্জিত টাকাপয়সা ও গয়নাগাটির মতো মূল্যবান সম্পত্তি ভল্টের সুরক্ষাকবচের ঘেরাটোপে রাখা অনেক বেশি নিরাপদ। তার উপর ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে সুদ মেলে, অর্থাৎ তা অতিরিক্ত আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাঙ্ক আবার তাদের তরফে মানুষের সেই আমানত শেয়ার ইত্যাদি নানা খাতে বাজারে বিনিয়োগ করে। এভাবেই ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং ও কর্পোরেট ব্যাঙ্কিংয়ের এক নতুন ব্যবস্থার সূচনা হয়। সরকারি কোষাগারের অর্থও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই জমা পড়ে, যা ধীরে ধীরে আর্থিক নীতির নিয়ামক হয়ে ওঠে। আজকের দিনে, একটি কেন্দ্রীয় নিয়ামক ব্যাঙ্ক ব্যতীত কোনও অর্থনীতির অস্তিত্বের কল্পনা করা যায় না। ভারতের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব পালন করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। শুধু সরকারের তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজই নয়, তা দেশের আর্থিক নীতির নিয়ামক, ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার, কারেন্সি বা ব্যাঙ্ক নোটের নিয়ামক এমন বহু ভূমিকা পালন করে।

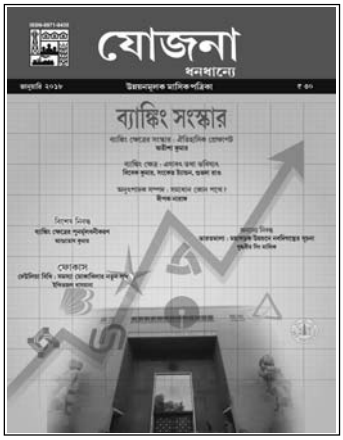

ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সূচনা হয় ছোটো মাপের বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাত ধরে। পরে নানা কারণে এর মধ্যে কিছু ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলে, কয়েকটি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আবার গ্রাহকদের আমানত আত্মসাৎ করে গা-ঢাকা দেয় ব্যাঙ্কের মালিকপক্ষ। এভাবে মানুষ তাদের কষ্টার্জিত জমানো টাকা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হতে থাকায় সরকার ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাঙ্কের কোনও লোকসানের দরুন গ্রাহকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না, তথা ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আমানতের অপব্যবহার করবে না, তা সুনিশ্চিত করে এই যুগান্তকারী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। সময়ের সাথে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের রাশ বজায় রাখতে অন্যান্য আরও নিয়ামক ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য গঠিত নরসিমহম কমিটির সুপারিশগুলি এই দিশায় আরেকটি বড়ো মাপের পদক্ষেপ বলে প্রমাণিত। তার পর থেকে ধাপে ধাপে একগুচ্ছ সংস্কারমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার মানোন্নয়ন তথা প্রশাসনিক সংস্কারের দিকে নজর দিয়ে।

এর পর একটা সময় আসে যখন সরকার উপলব্ধি করে, বাকি বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবণতার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে হলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকেও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া জরুরি। সেই সূত্রেই HDFC, ICICI, অ্যাক্সিস এবং ইয়েস ব্যাঙ্কের মতো বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে এদেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় এসব বেসরকারি ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের সন্তুষ্টিবিধানে অধিক সফল। কর্পোরেট ব্যাঙ্কিং এবং প্রথাগত খুচরো ব্যাঙ্কিং ব্যবসা, উভয় ক্ষেত্রেই এরা বাজারে মধ্যমণি হয়ে ওঠে। বেসরকারি ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরনধারণ থেকে সুলুকসন্ধান পেয়েই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিও আরও বেশি বেশি করে গ্রাহক-বান্ধব হয়ে উঠতে শুরু করে তথা নিজেদের কর্মসংস্কৃতিতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি চালু করার দিকে নজর দেয়।

সফলভাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা চালানোর পথে এক মস্ত বড়ো বাধা অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা সংক্রান্ত সমস্যা। এদেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে, তা রাষ্ট্রায়ত্ত হোক বা বেসরকারি ব্যাঙ্কই হোক, ব্যাপক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমস্যা। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের এই বড়োসড়ো ইস্যুটির সমাধানের জন্য সরকার ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের জন্যও মিশন ইন্দ্রধনুষ নামে এক সাত দফা যোজনার কথা ঘোষণা করেছে। এই যোজনার আওতায় অনুৎপাদক সম্পদের বোঝার ভারে ধুঁকতে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে যেমন এককালীন পুঁজি ঢালা হবে, তেমনি নজর দেওয়া হচ্ছে বোর্ড স্তরে নিয়োগের জন্য ব্যাঙ্কিং বোর্ড ব্যুরো গঠন তথা ব্যাঙ্কের কাজকর্মে দায়বদ্ধতা আনার জন্য নজরদারি কাঠামো গঠনের উপর। এছাড়াও অনুৎপাদক সম্পদের ইস্যুটির সমাধানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে নতুন দেউলিয়া বিধি লাগু করা হয়েছে।

আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায়, বিশেষ করে সীমিত নগদের অর্থনীতি ও ব্যাঙ্কিং লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির বাড়বাড়ন্তের যুগে সাইবার নিরাপত্তার প্রশ্নটি এক বড়ো মাথাব্যথার কারণ। সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ, IIT-র মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলি সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুগুলির সমাধানে সচেষ্ট। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় জুড়ে, বিশেষ করে দেশের নিম্নবর্গের মানুষদেরকে দেশের অর্থনীতিতে শামিল করতে সরকারের "প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা" ও DBT বা "সরাসরি উপকার হস্তান্তরের" মতো নানাবিধ উদ্যোগ খুব কাজে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততাও বেশ চিন্তাজনক। দেশের দূরদূরান্তের বহু গ্রামীণ এলাকাই ব্যাঙ্কিং পরিষেবার নাগালের বাইরে রয়ে গেছে এযাবৎ। গাঁয়ের অনেক মানুষজনই এখনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে জুড়তে অস্বস্তিবোধ করেন। হাতের নাগালে ব্যাঙ্ক না থাকা যেমন এর একটি কারণ, পাশাপাশি গ্রামে সাক্ষরতার হারে কমতিও তাতে ইন্ধন জোগায়। এই সমস্যার সমাধানে সরকারের অভিনব উদ্যোগ, ব্যাঙ্কিং করেসপন্ডেন্ট বা ব্যাঙ্ক মিত্রদের নিযুক্তি। এরা ব্যাঙ্কের তরফে গ্রামীণ জনসংখ্যাকে পরিষেবা প্রদানের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে।

এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কারের ধারণাটি হয়তো অর্থনীতিবিদ এবং নীতি প্রণেতাদের গণ্ডির মধ্যে পড়ে। কিন্তু ব্যাঙ্ক এমন এক জায়গা যেখানে মানুষ নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ বিশ্বাস করে জমা রাখে। তার আমানত ব্যাঙ্কে সুরক্ষিত আছে, এই আস্থাবোধ মানুষকে চিন্তামুক্ত করে। প্রতিটি মানুষের জীবন থেকে এই উৎকণ্ঠা দূর করতে কর্মদক্ষ মজবুত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাই মূল চাবিকাঠি।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অতীশা কুমার

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রাধান্য। এই ক্ষেত্রের মোট সম্পদের ৭০ শতাংশের বেশি রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি হাতে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম সামগ্রিকভাবে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কাজকর্মকেই প্রতিফলিত করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিই অনুৎপাদক সম্পদের প্রধান উৎস এবং এই সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি দিনকে-দিন আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মার্চে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ যেখানে ছিল ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৭ সালের জুনে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৩৩ লক্ষ কোটিতে।

সাধারণ গৃহস্থই হোক বা বাণিজ্যিক সংস্থা, উভয় ক্ষেত্রেই ঋণের অন্যতম প্রধান উৎস হল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। অর্থ বাজারে সুষ্ঠু কাজকর্ম সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের আকার, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং ব্যাঙ্কের মূলধনী ভিত্তি (ক্যাপিটালাইজেশন) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কের আধিক্য। দুর্বল আর্থিক ভিত্তি, অনুৎপাদক সম্পদের বিপুল বোঝা তথা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রাধান্যই বর্তমানে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যাগুলি থাকার কারণে একদিকে শিল্পক্ষেত্রে ঋণের জোগানে যেমন বাধা আসে; তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজির চাহিদা মেটাতেও ব্যাঙ্কগুলি অপারগ হয়ে পড়ে। দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করতে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি, এই ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি, ঋণের উৎস হিসাবে ব্যাঙ্কগুলির ওপর থেকে চাপ কমাতে কর্পোরেট বন্ডের বাজারকে আরও চাঙা করা।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সংস্কারের ইতিহাস

১৯৯১ সালের আগে পর্যন্ত ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে জাতীয়করণের পালা চলে। ১৯৬৯ সালে ৫০ কোটি টাকার বেশি সঞ্চয় রয়েছে এমন ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ ঘটিয়েছিল সরকার। ব্যাঙ্কগুলির ৮০ শতাংশেরও বেশি শাখা সেই সময় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

১৯৮০ সালে, দেশজুড়ে ২০০ কোটিরও বেশি সঞ্চয় রয়েছে এমন ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ ঘটানো হয়। প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের রাশ ছিল সরকারের হাতে। ওই সময়কালে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাঙ্কের সংখ্যাটা মোটামুটি একই ছিল। ১৯৬৯ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় ব্যাঙ্কগুলি যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমন আরও বেশি করে মানুষ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আসতে থাকেন। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যাও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

১৯৯১ সালের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা ভীষণভাবে কমে যায়। গ্রাহক পরিষেবার মানও পড়ে যায়। সেইসঙ্গে আর্থিক লোকসানে ধুঁকতে থাকে ব্যাঙ্কগুলি। ১৯৯১ সালে সরকার আর্থিক উদারীকরণের পাশাপাশি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্যও একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেয়। ১৯৯১ সালে এম. নরসিংহম-এর সভাপতিত্বে গঠিত আর্থিক ব্যবস্থা বিষয়ক কমিটি যেসব সুপারিশ করে, তার মধ্যে ছিল ব্যাঙ্কের সহায়সম্পদ বাড়াতে স্ট্যাটিউটরি লিক্যুইডিটি রেশিও (SLR) এবং নগদ জমার অনুপাত (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও, CRR) কমানো, বাজারের ওঠা-পড়ার ওপর নির্ভর করে সুদের হার নির্ধারণ, প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দেশের বাজারে

[লেখক নীতি আয়োগের অর্থনীতিবিদ। আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যানের দপ্তরে নিযুক্ত রয়েছেন। ই-মেল : atisha.kumar@nic.in]

বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির প্রবেশকে আরও সুগম করে তোলা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের (PSB) সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো। এই কমিটির বেশ কয়েকটি সুপারিশের রূপায়ণ ঘটানো হয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে স্ট্যাটিউটরি লিক্যুইডিটি রেশিও (SLR) এবং নগদ জমার অনুপাতের (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও, CRR) হার কমানো, বাজারের ওপর নির্ভর করে সুদের হার নির্ধারণ এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাঙ্কগুলিকে দেশের বাজারে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া।

১৯৯৮ সালে নরসিংহম-এর সভাপতিত্বে গঠিত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার বিষয়ক কমিটি দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে মজবুত করতে আরও একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে। যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আইনি ব্যবস্থা, মূলধনের জোগান এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সংযুক্তির বিষয়ে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এর পাশাপাশি, আরও বেশি করে প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকে পরিচালনার ব্যাপারে আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে ১৯৯৮ সালে গঠিত এই কমিটি।[১]

১৯৯১ সাল থেকে এর মধ্যে গৃহীত বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে যেমন মজবুত করেছে তেমনি এই ক্ষেত্রের কাজকর্মের মানেরও উন্নতি ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৯০ সালের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র থেকে যেখানে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-র ৫১.৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়েছিল; সেখানে ২০০০ সালে এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় GDP-র ৫৩.৪ শতাংশে। তবে সেই অনুপাত অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। ২০০০ সালে GDP-র নিরিখে ঋণের এই অনুপাত চিনে ছিল ১৩৩ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ১৪৩ শতাংশ এবং থাইল্যান্ডে ১২২ শতাংশ।

২০০০-এর দশকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য আরও বেশ কিছু কমিটি গঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে আরও বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার বিষয়ক কমিটি (কমিটি অন ফিনান্সিয়াল সেক্টর রিফর্মস) এদেশের বৃহত্তর আর্থিক ব্যবস্থা ও নিয়ামক ব্যবস্থাপনা, 'ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন' বা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং দেশের ভেতরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে সুপারিশ করে।[২] ২০১৪ সালে গঠিত হয় 'কমিটি টু রিভিউ গভর্ন্যান্স অব বোর্ডস অব ব্যাঙ্কস ইন ইন্ডিয়া' (পি. জে. নায়েক) কমিটি। দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র মূলত যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে নিয়ে গঠিত, সেগুলির পরিচালন ব্যবস্থার মান উন্নত করার বিষয়ে প্রধানত সুপারিশ করে এই কমিটি।

"ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র রুগ্ন হয়ে পড়ায় শিল্পক্ষেত্রে ঋণের জোগানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে শিল্পক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ৫.৬ শতাংশ। সেখানে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ কমে হয়েছে ৫.১ শতাংশ। তাছাড়া অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ যত বাড়বে বাসেল-III-এর শর্ত মেনে আরও বেশি পরিমাণে মূলধনের জোগানও বাধা পাবে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে এই শর্তগুলি বলবৎ হবে।"

বর্তমান চিত্র : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রাধান্য ও অনুৎপাদক সম্পদ

আজকের দিনেও ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রাধান্য। এই ক্ষেত্রের মোট সম্পদের ৭০ শতাংশের বেশি রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি হাতে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম সামগ্রিকভাবে দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কাজকর্মকেই

সারণি-১
মোট অগ্রিমের তুলনায় স্ট্রেসড অগ্রিমের অনুপাত

	মার্চ, ২০০৮	মার্চ, ২০১৭
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	৩.৫	১৫.৬
বেসরকারি ব্যাঙ্ক	৪.২	৪.৬
বিদেশি ব্যাঙ্ক	৩.৪	৪.৫
সব ব্যাঙ্ক মিলে	৩.৫	১২.১

সূত্র : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

প্রতিফলিত করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিই অনুৎপাদক সম্পদের প্রধান উৎস এবং এই সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ২০১৬ সালে এই অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ছিল মোট সম্পদের ৮৮ শতাংশ। পরিস্থিতি দিনকে-দিন আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ২০১৫ সালের মার্চে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ যেখানে ছিল ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৭ সালের জুনে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৩৩ লক্ষ কোটিতে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে স্ট্রেসড অ্যাসেটের বা অনুৎপাদক সম্পদ, পুনর্গঠিত ঋণ ও হিসেব খাতা থেকে মুছে ফেলা ঋণের যোগফল প্রায় ১৬ শতাংশ; যা বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় তিনগুণ বেশি। অনুৎপাদক সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি রুগ্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে সম্পদ থেকে আয় (রিটার্ন অব অ্যাসেটস) এবং ইক্যুইটি থেকে আয়, দুই-ই কমছে। এক দশকের মধ্যে, ২০১৬ সালে প্রথম বারের মতো এই দুই অনুপাত ঋণাত্মক অঙ্কে পৌঁছে গেছে।

বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির কাছেও আজকের দিনে অনুৎপাদক সম্পদ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চে, দেশের সমস্ত তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫০১ লক্ষ কোটি টাকা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের গুণগত মান ও লাভের সম্ভাবনা,

দুই-ই কমেছে। ২০০৮ সালের মার্চ থেকে ২০১৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রদত্ত মোট অগ্রিমের মধ্যে উদ্ধার হওয়ার কম সম্ভাবনাযুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ অগ্রিমের পরিমাণ ৩.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.১ শতাংশ। ২০১৬-'১৭ সালের প্রথম অর্ধে বার্ষিক ভিত্তিতে কর প্রদানের পর ব্যাঙ্কগুলির লাভের অঙ্ক (PAT) ক্রমেই কমেছে। ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া, হিসেবের খাতা থেকে ঋণের অঙ্ক মুছে দেওয়া, এবং সুদবাবদ মোট আয় কমার ফলেই মূলত ব্যাঙ্কগুলির লাভের পরিমাণ কমেছে।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র রুগ্ন হয়ে পড়ায় শিল্পক্ষেত্রে ঋণের জোগানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে শিল্পক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ৫.৬ শতাংশ। সেখানে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ কমে হয়েছে ৫.১ শতাংশ। তাছাড়া অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ যত বাড়বে বাসেল-III-এর শর্ত মেনে আরও বেশি পরিমাণে মূলধনের জোগানও বাধা পাবে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে এই শর্তগুলি বলবৎ হবে।

এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় সরকার ব্যাঙ্কগুলিতে মূলধন ঢালছে। ২০১৫-'১৬ সালের ইন্দ্রধনুষ পরিকল্পনার আওতায় ব্যাঙ্কগুলিতে পুঁজি ঢালার সরকারি এই পদক্ষেপ লাগাম ছাড়া হারে অনুৎপাদক সম্পদ সৃষ্টি ও অর্থনীতিতে তার বিরূপ প্রভাবের কথাই স্বীকার করে নেয়। অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ বাড়তে থাকলে ঋণদানের পরিমাণ কমে যায়, ব্যাঙ্কের লাভ তলানিতে ঠেকে; সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত মূলধনের অনুপাত (ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেট) হ্রাস পায়। এই সমস্ত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে গত ২৪ অক্টোবর ব্যাঙ্কগুলিতে মোট ২.১ লক্ষ কোটি টাকার পুঁজি ঢালার এক পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে সরকার। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পুঁজির শুধু যে ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হবে তাই নয়, ব্যাঙ্কের হিসেবের খাতা থেকে অনাদায়ী ঋণের অঙ্ক মুছে নতুন করে হিসাব

চিত্র-১
GDP-র শতাংশের হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা সম্পদের পরিমাণ (২০১৫)

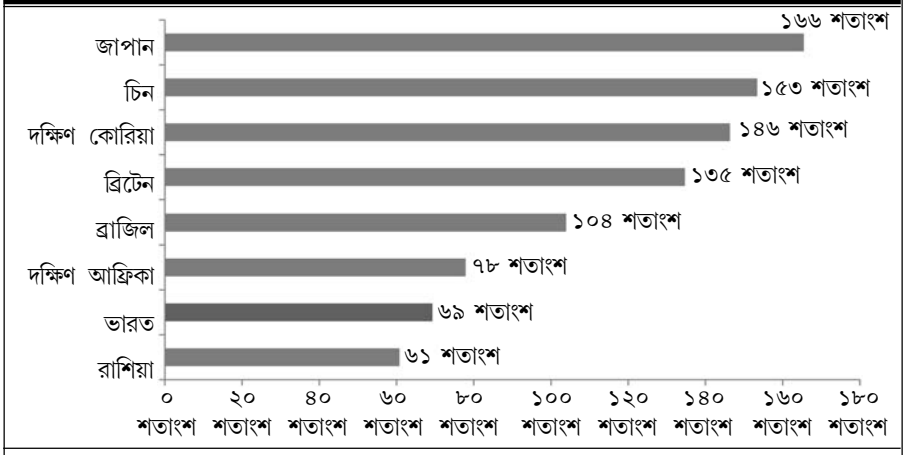

সূত্র : ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটিকসটিক্স ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড

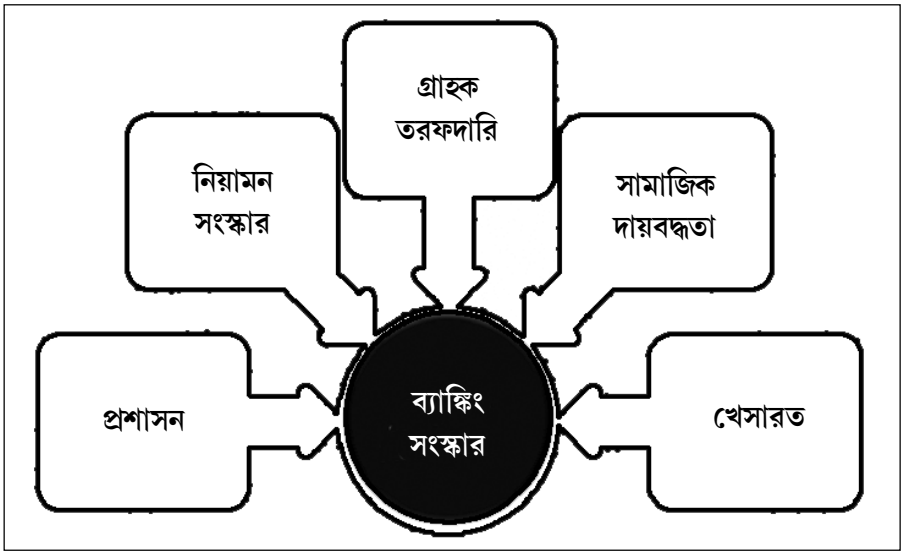

শুরু করা যাবে।

ব্যাঙ্কগুলিতে নতুন করে পুঁজি ঢালার পাশাপাশি ইন্দ্রধনুষ পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালন ব্যবস্থাকে মজবুত করা এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে উৎসাহদানের ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথাও রয়েছে। এই পরিকল্পনায় সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল, দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করার জন্য একটি কাঠামো গড়ে তোলা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির চেয়ারম্যান এবং সিইও-র ভূমিকাকে আলাদা করা, নিয়োগ ও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য একটি ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো গঠন ইত্যাদি। তবে এই সুপারিশগুলির রূপায়ণ এখনও বাকি রয়ে গেছে। অনুৎপাদক সম্পদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে দেউলিয়া বিধিও (ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড) অনেকাংশে কার্যকর হয়ে উঠবে। সেই অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক যাতে প্রোমোটারদের সঙ্গে বসে একটা মীমাংসায় আসতে পারেন সেজন্য ২৭০ দিন সময় দেওয়া হয়। আর যদি তা সম্ভব না হয়, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্পদ অধিগ্রহণ করার সংস্থান রয়েছে এই বিধিতে।

বিশ্বের প্রেক্ষাপট : আর্থিক অবস্থা ও প্রতিযোগিতা

আর্থিক ভিত্তি বা ব্যাঙ্কের আয়তন, বাজারে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি এবং আর্থিক ফলাফলের নিরিখে ভারতের ব্যাঙ্কগুলি বিশ্বের অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আর্থিক

ভিত্তি মজবুত হলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করা যেমন সহজ হয়, তেমনিই তা আর্থিক বিকাশ ও দারিদ্র্যমোচনের পথ প্রশস্ত করে।[৩] ভারতের রাজ্যভিত্তিক তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক পরিষেবা যত বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজও তত সহজ হয়েছে।[৪] ভারত ও নির্বাচিত কয়েকটি দেশের তুলনামূলক বিচারে GDP-র শতাংশের হিসাবে ব্যাঙ্কের সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হল চিত্র-১-এ। অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতিরগুলির তুলনায় এদেশে GDP-র শতাংশের হিসাবে বেসরকারি ঋণ এবং ঋণ ও সঞ্চয়ের অনুপাত অনেক কম। ২০১৫ সালে ভারতে GDP-র অনুপাতে বেসরকারি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০.২ শতাংশ; যেখানে চিন ও ব্রাজিলে এই হার ছিল যথাক্রমে ১৪০ শতাংশ এবং ৭১ শতাংশ।[৫] অনুরূপভাবে ওই বছর এদেশে ব্যাঙ্কের সঞ্চয়ের তুলনায় ঋণের অনুপাত ছিল ৭৭ শতাংশ, যেখানে ব্রাজিল ও চিনে এই হার ছিল যথাক্রমে ১১৯ শতাংশ ও ৩১২ শতাংশ।

বড়ো ব্যাঙ্কগুলিই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় আধিপত্য করে। সেখানে নতুন নতুন ব্যাঙ্কের প্রবেশের সুযোগ থাকে সীমিত। ২০১৬ সালের মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী, দেশের প্রথম সারির দশটি ব্যাঙ্কের হাতে (সম্পদের পরিমাণের বিচারে ক্রমপর্যায় করা হয়েছে) কুক্ষিগত রয়েছে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মোট সম্পদের ৫৮ শতাংশ।। ১৯৯১ সাল থেকে সর্বজনীন মাত্র ১৪-টি ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকায় ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে বছরে গড়ে প্রায় ১০০-টি করে নতুন ব্যাঙ্ক নথিভুক্ত হয়েছে।[৬] ভারতে বিদেশি ব্যাঙ্কের সংখ্যা নগণ্য। ২০১৬ সালের মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মোট সম্পদের মাত্র ৬ শতাংশ ছিল বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির হাতে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা

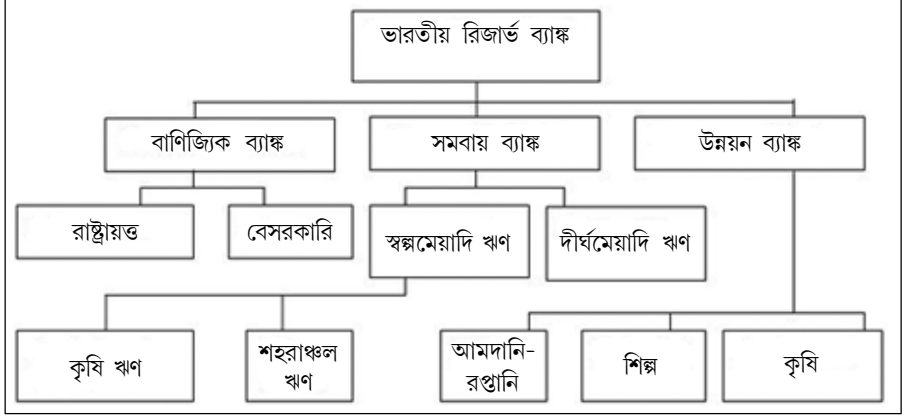

সামনের পথ

আগামীদিনে এদেশে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তিসম্পন্ন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে, যেখানে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতা বাড়বে এবং সহায়সম্পদের উৎপাদনশীল বণ্টনের জন্য উৎসাহমূলক একটি কাঠামো গড়ে তোলা যাবে। শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শুধু পুঁজি ঢাললেও চলবে না; সেই সঙ্গে কর্পোরেট প্রশাসনের সংস্কার, প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কমানো, আর্থিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের উন্নতিসাধন, কর্পোরেট ঋণের একটি গতিশীল এবং তেজি বাজার গড়ে তোলা এবং ঋণের অর্থ পুনরুদ্ধারের কার্যকর ব্যবস্থাপনা-সহ একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

"ব্যাঙ্কগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা ইতোমধ্যেই কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছে সরকার। ব্যাঙ্ক কর্মীদের নিয়োগের বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ব্যাঙ্ক পর্ষদ ব্যুরো বা ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রধনুষ পরিকল্পনায়। সম্পূর্ণ স্বাধীন এই ব্যুরো যদি গঠন করা যায়, তা হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনার ওপর তার গভীর প্রভাব পড়বে। দায়বদ্ধতা বাড়লে ঋণের উৎপাদনশীল বণ্টনের নিয়ম মেনে ঋণ দেওয়ার রীতি গড়ে উঠবে। সময়মতো যাতে এই পদক্ষেপগুলির রূপায়ণ ঘটানো যায় সে বিষয়টি আমাদের সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।"

প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রথমত, ব্যাঙ্ক, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন ব্যবস্থার মানের উন্নতি ঘটাতে হবে এবং এই ব্যাঙ্কগুলিকে আরও মজবুত করেও তুলতে হবে। পর্যায়ক্রমের বিচারে এই ধরনের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ব্যাঙ্কে নতুন করে পুঁজি ঢালার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমান্তরালভাবে এই পদক্ষেপগুলিও রূপায়িত করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত থেকে এটা বোঝা যায় যে, অনুৎপাদক সম্পদের মতো সমস্যার মোকাবিলায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার কতটা জরুরি? যেমন, চিনের উদাহরণই ধরা যাক। সেদেশে ব্যাঙ্কগুলিতে নতুন করে পুঁজি ঢালার পাশাপাশি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কারের উদ্যোগ হিসাবে খোলাখুলিভাবে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করে তোলা, কর্পোরেট প্রশাসনের উন্নতিসাধন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে, ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে পূর্ব-এশীয় আর্থিক সংকটের পর ব্যাঙ্কগুলির যথাযথ তত্ত্বাবধানের জন্য আর্থিক তত্ত্বাবধান পরিষেবা বা ফিনান্সিয়াল সুপারভাইসরি সার্ভিস গঠন করা হয় দক্ষিণ কোরিয়ায়। ব্যাঙ্কগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও উন্নত

করার প্রয়োজনীয়তা ইতোমধ্যেই কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছে সরকার। ব্যাঙ্ক কর্মীদের নিয়োগের বিষয়টি তত্ত্বাবধানের জন্য একটি ব্যাঙ্ক পর্ষদ ব্যুরো বা ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রধনুষ পরিকল্পনায়। সম্পূর্ণ স্বাধীন এই ব্যুরো যদি গঠন করা যায়, তা হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনার ওপর তার গভীর প্রভাব পড়বে। দায়বদ্ধতা বাড়লে ঋণের উৎপাদনশীল বণ্টনের নিয়ম মেনে ঋণ দেওয়ার রীতি গড়ে উঠবে। সময়মতো যাতে এই পদক্ষেপগুলির রূপায়ণ ঘটানো যায় সে বিষয়টি আমাদের সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল একটি কর্পোরেট বন্ডের বাজার গড়ে তোলা। অর্থের উৎস হিসাবে এই বন্ডের বাজার যেন ব্যাঙ্কের পরিপূরক হয়ে ওঠে। লিক্যুইড বন্ড (যে বন্ডকে সহজেই নগদে রূপান্তরিত করা যায়) এবং ডিপ বন্ডের (নির্দিষ্ট দামের চেয়ে কম দামে যে বন্ড বিক্রি করা হয়) বাজার গড়ে উঠলে কম সুদে ঋণ সংগ্রহ করা যাবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেট ঋণের উৎস হিসাবে বন্ড বাজার জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং ব্যাঙ্ক থেকে ঋণদানের পরিমাণ কমবে।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সংস্কারের তৃতীয় বিষয়টি হল এই ক্ষেত্রকে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তোলা ও উদ্ভাবনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির প্রবেশের পথ আরও সুগম করে তুলতে হবে। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলিকে লাইসেন্স দেওয়ার নতুন নীতি এই লক্ষ্যে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে ব্যাঙ্কগুলির প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কমানোর জন্য নিয়মকানুন আরও শিথিল করা প্রয়োজন। একটি সমান্তরাল কাঠামো গড়ে তোলা গেলে এদেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির প্রবেশের পথ একদিকে যেমন সহজ হবে তেমনি অন্য দিকে বিশ্বের বিভিন্ন আর্থিক সংকটের মোকাবিলাও অনেক সুষ্ঠুভাবে করা যাবে। প্রতিযোগিতা যত বাড়বে, দীর্ঘমেয়াদে এই ক্ষেত্রের দক্ষতা ও লাভজনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও বাড়বে।

ইতিহাস প্রমাণ, ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশকে, তার লক্ষ্যই ছিল এই ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা, পরিচালন ও নিয়ামক ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা। আগামী দিনে নতুন যে সমস্ত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে, তাতে এই বিষয়গুলির ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করতে হবে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) 1998. Report of the Committee on Banking Sector Reforms. Government of India.

(২) 2009. “A Hundred Small Steps: Report of the Committee on Financial Sector Reforms” SAGE Publications.http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_fr/cfsr_all.pdf.

(৩) Demirgüç-Kunt, Asli, and Ross Levine. 2008. “Finance, Financial Sector Policies, and Long-Run Growth.” M. Spence Growth Commission Background Paper 11, World Bank, Washington, DC.

(৪) Ayyagari, Meghana, Beck, Thorsten and Hoseini, Mohammad, Finance and Poverty: Evidence from India (June 2013). CEPR Discussion Paper No. DP9497.

(৫) The indicator highlights the ratio of private credit by deposit money banks and other financial institutions to GDP. Source : International Financial Statistics, International Monetary Fund (IMF).

(৬) Adams, Robert M., and Jacob Gramlich. “Where Are All the New Banks? The Role of Regulatory Burden in New Bank Formation.” Review of Industrial Organization 48.2 (2016):181-208.

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

জন অভিযোগ নিষ্পত্তি

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র : এযাবৎ তথা ভবিষ্যৎ

বিবেক কুমার, সংকেত ট্যান্ডন, শুভদা রাও

বেসরকারি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের প্রসারের একটা বড়ো কারণ হল, এই সংস্থাগুলি গ্রাহকদের ক্রমপরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে নিজেদের অনেক সহজে মানিয়ে নিতে পারে। গ্রাহকদের উন্নত পরিষেবা দেওয়া তাদের প্রধান লক্ষ্য এবং এজন্য তারা নিজেদের রীতিনীতিরও পরিমার্জন করতে পারে প্রয়োজন অনুসারে। এজন্যই, আমানত সংগ্রহের নিরিখেও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি এখন অনেক বেশি দড়। এসব ব্যাঙ্কে আমানতের অনুপাত ২০০৭-এর অর্থবর্ষের ২০ শতাংশ থেকে ২০১৭-র অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ২৪ শতাংশ।

এসে গেল ২০১৮। ভারতীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক এবং সুস্পষ্ট পরিবর্তন বেশ নজরে পড়ছে। দেশের মাথাপিছু ডলার উপার্জনের পরিমাণ খুব শীঘ্রই ২০০০-এ পৌঁছে যাবে। যা হবে একটি মাইলফলক। গৃহস্থ পরিবারে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা অনেক বেড়ে গেলে এবং আগে বিলাসপণ্য হিসেবে গণ্য বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রমে আবশ্যিক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে থাকলে তবেই এমনটা হয়। সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস সেকথাই বলে।

অর্থনৈতিক চালচিত্রের পরিবর্তনে অণুঘটকের ভূমিকা নিতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। ব্যাঙ্কিং পরিষেবার নিরবচ্ছিন্ন প্রসার আগামী দিনে আমরা প্রত্যক্ষ করব তো বটেই; তার সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা এবং পণ্য ও পরিষেবার জোগানের ক্ষেত্রে আরও নিপুণ ও আধুনিক ব্যবস্থাপত্র গড়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ওপর আগের সংস্কার কর্মসূচিগুলির প্রভাব

এই আলোচনা শুরুর আগে, পুরোনো কথাগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। ১৯৬৯ এবং ১৯৮০-র ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্যোগের পরে, ব্যাঙ্কগুলি বড়ো ধরনের সংস্কারের মুখোমুখি হয় ১৯৯১ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে। ঋণদান প্রক্রিয়া এবং সুদ কাঠামোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের হ্রাস, কোনও বিষয়ে আগাম সিদ্ধান্তগ্রহণের রেওয়াজ কমা, কোর ব্যাঙ্কিং চালু হওয়া এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত বেসরকারি ব্যাঙ্কের অনুমোদন—এসবই ২০০০-এর দশকের পর থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই, আমানত বাবদ জমা পড়া অর্থ এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশের হিসেবে অনুপাত ১৯৯৭-এর অর্থবর্ষে ৩৫ দশমিক ৬ থেকে বেড়ে ২০০৭ অর্থবর্ষের দাঁড়ায় ৬০ দশমিক ৮-এ। ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মধ্যে শতাংশের হিসেবে অনুপাত এসময়ে ১৯ দশমিক ৬ থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ৪৫ হয়েছে। এর পরের দশ বছরে এই দু'টি অনুপাত বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে একাত্তর দশমিক ২ এবং ৫১ দশমিক ৯। ২০০৮-এ বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক টালামাটাল অবস্থা তৈরি হওয়া সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়েছে।

১৯৯০-এর দশকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের প্রসার মূলত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির হাত ধরে। এর পরে ছবিটা পালটাতে থাকে। ঋণদানের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি ক্রমে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় চলে আসতে শুরু করে। ২০০৭-এর অর্থবর্ষে মোট ঋণদানের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির অবদান ছিল ২০ শতাংশ। ২০১৭-এ তা হয়েছে ২৯ শতাংশ।

[বিবেক কুমার ইয়েস ব্যাঙ্কের বরিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ও গ্রুপ এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। ই-মেল : vivek.kumar1@yesbank.in। সংকেত ট্যান্ডন ইয়েস ব্যাঙ্কের বাণিজ্যিক অর্থনীতি ব্যাঙ্কিং বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা অর্থনীতিবিদ। ই-মেল : sanket.tandon@yesbank.in। শুভদা রাও ইয়েস ব্যাঙ্কের গ্রুপ প্রেসিডেন্ট ও মুখ্য অর্থনীতিবিদ। ই-মেল : shubhada.rao@yesbank.in]

শুধু তাই নয়। ২০১০-এর পর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের হারও বেশি।

বেসরকারি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের প্রসারের একটা বড়ো কারণ হল, এই সংস্থাগুলি গ্রাহকদের ক্রমপরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে নিজেদের অনেক সহজে মানিয়ে নিতে পারে। গ্রাহকদের উন্নত পরিষেবা দেওয়া তাদের প্রধান লক্ষ্য এবং এজন্য তারা নিজেদের রীতিনীতিরও পরিমার্জন করতে পারে প্রয়োজন অনুসারে। এজন্যই, আমানত সংগ্রহের নিরিখেও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি এখন অনেক বেশি দড়। এসব ব্যাঙ্কে আমানতের অনুপাত ২০০৭-এর অর্থবর্ষের ২০ শতাংশ থেকে ২০১৭-র অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ২৪ শতাংশ।

গত ১০ বছরে ব্যাঙ্ক পরিষেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির বাজার ক্রমে বেড়ে চলার কারণগুলিকে এভাবে দেখা যেতে পারে।

● **ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া ও ধরন এবং পরে বাজারে প্রবেশ :** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিই প্রধানত শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ঋণ দিয়েছে এবং দিয়ে থাকে। ফলে তাদের ওপর বাণিজ্যিক মন্দার প্রভাবও বেশি। অন্যদিকে, নতুন বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির সেই বালাই নেই। তারা বাজারে ঢুকেছে প্রধানত ২০০০-এর দশকের পরে। এরা মূলত আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে ঋণ দেয়। এধরনের ঋণগ্রহীতাদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগ ও ক্ষেত্রও অনেক বেশি। পাশাপাশি, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতেও বেশি দক্ষ। নগদবিহীন ক্রয়-বিক্রয়ের যন্ত্র (Point of Sale machines)-এর ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলতে অনেক বেশি তৎপর ও উৎসাহী বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি। ২০১২-এ ভারতীয় অর্থনীতিতে ঋণবাবদ প্রদত্ত অর্থের মাত্র ১২ শতাংশ ছিল বেসরকারি ব্যাঙ্কের অবদান। অথচ Point of Sale machine ব্যবহারের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ কাজই হ'ত বেসরকারি ব্যাঙ্কের দৌলতে। পরে পরে এব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি আরও তৎপর হয়ে উঠলেও, এখনও এই ক্ষেত্রে ৫৭ শতাংশ কাজ বেসরকারি ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই হয়। এই খাতটি ক্রমে রাজস্ব বৃদ্ধির অন্যতম পন্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। লক্ষণীয় যে, বেসরকারি ব্যাঙ্কের মোট আয়ের ২০ শতাংশ আসে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের চিরাচরিত কর্মকাণ্ডের অতিরিক্ত অন্যান্য উৎস থেকে। বিপরীতে, এই সব উৎস থেকে আসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আয়ের ১৪ শতাংশ।

● **উৎপাদনশীলতা :** ব্যয়-আয় অনুপাত বা CI (কর্মীদের পেছনে খরচ + অন্যান্য খরচ)/(শেষপর্যন্ত সুদবাবদ আয় + অন্যান্য আয়)-এর নিরিখে বিচারেও রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে ব্যয়-আয় অনুপাত বা CI নেমেই চলেছে। ২০১২ অর্থবর্ষে ৪৭ শতাংশ থেকে নেমে ২০১৭ অর্থবর্ষে তা ৪৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, ওই একই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে তা চুয়াল্লিশ শতাংশ থেকে বেড়ে উনপঞ্চাশ শতাংশ হয়েছে। কাজকর্ম বাবদ খরচ কমার সুবিধা অনেক।

উৎপাদনশীলতা বাড়লে তবেই কোনও বাণিজ্যিক সংস্থা তার শেয়ার ক্রেতাদের ভালো লভ্যাংশ দিয়ে ভবিষ্যতে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের সুযোগ পেতে পারে।

● **কর্মতৎপরতা :** নতুন সময়ের বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি দক্ষ কর্মী নিয়োগে অনেক বেশি উদ্যোগী। চটপট সিদ্ধান্ত নিতেও পারে তারা। কোনও ক্ষেত্রে ঋণখেলাপের সম্ভাবনার ইঙ্গিতটুকু পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব তাদের পক্ষে। অনুৎপাদক সম্পদ যাতে তৈরি না হয়, তারা অনেক দ্রুততার সঙ্গে সেজন্য উদ্যোগী হওয়ার ক্ষমতা ধরে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষাতেই এর প্রমাণ মিলেছে।

> ***"রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পুনরুজ্জীবনে সম্প্রতি কেন্দ্রের তরফে ২ লক্ষ ১১ কোটি টাকার নতুন মূলধন জোগানের সিদ্ধান্ত ছবিটা অনেকটাই পালটে দিতে পারে। খুবই সময়োপযোগী এই ঘোষণা। এর ফলে বাসেল, III নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শর্তাবলী পালনে সক্ষম হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। কর্মকাণ্ড প্রসারের জন্য বাজার থেকে মূলধন (Growth Capital) সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে এই ব্যাঙ্কগুলি। কারণ সরকার মূলধন জোগানোয় তাদের কাজের দক্ষতা বাড়বে। তাছাড়া, দক্ষ পরিষেবা দিয়ে লাভের অঙ্ক বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নামার জন্য তাদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হবে।"***

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মে গতি আনার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সংস্কারমূলক উদ্যোগ

গত এক দশক যাবৎ প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বেসরকারি ব্যাঙ্কের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। এই অবস্থা পালটাতে বেশ কিছু সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার।

●গড়া হয়েছে ব্যাঙ্ক পর্ষদ সংস্থা বা Bank Board Bureau। মুখ্য প্রবন্ধক তথা অধিকর্তা (CMD)-র পদ উঠিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে অ-কার্যনির্বাহী প্রধান (Non-executive Chairman) এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (CEO)— এই দু'টি পদ তৈরি করা হয়েছে। মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কার্যকালের মেয়াদ বাড়িয়ে ৫ বছর করার সুপারিশও করা হয়েছে। এই সব পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদে ভালো ফল দেবে বলে আশা করা যায়।

●বড়ো অঙ্কের ঋণসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার বা Central Repository of Information on Large Accounts (CRISIL) গঠন এবং দেউলিয়া বিধি (Insolvency and Bankruptcy Code)

চালু হওয়ায় তথ্য বিনিময় এবং অনুৎপাদক সম্পদের মোকাবিলায় একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। এর ফলে ব্যাঙ্কের খাতায় জমা হয়ে থাকা অকেজো মূলধনের অনেকটাই কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানেও গতি আসবে।

● রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পুনরুজ্জীবনে সম্প্রতি কেন্দ্রের তরফে ২ লক্ষ ১১ কোটি টাকার নতুন মূলধন জোগানের সিদ্ধান্ত ছবিটা অনেকটাই পালটে দিতে পারে। খুবই সময়োপযোগী এই ঘোষণা। এর ফলে বাসেল III নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শর্তাবলী পালনে সক্ষম হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি।

কর্মকাণ্ড প্রসারের জন্য বাজার থেকে মূলধন (Growth Capital) সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে এই ব্যাঙ্কগুলি। কারণ সরকার মূলধন জোগানোয় তাদের কাজের দক্ষতা বাড়বে। তাছাড়া, দক্ষ পরিষেবা দিয়ে লাভের অঙ্ক বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নামার জন্য তাদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হবে।

পরবর্তী প্রজন্মের পরিষেবা প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কগুলি কি প্রস্তুত?

২০২৫ নাগাদ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে চতুর্থ দেশ হয়ে উঠবে ভারত। দেশের ব্যাঙ্ক পরিষেবার চালচিত্র এবং গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে কয়েকটি বিষয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● **উন্নয়ন :** এক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সরকারের উদ্যোগ এবং ক্ষেত্রভিত্তিক ও কাঠামোগত সংস্কারের বিষয়গুলিও বিবেচ্য।

● **বিনিয়ন্ত্রণ :** অর্থনৈতিক লেনদেন ও কর্মকাণ্ডে মধ্যস্থতা ও অণুঘটক হিসেবে কাজের ক্ষেত্রে সাযুজ্যপূর্ণ নীতি এবং যথোপযুক্ত সঞ্চয়ের প্রবণতা।

● **জনবিন্যাস :** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুবা এবং ডিজিটাল লেনদেন পারংগমদের আধিপত্য।

● **পট পরিবর্তন :** ডিজিটাল প্রক্রিয়ার প্রসার এবং ব্যাঙ্ক, টেলি-যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসরের মধ্যে সংযোগসাধন।

উল্লিখিত চারটি বিষয় ছাড়াও ভারতে পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় হবে।

১. ব্যাঙ্ক ব্যবহারের রকমসকম পালটে দেবে প্রযুক্তি :

আগামী দিনে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের পরিধি স্থির করে দেবে প্রযুক্তি। সুবিশাল তথ্যভাণ্ডার, উচ্চস্তরীয় পরিগণনা (Cloud Computing ইত্যাদি), স্মার্ট ফোন এবং এধরনের আরও নতুন নতুন উদ্ভাবন অনেক কিছুই বদলে দেবে। একাধিক প্রণালী নয় (Multichannel) সর্বউদ্দেশ্যসাধক একক প্রণালী (Omni-channel)-র মাধ্যমেই হয়তো ব্যাঙ্কের সঙ্গে আদানপ্রদান হবে গ্রাহকের। মোবাইল ফোনে ব্যক্তিভিত্তিক নানা পরিষেবা প্রস্তাব, গ্রাহকদের কাছে নতুন নতুন ধরনের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল চিহ্নিতকরণের প্রযুক্তির ব্যবহার—এই সব পথেই এগোবে আগামী দিনের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন ও বাণিজ্য আগামী দিনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠবে। ভারতে সেল ফোনের ব্যবহারও যথেষ্ট বেশি (অনেকেরই একাধিক সেলফোন রয়েছে)।

"বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন ও বাণিজ্য আগামী দিনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠবে। ভারতে সেল ফোনের ব্যবহারও যথেষ্ট বেশি (অনেকেরই একাধিক সেলফোন রয়েছে)। দেশে বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৪ কোটি ৬০ লক্ষ। কিন্তু মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা নেন মাত্র ৫০ কোটি মানুষ। কাজেই জনধন-আধার-মোবাইল—এই ত্রয়ী ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে।"

দেশে বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৪ কোটি ৬০ লক্ষ। কিন্তু মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা নেন মাত্র ৫০ কোটি মানুষ। কাজেই জনধন-আধার-মোবাইল—এই ত্রয়ী ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে।

২. প্রযুক্তি বহু ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলির 'সৃজনশীল বিনাশ' (Creative Destruction) ঘটাবে :

উদ্ভাবন প্রয়াসে জোর দিতেই হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। বাড়বে প্রতিযোগিতা। সুলভে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে হবে গ্রাহকদের। এজন্য তাদের পরিকাঠামো জোরদার করতে, অনেক ক্ষেত্রেই যৌথ উদ্যোগ জরুরি হয়ে পড়বে। গ্রাহকদের সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ, জালিয়াতি রোধ, আর্থিক লেনদেন, অ্যাকাউন্ট পরিকাঠামো—সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় কাজ পরে হয়তো ধীরে ধীরে বাইরের কোনও সংস্থাকে দিয়ে করানোর প্রবণতা বাড়বে (Outsourcing)।

৩. নগদহীন এবং শাখাহীন ব্যাঙ্ক পরিষেবা :

বিমুদ্রায়নের পর সীমিত নগদনির্ভর অর্থনীতির পথে হাঁটতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। নগদহীন এবং ইন্টারনেট নির্ভর লেনদেনের মাধ্যমে অনেক সহজ ও স্বচ্ছ ও আধুনিক হয়ে উঠবে আগামী দিনের ব্যাঙ্ক পরিষেবা। মানুষের হাতের মুঠোয় থাকা মোবাইল ফোনগুলিই ক্রমে হয়ে উঠবে 'ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক শাখা' (ব্যবহৃত স্মার্ট ফোনের সংখ্যা ১ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে ২০১৪ সালে দাঁড়ায় ৮০ কোটিতে)। মর্গ্যান স্ট্যানলির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের ইন্টারনেট বাজারের আয়তন ২০১৩-র ১১০০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০২০-তে ১৩,৭০০ কোটি ডলারে পৌঁছনোর সম্ভাবনা।

সারা বিশ্বেই, ব্যাঙ্কিং শিল্প দৈনিক ৯-টা ৫-টার সময়সীমার অর্গল ভেঙে ২৪×৭ সমাধান মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে। শাখাহীন ব্যাঙ্ক পরিষেবা অনাবশ্যক ব্যয় কমিয়ে ব্যাঙ্কগুলির রাজস্ব বাড়াবে। উন্নত দেশগুলিতে, ইতোমধ্যেই, নির্দিষ্ট 'একটি

বাড়ির মধ্যে ব্যাঙ্ক'-এর বদলে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর অবয়বহীন ব্যাঙ্কের ব্যবহার শুরু হয়েছে। (ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা গত ৫ বছরে এক হাজারেরও বেশি শাখা তুলে দিয়েছে)। এদেশে, আধারের মতো জাতীয় মঞ্চ ব্যবহার করে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা আমূল পালটে যেতে পারে।

৪. ATM ব্যবহারের নতুনত্ব :

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে চিরাচরিত পথে প্রতিটি লেনদেনের খরচ প্রতি শাখায় ৪৮ টাকা। ATM-এর মাধ্যমে হলে তা ১৮ টাকা। স্বয়ংক্রিয় প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক বার্তালাপ বা IVR-এর মাধ্যমে লেনদেন প্রতি খরচ ৮ টাকা। অনলাইনে তা হল চার টাকা। ভারতে ATM-এর সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক কম—প্রতি ১০ লক্ষে ১১-টি। চিনে এবং মালয়েশিয়ায় এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭ এবং ৫২। সৌরবিদ্যুৎ চালিত ATM চালু করা গেলে গ্রামাঞ্চলে এই পরিষেবার বিস্তার ঘটবে।

৫. পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ঋণদান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ :

বিশ্বের পরিকাঠামো বাজারে ভারতের অংশভাক ৫ শতাংশ। ২০১৫ নাগাদ তা বেড়ে ৯ থেকে ১০ শতাংশে দাঁড়াবে। আগামী দিনের প্রকল্পগুলি রূপায়ণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিশেষ প্রাধান্য পাবে। এছাড়া গড়ে উঠবে পরিকাঠামো ঋণ তহবিল, পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে গড়ে তোলা পরিকাঠামো সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ঋণদান ব্যবস্থাপত্র (Green Banking), অর্থনীতির দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হলেও, অর্থলগ্নির দিক থেকে বাস্তবসম্মত নয়, এমন প্রকল্প খাতে ঋণদান (Viability Gap Funding) ইত্যাদি।

৬. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থ জোগানোর নতুন ব্যবস্থাপত্র :

এদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান ৮ শতাংশ। ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা SIDBI-র হিসেব অনুযায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বা MSME ক্ষেত্রে ঋণের চাহিদা ৬৫০০০ কোটি ডলার। শিল্পতালুকভিত্তিক ঋণদান (Cluster Financing), প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধন ভরতুকি নীতি (Capital Subsidy Policy for Technology Upgradation), মুদ্রা ব্যাঙ্ক, ঋণ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (Credit Guarantee schemes), স্টার্ট আপ—এসবই আগামী দিনে ব্যাঙ্ক পরিষেবা প্রদানের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

৭. প্রতিযোগিতা এবং পুনর্বিন্যাস ও একীকরণ (Consolidation) :

প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে ব্যাঙ্কগুলিকে কৌশলগত দিক থেকে যৌথ নানা উদ্যোগে সামিল হতেই হবে। দরকার উদ্ভাবনামূলক প্রয়াস। কয়েকটি বিষয় ভাবা যেতে পারে।

- অ্যাকাউন্ট নম্বর পোর্টেবিলিটি (মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটির ধাঁচে)
- তথ্য বিশ্লেষণ এবং বিনিময়ে দক্ষতার প্রসার
- খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা

শেষ কথায়

নতুন দিনের চাহিদা অনুযায়ী যে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে তারা অন্যদের তুলনায় এগিয়ে যাবে অনেকখানি। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সাযুজ্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড ভারতের ব্যাঙ্কগুলিকে আন্তর্জাতিক আঙ্গিনাতেও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে এদেশকে প্রথম চারটি দেশের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার দায়টা মূলত ন্যস্ত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের উপরই। ❑

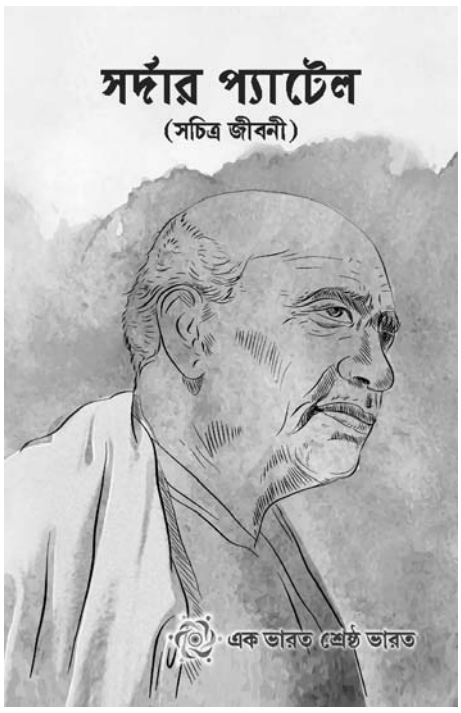

আমাদের নতুন প্রকাশনা

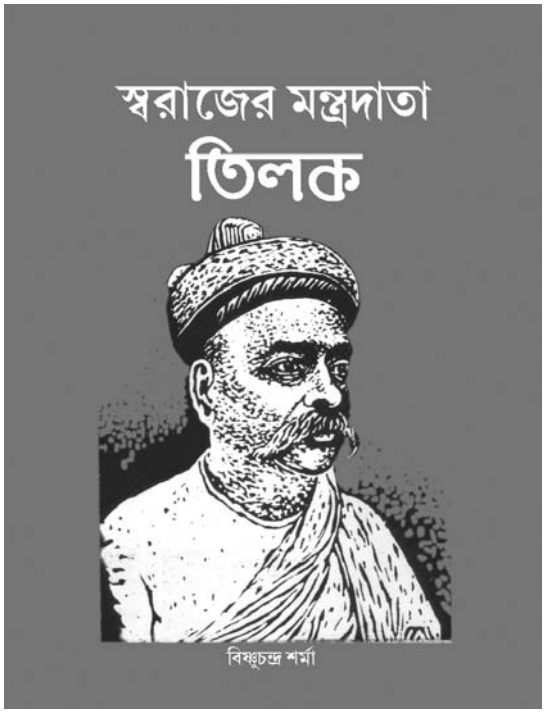

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অনুৎপাদক সম্পদ : সমাধান কোন পথে?

দীপক নারাঙ্গ

ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপে সামিল ব্যবসায়ীরা যাতে ঘুরপথে টাকা সরিয়ে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষিত সংস্থাগুলি ফের কিনে নিতে না পারে, সেজন্য সম্প্রতি জারি হয়েছে অধ্যাদেশ। এক্ষেত্রে সরকার যে তৎপরতা দেখিয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। এর সঙ্গে ২০১৩-র কোম্পানি আইনের ৪৪৭ ধারার যথাযথ প্রয়োগ হলে ঋণখেলাপিরা ভয় পেতে বাধ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা অনুযায়ী, ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপে সামিল বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের নিয়ে আসতে হবে অপরাধীদের তালিকায়। অনেক দেশেই এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে তা ফেরৎ না দেওয়া জন্মগত অধিকার বলে অনেকের ধারণা।

অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাঙ্কের ভূমিকা এবং কার্যকলাপ উন্নয়নের অন্যতম চালিকা-শক্তি। যাদের সম্পদ উদ্বৃত্ত, তাদের থেকে আমানত সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করার জন্য লগ্নিকারীদের ঋণ দেয় ব্যাঙ্ক। এই কর্মকাণ্ডের বহুমাত্রিক প্রভাব পড়ে অর্থনীতির ওপর। ঋণগ্রহীতাদের মাধ্যমে উৎপাদনশীল সম্পদের চাহিদা বাড়ে। আর এর সঙ্গে বাড়ে এই উৎপাদনশীল সম্পদের জোগানদার বা সরবরাহকারীদের আয়। একজনের ব্যয়, অন্যজনের আয়। নিরন্তর এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগায়। বাড়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন।

ঋণদানের পরিমাণ কমলে হয় উলটোটা। উন্নয়নের গতি যায় থেমে। ঋণদানের পরিমাণ যথাযথ না বাড়ার একটা বড়ো কারণ হল ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ বা NPA বেড়ে যাওয়া। বাজারে মোট ঋণের পরিমাণের প্রায় বাহাত্তর শতাংশই জোগান দিয়ে থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। সময়মতো ঋণ পরিশোধে অপারগ বাণিজ্যিক সংস্থার বাড়বাড়ন্ত এবং তার ফলে ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা বৃদ্ধি—এই দুইয়ে মিলে বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে থমকে রাখে।

ভারতের ব্যাঙ্কগুলির মোট অনুৎপাদক সম্পদ (Gross Non-Performing Assets—GNPA)-এর পরিমাণ ২০১৭-র সেপ্টেম্বরের শেষ দাঁড়িয়েছে আট লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭-র জুনের শেষে এই পরিমাণ ছিল আট লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার কোটি টাকা। এই তিন মাসে অনুৎপাদক সম্পদ বৃদ্ধির হার দাঁড়াচ্ছে এক দশমিক তিন শতাংশ।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ মারাত্মকভাবে বেড়ে যেতে থাকে। এই অবস্থার জন্য দায়ি আগের বছরগুলিতে ব্যাঙ্কগুলির অত্যধিক বেশি মাত্রায় ঋণদান। ২০০৮ থেকে ২০১৪-র মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে দেওয়া ঋণের পরিমাণ ১৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫৪ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৭-র সেপ্টেম্বর নাগাদ তা দাঁড়ায় ৫৫ লক্ষ ১ হাজার কোটি টাকায়। কাজেই, এতে একেবারেই আশ্চর্য কিছু নেই যে, দেশের মোট অনুৎপাদক সম্পদের নব্বই শতাংশের বোঝা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাঁধে।

চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ওপর অনাদায়ি বা পরিশোধ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, এমন ঋণের বোঝা দাঁড়ায় সাত দশমিক তিন তিন লক্ষ কোটি টাকা। এই পরিমাণ আগের ত্রৈমাসিকের ১৭ জুন পর্যন্ত জমা হওয়া বোঝার প্রায় সমান। উল্লিখিত সময়ে ১৭-টি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এই বোঝা প্রায় ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ১ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

তপশিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির প্রদত্ত ঋণের ৫৬ শতাংশই যায় বৃহৎ ঋণগ্রহীতাদের

[লেখক প্রাক্তন কার্যনির্বাহী অধিকর্তা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এবং পুণের এনআইবিএম-এর অতিথি অধ্যাপক। ই-মেল : d.narang@nibmindia.org]

(যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ৫ কোটি টাকার বেশি অঙ্কের ঋণ নিয়ে থাকেন) কাছে। জমা হওয়া অনুৎপাদক সম্পদের বোঝার ক্ষেত্রে এদের অবদান কিন্তু ৮৬ দশমিক ৫ শতাংশ।

২০ থেকে ৫০ কোটি টাকা অনাদায়ি রয়েছে যেসব খাত বা অ্যাকাউন্ট বাবদ, সেখান থেকেই অনুৎপাদক সম্পদ তৈরি হওয়ার প্রবণতা বেশি বলে দেখা যাচ্ছে (অ্যাকাউন্টের সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ উভয় নিরিখেই)। এই বিচারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৫০ থেকে ১০০ কোটি টাকা অনাদায়ি রয়েছে এমন অ্যাকাউন্টগুলি। বকেয়া রাখার ক্ষেত্রে শীর্ষে থাকা প্রথম ১০০ জন গ্রহীতার কাছে রয়েছে মোট প্রদত্ত ঋণের প্রায় ১৫ দশমিক ২ শতাংশ। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মোট অনুৎপাদক সম্পদের বোঝার ২৫ দশমিক ৬ শতাংশের অবদান এদেরই।

২০১৭-র মার্চের ১৭ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে দেখা যাচ্ছে, শিল্পক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া মোট ঋণের ২৩ শতাংশের পরিশোধ হওয়ার বিষয়ে সংশয় রয়েছে। কৃষি, পরিষেবা এবং খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে এই অনুপাত যথাক্রমে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ, ৭ শতাংশ এবং ২ দশমিক ১ শতাংশ। সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া ঋণের ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ নিয়ে এই সমস্যা রয়েছে। বেসরকারি ব্যাঙ্ক এবং বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত যথাক্রমে ৯ দশমিক ৩ এবং ৭ দশমিক ১ শতাংশ। শিল্পসংস্থাগুলির মধ্যে ধাতু এবং ধাতব পণ্য, সিমেন্ট এবং সিমেন্টজাত পণ্য, বস্ত্র এবং পরিকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প সংস্থাগুলির নেওয়া ঋণ পরিশোধ হওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা বেশি।

এরকম অবস্থা হওয়ার কারণগুলি একটু খতিয়ে দেখা যাক।

● ঋণ পরিশোধে যাদের ইতিহাস খুব একটা উজ্জ্বল নয়, ঋণদানের ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব বড়ো করে দেখাতে বহু সময় তাদেরকেও ঋণ দিয়েছে অনেক ব্যাঙ্ক।

● চাহিদা-জোগানের বিষয়টি ভালো করে পর্যালোচনা না করেই অনেক ক্ষেত্রে বহু সংস্থা ঋণ নিয়ে নিজেদের ব্যবসার বহর বাড়িয়েছে।

সারণি-১
ঋণ এবং অনুৎপাদক সম্পদের তুলনামূলক বৃদ্ধি
(শতাংশের হিসেবে)

বছর	অনুৎপাদক সম্পদে বৃদ্ধির হার	ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির হার
২০০১-'০২	১১	২৩.৬
২০০২-'০৩	৯.৫	১৪.৪
২০০৩-'০৪	৭.৪	১৬.২
২০০৪-'০৫	৫.২	৩১
২০০৫-'০৬	৩.৫	৩১
২০০৬-'০৭	২.৬	২৮.৫
২০০৭-'০৮	২.৪	২৩.১
২০০৮-'০৯	২.৪	১৯.৬
২০০৯-'১০	২.৫	১৭.১
২০১০-'১১	২.৪	২২.৩
২০১১-'১২	২.৯	১৬.৯
২০১২-'১৩	৩.৪	১৫.১
২০১৩-'১৪	৩.৮	১০.৯
২০১৪-'১৫	৪.৩	১২.৬
২০১৫-'১৬	৭.৬	১০.৭
২০১৬-'১৭	৯.৩	৫.০৮

● যে প্রকল্পের জন্য ঋণ নেওয়া হয়েছে, বহু সময় নানা কারণে তার রূপায়ণে দেরি হয়েছে।

● নিজেদের খুঁটির জোরে মূলধনী বাজারে শেয়ার বা ইক্যুইটি ছেড়ে টাকা তুলতে না পেরে অনেক সংস্থা ঋণ নিয়ে তার ভিত্তিতে শেয়ার বা ইক্যুইটি বেচে অর্থের সংস্থান করেছে। কীভাবে এই সব শেয়ার বাজারে আনা হচ্ছে, ব্যাঙ্কগুলি তা খতিয়ে দেখেনি।

● অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে অনেক সংস্থা শেষমেষ ব্যবসা চালাতে না পেরে দেনার দায়ে জড়িয়েছে।

● সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণের জন্য নেওয়া ঋণের টাকা বহু সময়ে অন্য কাজে লাগানো হয়েছে।

● ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ খেলাপ করেছে অনেক সংস্থা। জুয়াচারির ঘটনাও বিরল নয়।

● ভুয়ো সংস্থা খুলে ঋণের টাকা সেখানে চালান করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। এবিষয়টিতে বহু সময়েই খেয়াল রাখতে পারেনি ব্যাঙ্ক।

● ভালো করে সবদিক খতিয়ে না দেখেই ঋণদান এবং তা পুনরুদ্ধারে উদ্যোগের অভাব।

নতুন ঋণ খাতে অনুৎপাদক সম্পদ যখন তৈরি হয়, তার জন্য তিন থেকে চার বছর সময় লাগে। আর অনুৎপাদক সম্পদ তৈরি হওয়ার অবাঞ্ছিত প্রক্রিয়াটি লুকিয়ে থাকে ঋণদানের বৃদ্ধির প্রাবল্য এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে আপাত সবলতার আড়ালে। মোট অনুৎপাদক সম্পদের অনুপাতের বৃদ্ধি সাদা চোখে সবসময় খুব বেশি বলে মনে হয় না। কারণ, এই অনুপাতের ক্ষেত্রে 'লব' বা numerator হল অনুৎপাদক সম্পদের বৃদ্ধি এবং 'হর' বা denominator হল ঋণদানের পরিমাণের বৃদ্ধি। এখানে 'হর' 'লব'-এর চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়ে।

ঋণখেলাপের বিভিন্ন কারণ (যেগুলি ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে) সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং বেগতিক বুঝলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণে তৎপর হওয়া উচিত ব্যাঙ্কগুলির।

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপে সামিলদের এবং লাভজনক নয় এমন প্রকল্পের খাতে ধার দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ঋণখেলাপের সম্ভাবনার ইঙ্গিতটুকু মিললেই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে নির্দেশিকা রয়েছে তার যথার্থ অনুধাবনের প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে এবং SFIO-র কাছে বিষয়টি পাঠাতেও পারে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৪৪৭ ধারায় বলা হয়েছে, বাণিজ্যিক সংস্থা এবং তার শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থহানির লক্ষ্যে, কোনও ব্যক্তি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও তথ্য চেপে গেলে বা হানিকর কাজে লিপ্ত হলে Serious Fraud Investigation Office বা SFIO তদন্তে নামতে পারে। কাজেই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপের ঘটনাগুলির তদন্তের দায়িত্ব SFIO-র উপর ন্যস্ত করা যেতেই পারে।

ঋণখেলাপির তরফে অনৈতিকভাবে তৎপরতা দেখা গেছে—ব্যাঙ্ক যদি তা প্রমাণ

রেখাচিত্র-১

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে পরিশোধ নিয়ে সংশয় রয়েছে এমন অংশের পরিমাণ

(শতাংশের হিসেবে)

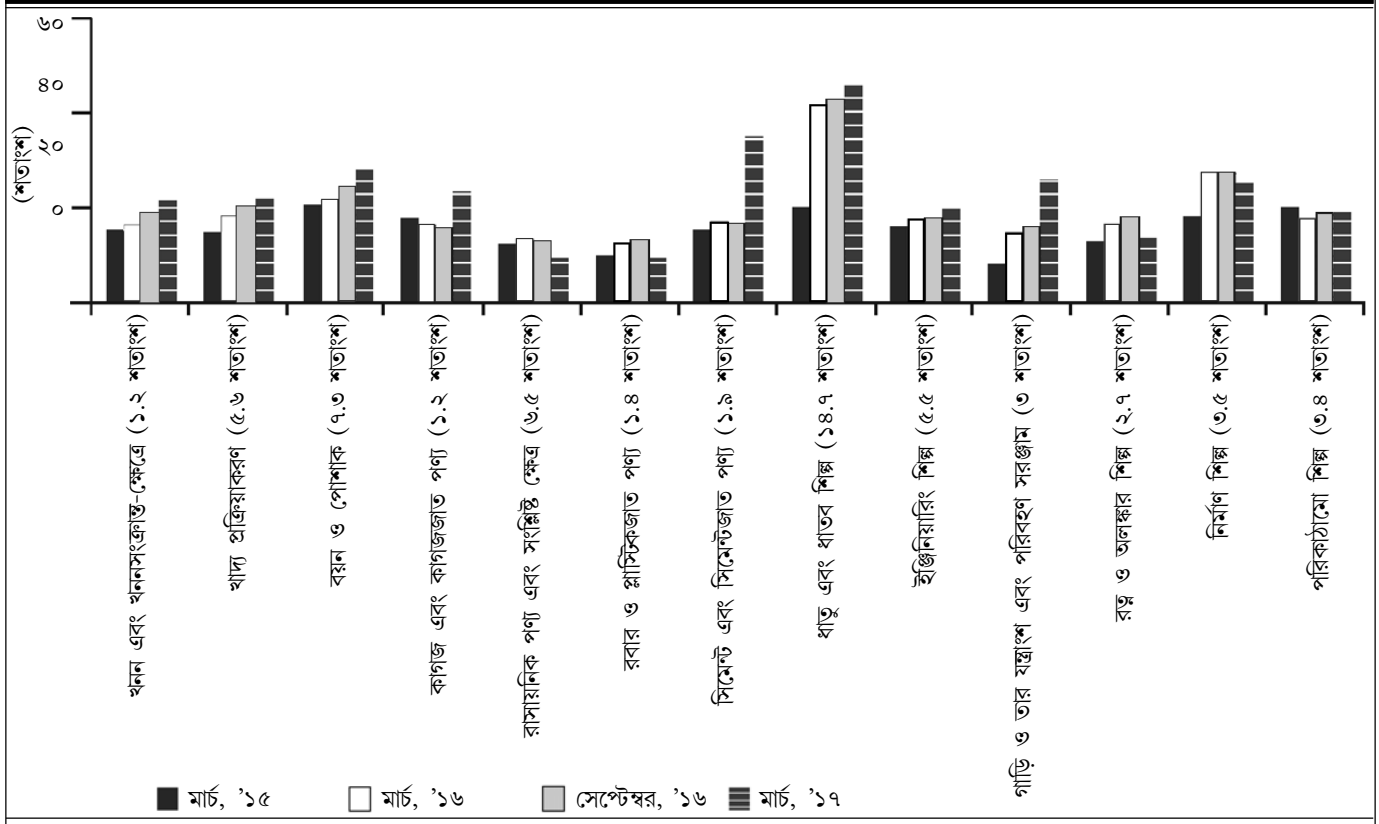

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীর মধ্যে থাকা সংখ্যাগুলি মোট ঋণের নিরিখে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের অনুপাত।

সূত্র : অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন, জুন, ২০১৭

করতে না পারে, তাহলে অবশ্য দোষীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা কঠিন।

জালিয়াতির দায়ে দোষী সাব্যস্তের কমপক্ষে ৬ মাস এবং সর্বাধিক ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে। সঙ্গে হতে পারে জরিমানাও। এই জরিমানার অর্থমূল্য জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত অর্থের পরিমাণের কম হবে না। সর্বাধিক তা হতে পারে জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত অর্থমূল্যের তিন-গুণ।

জালিয়াতির মধ্যে জনস্বার্থের হানি হলে কারাবাসের মেয়াদ হবে অন্তত তিন বছর। ঋণখেলাপিদের থেকে টাকা আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কগুলি যেসব আইনের দ্বারস্থ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে RDDBTI আইন, SARFAESI আইন-০২। এছাড়াও সম্প্রতি প্রণীত দেউলিয়া বিধি ২০১৬ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

SARFAESI আইনের সংস্থান অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক ঋণখেলাপির সম্পত্তির দখল নিয়ে তা নিলাম করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে আদালতের অনুমতির প্রয়োজন নেই। ঋণখেলাপির এক্ষেত্রে কিছুটি করার নেই। তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঋণখেলাপি পক্ষ পালটা ভিত্তিহীন অভিযোগ আনলে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের আইনি রক্ষাকবচেরও ব্যবস্থা আছে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা যাতে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। দীপক নারাঙ্গ-হরিয়ানা সরকার মামলায় ২০০৬ সালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট এভাবেই ঋণখেলাপের একটি মামলায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সহকারি মহাপ্রবন্ধকের পক্ষে রায় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভুয়ো তথ্যের ভিত্তিতে ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে দায়ের FIR গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকেও তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে। বিচারপতি আর. এস. মদন তার রায়ে বলেছেন, ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী ফৌজদারি বিধির ১৯ নম্বর ধারায় এবং ২০০২ সালের আইনের ৩২ নম্বর ধারায় আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়া আধিকারিকের এই সুযোগ প্রাপ্য। SARFAESI আইনের আওতায় ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের অনেকেই অবাঞ্ছিতভাবে আইনি জটিলতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধে অরাজি ব্যক্তি বা সংস্থার থেকে টাকা আদায় করাতে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জোরালো উদ্যোগের অভাব দেখা যায়। SARFAESI আইনের আওতায় ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে ৬৪ হাজার ৫১৯-টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল।

আইনটিকে আরও কার্যকর করে তুলতে সরকার তাতে কিছু সংশোধনী নিয়ে আসে। এতে ঋণখেলাপির সম্পত্তি সরাসরি ব্যাঙ্কের তরফে মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া জেলাশাসকের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইনের বিভিন্ন ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে ঋণখেলাপিরা টাকা ফেরৎ না দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। অন্যদিকে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে এমন ঋণগ্রহীতাদের পাশে দাঁড়াতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। লুধিয়ানার শিল্পপতি সঞ্জয় লাঙ্গোলিয়া। তিনি জানিয়েছিলেন, লুধিয়ানার অন্য উৎপাদনকারীরা যে পণ্য বিক্রি করেন, তিনিও তাই করছেন। নির্দিষ্ট হারে ঋণের সুদ দিচ্ছিলেন তিনি। কিস্তির টাকা এবং কর মেটাচ্ছিলেন সঠিক সময়ে। কিন্তু নিয়ম মেনে চলা সত্ত্বেও সুদের হার কমানোর জন্য তার আবেদন খারিজ করে দেয় ব্যাঙ্ক। লাঙ্গোলিয়া অভিযোগ আনেন, অসৎ ঋণগ্রহীতারা নানা কায়দায় নিজেদের নেওয়া ঋণের ওপর সুদের হার কমিয়ে নিতে পেরেছে। আদায় করে নিয়েছে দেরিতে কিস্তি মেটানোর সুবিধাও। কাজেই, পণ্য বাজারে নিয়ে আসার সময় লাঙ্গোলিয়া পড়েন অসুবিধায়। অন্যদিকে সুবিধা পেয়ে যায় অসাধু ব্যবসায়ীরা। অসততার জন্য কি পুরস্কার দেওয়া হয়? সৎ ঋণগ্রহীতারাই কি ভুগবে? এই সব প্রশ্ন তোলেন লাঙ্গোলিয়া। এপ্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটা মন্তব্য মনে আসে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপে সামিলদের আইনের শাসনের স্বাদ বোঝানো হবে।

গত বছর পয়লা ডিসেম্বর চালু হওয়া দেউলিয়া বিধি কার্যকর করায় বর্তমান সরকারের প্রয়াস সাধুবাদযোগ্য। এই বিধির সঠিক রূপায়ণ পরিস্থিতি পালটে দিতে পারে। অনাদায়ি ঋণ আদায় করার জন্য আইনের ফাঁকফোকর বন্ধ করা এবং কড়া সংস্থানের জন্য সরকার দু'-দু'বার অধ্যাদেশ জারি করেছে। বর্তমানে চালু দেউলিয়া বিধি অনুৎপাদক সম্পদ সদৃশ রাক্ষসকে বধ করতে ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। তবে তার প্রয়োগের

লেখচিত্র-২

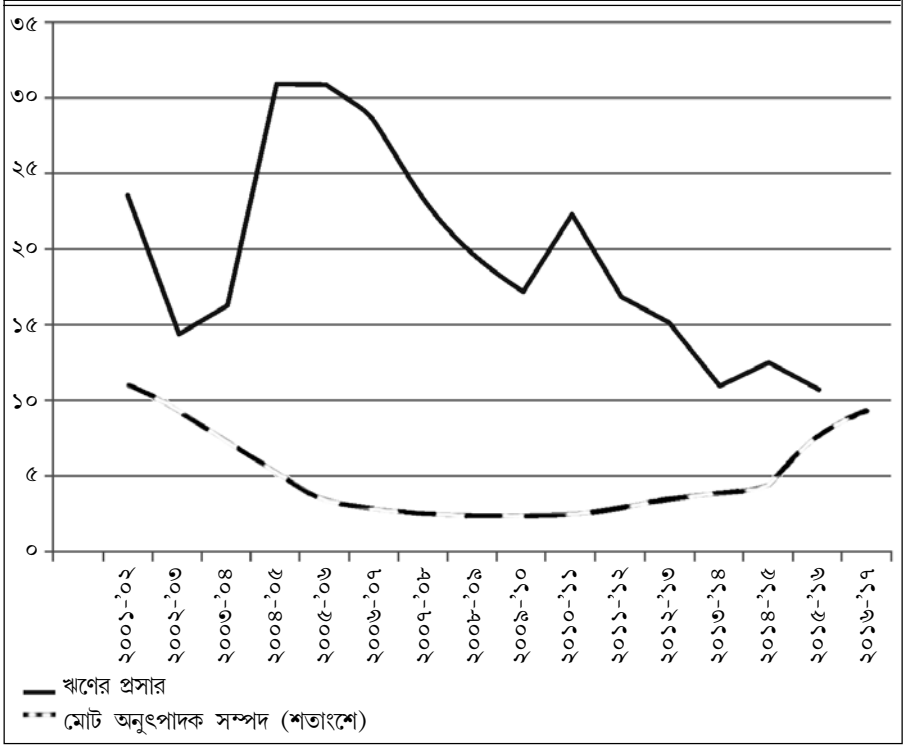

ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। এই আইনকে ভোঁতা করে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা সর্বশক্তি রুখতে হবে। আর এর প্রয়োগ করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে।

ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপে সামিল ব্যবসায়ীরা যাতে ঘুরপথে টাকা সরিয়ে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষিত সংস্থাগুলি ফের কিনে নিতে না পারে, সেজন্য সম্প্রতি জারি হয়েছে অধ্যাদেশ। এক্ষেত্রে সরকার যে তৎপরতা দেখিয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। এর সঙ্গে ২০১৩-র কোম্পানি আইনের ৪৪৭ ধারার যথাযথ প্রয়োগ হলে ঋণখেলাপিরা ভয় পেতে বাধ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা অনুযায়ী, ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপে সামিল বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের নিয়ে আসতে হবে অপরাধীদের তালিকায়। অনেক দেশেই এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে তা ফেরৎ না দেওয়া জন্মগত অধিকার বলে অনেকের ধারণা। তার মূলে কুঠারাঘাত করা জরুরি।

প্রকল্প বাবদ গৃহীত ঋণ শেষপর্যন্ত কোন খাতে কীভাবে খরচ হচ্ছে, সেদিকেও পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রাখতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। এক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ঋণখেলাপের সম্ভাবনা সম্পর্কে আগেভাগেই ইঙ্গিত পাওয়ার প্রচেষ্টা চালানো জরুরি। এইসব কাজের জন্য নভি মুম্বাইয়ের একটি আর্থিক-প্রযুক্তি বা Fintech সংস্থা খুবই কার্যকর সফটওয়্যার তৈরি করেছে। এই সব আর্থিক-প্রযুক্তি ঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মীদের, বিশেষত তরুণ কর্মীদের প্রশিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে।

অন্যদিকে, সরকারের তরফে ব্যাঙ্ক পর্ষদে এমন লোকেদের পাঠাতে হবে, যারা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের কাজকর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল। NCLT বা DRT (Debt Recovery Tribunal) ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করতে হবে। মামলার চাপ সামলাতে এই সব ট্রাইবুন্যালে বাড়াতে হবে বিচারকের সংখ্যা। এসব পদক্ষেপের প্রয়োজন খুব শীঘ্রই আরও বেশি করে বোঝা যাবে।

দেউলিয়া বিধির ফল মিলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে ঋণগ্রহণ এবং দানের বিষয়ে প্রচলিত ধ্যানধারণার বদল আসবে। এই সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করতেই হয়।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক চাঙ্গা করতে মিশন ইন্দ্রধনুষ

ডি. এস. মালিক

প্রকল্প অনুমোদন ও জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, দেশের ভিতরে ও বাইরে চাহিদায় মন্দা ইত্যাদির দরুন পরিকাঠামোয় অর্থের মস্ত বড়ো জোগানদার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেহাল দশা চলছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে। আখেরে কমেছে এসব ব্যাঙ্কের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা। এসব চ্যালেঞ্জ সামলাতে, সরকার ২০১৫-এ হাতে নিয়েছে এক প্ল্যান, যা কি না সাধারণের কাছে "ইন্দ্রধনুষ পরিকল্পনা" নামে পরিচিত। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পুনর্গঠন ও ওই সব ব্যাঙ্কে পুঁজি জোগানোর জন্য কেন্দ্র এই পরিকল্পনার কথা জানায় ২০১৫-র ১৪ আগস্ট। ১৯৭০-এ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর, সরকারের অন্যতম বড়োসড়ো সংস্কার।

দেউলিয়া বিধি সংশোধন ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে মজবুত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তির দিকে নজর রেখে গড়া "বিকল্প ব্যবস্থা"-র জন্য আগামী দু'বছর ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা পুঁজি ঢালার সরকারি ঘোষণা ঘিরে গত দু'মাস যাবৎ আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্র সরগরম। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তুলতে একে আচমকা উদ্যোগ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, সত্যিটা হল এসব কিছুই সরকারের বহু দিনের বিস্তর চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনার ফসল এবং এখন তা আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০১৪-এ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসা ইস্তক, ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কাজকর্ম নিয়ে চর্চার আর শেষ নেই। প্রকল্প অনুমোদন ও জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, দেশের ভিতরে ও বাইরে চাহিদায় মন্দা ইত্যাদির দরুন পরিকাঠামোয় অর্থের মস্ত বড়ো জোগানদার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেহাল দশা চলছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে। আখেরে কমেছে এসব ব্যাঙ্কের মুনাফা অর্জন ক্ষমতা। এসব চ্যালেঞ্জ সামলাতে, সরকার ২০১৫-এ হাতে নিয়েছে এক প্ল্যান, যা কি না সাধারণের কাছে "ইন্দ্রধনুষ পরিকল্পনা" নামে পরিচিত। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পুনর্গঠন ও ওই সব ব্যাঙ্কে পুঁজি জোগানোর জন্য কেন্দ্র এই পরিকল্পনার কথা জানায় ২০১৫-র ১৪ আগস্ট। ১৯৭০-এ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর, সরকারের অন্যতম বড়োসড়ো সংস্কার।

● **নিয়োগ** : চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদকে পৃথক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর পর শূন্যপদ পূরণ করার সময় মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের অভিধা হবে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নন-এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হবে অন্য ব্যক্তিকে।

● **ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো** : পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর ও নন-এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্য নিয়োগ পর্ষদের জায়গা নেবে ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো। এই ব্যুরোয় থাকবেন নামজাদা পেশাদার ও আধিকারিকরা। ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য ঠিকঠাক কর্মকৌশল বা স্ট্র্যাটেজি বানাতে তারা সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পরিচালক পর্ষদ (বোর্ড অব ডিরেক্টরস)-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবেন প্রতিনিয়ত।

● **মূলধন** : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এখন পর্যাপ্ত মূলধন আছে এবং তা বাসেল ৩ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যাবতীয় রীতি মেনে চলার পক্ষে যথেষ্ট। সরকার অবশ্য চায় সব ব্যাঙ্কে বাসেল ৩-এর ন্যূনতম রীতির চেয়ে বেশি মূলধন রাখতে, যাতে তা আপৎকালীন পরিস্থিতি সামলাতে বাফার-এর কাজ করে। ২০১৯ অর্থবছর অবধি, চার বছরে এজন্য চাই বাড়তি ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা মূলধন। ব্যাঙ্কের আকার ও তার বিকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আগামী ৩ বছরে ১২-১৫ শতাংশ এবং চলতি বছর ১২ শতাংশ বিকাশ হারের ভিত্তিতে এই প্রয়োজনীয় মূলধনের হিসেব কষা হয়েছে।

[লেখক মহানির্দেশক, পত্র সূচনা কার্যালয় (গণমাধ্যম ও সংবাদ), অর্থ। ই-মেল : dprfinance@gmail.com]

এর মধ্যে কেন্দ্রের বাজেট থেকে আসবে ৭০ হাজার কোটি টাকা। চার বছরে বাজেট থেকে মিলবে :

২০১৫-'১৬ অর্থ-বছরে	২০১৬-'১৭ অর্থ-বছরে	২০১৭-'১৮ অর্থ-বছরে	২০১৮-'১৯ অর্থ-বছরে
২৫ হাজার কোটি টাকা	২৫ হাজার কোটি টাকা	১০ হাজার কোটি টাকা	১০ হাজার কোটি টাকা

● **(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংকট ঘোচানো :** গত কয়েক দশক ধরে, পরিকাঠামো ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রধান খাতক। বেশ কিছু কারণে, এসব প্রকল্প ঝুলে থাকায়, ব্যাঙ্কে বেড়েছে অনুৎপাদনশীল সম্পদ বা খেলাপি ঋণের বোঝা। অধুনা এক পর্যালোচনায়, শক্তি, ইস্পাত ও সড়ক ক্ষেত্রের সমস্যাদি খতিয়ে দেখা হয়। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে বসা হয় আলোচনায়। বৈঠকের পর গৃহীত হয় কিছু ব্যবস্থা হল।

■ প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক গোষ্ঠী (ক্যাবিনেট সচিবালয়)/সেই সংক্রান্ত মন্ত্রক ঝুলে থাকা অনুমোদন/পারমিট-এর বিষয়ে চটজলদি সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে।

■ প্রকল্প রূপায়ণে সাহায্য করতে মুলতুবি রাখা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার বিষয়টি দেখবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/দপ্তর।

■ কয়লা/পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এসব প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি পাওয়ার বিষয়ে নীতি ঠিক করবে।

■ দ্রুত সংস্কারে সক্ষম করার জন্য সংশ্লিষ্ট বণ্টনকারী সংস্থাগুলিকে (ডিসকম) সাহায্য করা হবে।

■ প্রোমোটার বা উদ্যোগীদের বলা হবে আরও মূলধন আনতে। প্রোমোটর তা করতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনায় রদবদল বা ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে তুলে নেওয়া বিকল্প পথ ভেবে দেখবে।

■ অনুসারী শিল্পকে অসুবিধেয় না ফেলে প্রচলিত শুল্ক হার রদবদল করতে সরকার বিবেচনা করবে। ইস্পাতে আমদানি শুল্ক ইতোমধ্যে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

■ প্রদত্ত ঋণের পুনর্গঠনে আরও ক্ষমতা দিতে ব্যাঙ্কের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে।

ইন্দ্রধনুষ পরিকল্পনার প্রধান দিকগুলি

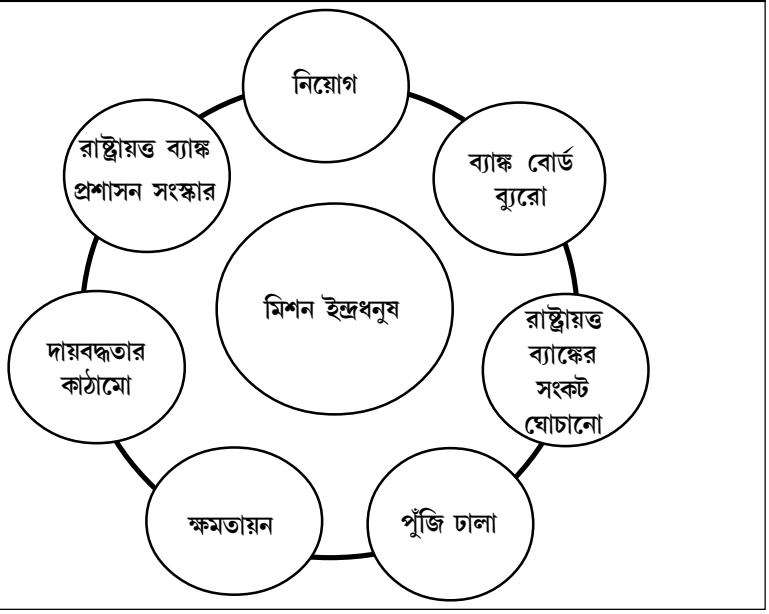

● **(খ) ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার ও খেলাপি ঋণ প্রকাশ করা :** বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য Debts Recovery Tribunal ও Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest-এর মাধ্যমে প্রচেষ্টা ছাড়াও, অনুৎপাদনশীল সম্পদের ইস্যু নিষ্পত্তির জন্য নিচে উল্লিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে :

■ "আর্থিক সঙ্কট দ্রুত নির্ণয়, ঋণদাতার ন্যায্য পাওনা উদ্ধারে সত্বর পদক্ষেপ : অর্থনীতিতে বিপন্ন সম্পদকে ফের চাঙ্গা করে তুলতে কাঠামো"-এর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০১৪ সালে নীতিনির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

■ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে অনিচ্ছুক বা অসহযোগী খাতক নামে ঋণগ্রহীতাদের এক নতুন শ্রেণিবিভাগ করেছে। অনিচ্ছুক বলে চিহ্নিত খাতকদের ঋণ বাবদ ব্যালান্স শিটে আরও বেশি সংস্থানের ব্যবস্থা দরকার হবে।

■ **সম্পদ পুনর্গঠন কোম্পানি :** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এসব কোম্পানির জন্য নিয়মকানুন আরও কড়াকড়ি করেছে। আগেকার ৫-এর জায়গায় সিকিউরিটি রিসিটে ন্যূনতম বিনিয়োগ হবে ১৫ শতাংশ। এর দরুন তাদের কেনা সম্পদ বাবদ কোম্পানিগুলিকে আরও টাকা দিতে হবে। এর সুবাদে আগাম বাবদ টাকা আসায়, ব্যাঙ্ক তার ব্যালান্স পরিচ্ছন্ন রাখতে উৎসাহ পাবে।

■ **৬-টি নতুন ডেটস ট্রাইব্যুনাল গঠন :** ব্যাঙ্কের মন্দ ঋণ আদায়ে গতি আনার জন্য চণ্ডিগড়, বেঙ্গালুরু, এর্নাকুলাম, দেরাদুন, শিলিগুড়ি ও হায়দরাবাদে নতুন ট্রাইব্যুনাল পত্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

■ **ক্ষমতায়ন :** সরকার বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে জানিয়েছে সরকারের তরফে কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং সংস্থার বাণিজ্যিক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

■ **দায়বদ্ধতার কাঠামো :**

■ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পারফরম্যান্স মাপার জন্য পারফরম্যান্সের প্রধান নির্দেশকগুলির এক নতুন কাঠামো।

■ অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি মারফৎ, জালিয়াতির অভিযোগ সত্বর সিবিআই-কে জানানোর ও প্রতিটি কেসে প্রায় রোজকার ভিত্তিতে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে।

■ কর্মীদের চক্রান্ত-সহ সব বড়োসড়ো প্রতারণায় আশু ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভিজিল্যান্স প্রক্রিয়া জোরদার করা। ঋণ জালিয়াতির মোকাবিলার জন্য কাঠামো আরও কার্যকর করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০১৫-র মে মাসে জারি করেছে নীতিনির্দেশিকা।

■ **প্রশাসন সংস্কার :** প্রশাসন সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয় "জ্ঞানসঙ্গম" বৈঠক দিয়ে। ২০১৫-র গোড়ায় পুণেতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির এই সম্মেলনে হাজির ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমেত সব সংশ্লিষ্ট পক্ষ। সভায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ও তৎকালীন অর্থ

প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত সিন্‌হা। আর্থিক স্বায়ত্তশাসন-সহ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নিত্য দিনকার বাণিজ্যিক কাজকর্মে সরকারের তরফে নাক না গলানোর আশ্বাস দেন। তিনি অবশ্য মনে করিয়ে দেন, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থাগুলিকে তাদের দায়বদ্ধতা ও তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা, সেকথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। জ্ঞানসঙ্গমের সুপারিশের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা রীতকরণ জোরদার করা অন্যতম। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং সমন্বয়ের বাধাবিঘ্ন হঠিয়ে ব্যাঙ্কগুলির একযোগে কাজ করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির বোর্ডের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। ব্যাঙ্ক সংস্কারের সঙ্গে তালমিল রেখে, গত বছর কয়েকটি বড়ো উদ্যোগ সম্পন্ন করা হয়েছে :

✓ **দেউলিয়া বিধি**—কোম্পানি ও সীমিত দায়ের সংস্থাগুলি (সীমিত দায়ের অংশীদারি সংস্থা ও সীমিত দায়ের অন্যান্য সংস্থা-সহ), অসীম দায়ের অংশীদারি সংস্থা ও ব্যক্তির দেউলিয়া সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি আইনের নিয়মকানুন একটিমাত্র আইনের আওতায় এনে নিয়মকানুনগুলি সংহত করার লক্ষ্যে দেউলিয়া বিধি জারি হয় ২০১৬-র ২৮ মে। বিপন্ন সম্পদের জন্য ব্যাঙ্কগুলিতে জমেছে পাহাড়প্রমাণ অনুৎপাদক সম্পদ। এসব সম্পদের নিলামে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের অংশ নিতে না দেওয়ার জন্য দেউলিয়া বিধি সম্প্রতি সংশোধন করা হয়েছে।

■ **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ফের পুঁজি ঢালা**—ঋণদান ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে , সরকার চেয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আরও মূলধন জোগাতে। চলতি বছরে বরাদ্দ করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি পুঁজি। আগামী ২ বছরে বরাদ্দ হবে ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে বাজেট থেকে আসবে ১৮,১৩৯ কোটি টাকা, পুনর্মূলধনীকরণ বন্ড মারফৎ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা ও সরকারের শেয়ারের কিছুটা বেচে বাদবাকিটা (প্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা) ব্যাঙ্ক তুলবে বাজার থেকে।

■ **ব্যাঙ্কের সংহতি**—গত কয়েকটি বছরে, ব্যাঙ্কের সংহতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ডায় থাকলেও, ভারতে স্টেট ব্যাঙ্কের ৬-টি সহযোগী ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ক ভারতের স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে যাওয়া ছাড়া, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সংযুক্তি হয়নি। বেসরকারি ক্ষেত্রে গুটিকয়েক সংযুক্তি ঘটেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর উর্জিত পটেল বলেছেন কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তির মাধ্যমে কম সংখ্যক কিন্তু জোরদার সংস্থা হলে ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আরও ভালো ফল করবে।

ইতোমধ্যে, সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংহতির জন্য গঠন করেছে এক কমিটি। কমিটির প্রধান অর্থ মন্ত্রী অরুণ জেটলি। দুই সদস্য : রেল ও কয়লা মন্ত্রী পীযূষ গয়াল এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

সংযুক্তির রূপরেখা প্রণয়নে নীতিগত অনুমোদনের জন্য ব্যাঙ্কগুলি থেকে পাওয়া প্রস্তাব পেশ করা হবে এই কমিটিতে। কমিটি তিন মাস অন্তর এসব প্রস্তাব সংক্রান্ত তার রিপোর্ট পাঠাবে মন্ত্রিসভার (ক্যাবিনেটের) কাছে। কমিটি ব্যাঙ্কগুলিকেও নির্দেশ দিতে পারে সংযুক্তির প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে। নীতিগত অনুমোদন দেওয়ার আগে কমিটি এব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খোঁজখবর নেবে। ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া সংযুক্তির প্রস্তাব যাচাইয়ের জন্য কমিটি তার নিজস্ব পদ্ধতি ঠিক করবে এবং জাতীয়করণ আইন (ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ অ্যাকুইজিশান অ্যান্ড ট্রান্সফার অব আন্ডারটেকিংস অ্যাক্টস, ১৯৭০ এবং ১৯৮০)-এর লক্ষ্য দ্বারা চালিত হবে।

চূড়ান্ত প্রকল্পে কেন্দ্রের সিলমোহরের পর তা পেশ করা হবে সংসদের উভয়কক্ষে। বিকল্প ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকবে আর্থিক পরিষেবা দপ্তরের হাতে।

এছাড়া, নিকট ভবিষ্যতে ইন্দ্রধনুষের উন্নত সংস্করণ নিয়ে আসারও পরিকল্পনা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের। রাষ্ট্রায়ত্ত ঋণদাতা সংস্থাগুলিতে আরও পুঁজি জোগানোর জন্য এই নতুন সংস্করণের বিশদ পরিকল্পনার লক্ষ্য সংস্থার স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা এবং বাসেল ৩ মাফিক পর্যাপ্ত মূলধনের রীতি পুরোদস্তুর মেনে চলা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পদ গুণমান পর্যালোচনার বিস্তারিত বিশ্লেষণের পরই চূড়ান্ত হবে নতুন ইন্দ্রধনুষ। নয়া ইন্দ্রধনুষের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আরও মূলধনের জন্য পরিমার্জিত কর্মসূচি প্রকাশ করা হবে।❑

ভারত সরকার

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তির তদারকি করতে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে কমিটি

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংহতি দ্রুত করতে বিকল্প ব্যবস্থা

- দেশের ২১-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে সংযুক্তি তদারকি করতে সরকার গঠন করেছে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপর্যায়ের এক কমিটি।
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আরও ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা পুঁজি জোগানোর জন্য সরকারি পরিকল্পনা ঘোষণার সাতদিনের কম সময়ে এই সিদ্ধান্ত।

কমিটির সদস্য : ● রেল ও কয়লা মন্ত্রী পীযূষ গয়াস ● প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ

সংহতি

- একই এলাকায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সম্পদ ব্যয় বন্ধ করা।
- বিপন্ন সম্পদ-সহ তাদের ক্রেডিট পোর্টফোলিও আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করবে।
- ধাক্কা সামলাতে ব্যাঙ্কগুলির শক্তি বাড়াবে।
- দুর্বল ব্যাঙ্কে পুঁজি ঢালার মতো ব্যবস্থার পাশাপাশি এ পরিকল্পনার সুবাদে ব্যাঙ্ক হয়ে উঠবে চাঙ্গা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

প্রসঙ্গ ক্রেডিট রেটিংয়ে ভারতের সাম্প্রতিক উন্নতি

প্রভাকর সাহু, ভবেশ গর্গ

আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থাগুলি আজ অবধি ভারতের প্রতি অন্যায় করে এসেছে। ভারতের রেটিং মুডিজ সদ্য সদ্য বাড়ানোয় তা ভারতীয় অর্থনীতির থিতু হওয়ার পরিচায়ক। এটা ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় লগ্নিকারীদের আস্থার প্রমাণও বটে। এস অ্যান্ড পি এসব দিক উপেক্ষা করে ভারতের রেটিং একই রেখে দিয়েছে। ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলির মনোভাব তাই ভারতের প্রতি বৈমাসুলভ, এ বক্তব্য বেশ যুক্তিপূর্ণ। এই বিরুদ্ধ মনোভাবে ভারতের ক্ষতি হচ্ছে; কেননা, তার অর্থনীতি বেড়ে চলেছে এবং আরও বেশি বিকাশ হার অর্জনের জন্য এদেশ বিদেশি লগ্নি টানতে মরিয়া। অন্যান্য সংস্থা রেটিং ঠিকঠাক বাড়ালে পুঁজি টানতে তা ভারতকে সাহায্য করবে।

এ বছরের গোড়ার দিকে, ২০১৬-'১৭-র অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলেছিল, আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং বা ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা মূলায়নকারী সংস্থাগুলির মানদণ্ডে ভারতীয় অর্থনীতির বিপক্ষে এক প্রবণতা বিদ্যমান। ভারতের ক্রেডিট রেটিংয়ের উন্নতি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চলছিল বেশ কিছুদিন যাবৎ। অবশেষে, নামজাদা সংস্থা মুডিজ সদ্য সদ্য ভারতের রেটিং BAA3 থেকে BAA2-এ উন্নীত করেছে। এই উন্নতি হল তেরো বছরেরও বেশি পরে। ভারতের এই উন্নতির জন্য বেশ কিছু কারণ দেখিয়েছে সংস্থাটি। পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালু-সহ কর ব্যবস্থায় সংস্কার, নয়া দেউলিয়া বিধি প্রবর্তন, সীমিত নগদের অর্থনীতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, এসবের অন্যতম। এছাড়া আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি, সড়ক ও বন্দর নেটওয়ার্ক মজবুত করতে নানা নতুন প্রকল্প ঘোষণা-সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বদান এবং রাজস্ব ক্ষেত্রকে সংহত করার পথ অনুসরণ। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যবসা সহায়ক পরিবেশের সূচকে এক বছরে ৩০ ধাপ উঠে প্রথম ১০০-টি দেশের পঙ্‌ক্তিতে ঠাঁই করে নেওয়ার পর, এটা ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে দু' নম্বর সুখবর। গত কয়েক বছরে ভারতীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও, আর এক প্রখ্যাত সংস্থা এস অ্যান্ড পি অবশ্য ভারতের ক্রেডিট রেটিং বদলায়নি। ২০০৭ সাল থেকে ভারতের রেটিং তাদের মূল্যায়নে একই রয়ে গেছে।

ক্রেডিট রেটিংয়ে উপরে ওঠার ফায়দা

কোনও দেশের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা বিচারের জন্য, মূল্যায়নকারী সংস্থাগুলি তার ধার মেটানোর এলেম ও ইচ্ছা (এবং খেলাপির সম্ভাবনা) জানতে ঋণ পেতে আগ্রহী দেশের আর্থিক, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ও স্থিতিশীলতার নির্দেশকগুলি বিশদভাবে খতিয়ে দেখে। এক্ষেত্রে বিশ্ব বাজার মূলত তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থার (এস অ্যান্ড পি, মুডিজ ও ফিচ) কব্জায়। সংস্থাগুলির বক্তব্য, ক্রেডিট রেটিং উঁচুতে থাকলেই, ঋণ মিটিয়ে দেওয়া হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কেননা, ভবিষ্যতের নির্ভুল আভাস দেওয়া যায় না এবং রেটিংকে কেবলমাত্র বাজারের এক সংকেত হিসেবে গণ্য করা উচিত। এছাড়া, ক্রেডিট রেটিং নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য, সংস্থাগুলি একই ধরনের বিষয় বিবেচনা করে না। দুনিয়াজোড়া আর্থিক সংকটের পর, 'AAA' রেটেড বিনিয়োগও বাকি পড়ায় মূল্যায়নকারী সংস্থাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুটা ঘা খেয়েছে। তাই বলে, সংস্থাগুলির গুরুত্ব কমে যায়নি। ক্রেডিট রেটিং-এর ক্ষেত্রে নিয়মভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। এই রেটিং বস্তুগত নয়, দৃষ্টিভঙ্গিমূলক বা মনোগত। কিন্তু এই রেটিং ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে বলে তার গুরুত্ব থেকেই

[প্রভাকর সাহু অধ্যাপক, ইনসটিটিউট অব ইকনমিক, দিল্লি। ই-মেল : pravakarfirst@gmail.com। ভবেশ গর্গ, ডক্টরাল স্কলার, ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট, হায়দরাবাদ। ই-মেল : bhaveshgarg89@gmail.com]

গেছে এবং দেশগুলিও রেটিং-এর উপর নির্ভরশীল (কেরওয়ের, ২০০৫)।

আন্তর্জাতিক অর্থ বাজারে পুঁজি জোগাড়ে ও বিদেশি লগ্নি টানতে, ভারতের মতো উদীয়মান বাজার অর্থনীতিতে সরকার এবং কোম্পানিগুলি আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থাগুলির রেটিং-এর উপর নির্ভরশীল। ক্রেডিট রেটিং তাই বিনিয়োগ আনতে এবং তার মাধ্যমে দেশের বিকাশ হার বাড়াতে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করে। রেটিং-এর জন্য, মূল্যায়ন সংস্থাগুলি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং সমুদয় ও বিদেশি ঋণের অনুপাত, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, মূলধন ও প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি আসা, রাজস্ব ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঘাটতি এবং অর্থনীতির খেলাপির ইতিহাসের মতো নির্দেশকগুলি ধর্তব্যের মধ্যে নেয়।

মুডিজের রেটিং-এ এক ধাপ ওঠার সুবাদে ভারতের লাভ হবে বহুভাবে। ভারতে মূলধনের টানাটানি আছে। রেটিং-এ উন্নতির দরুন বাইরের থেকে মূলধন টানার সুরাহা হবে কিছুটা। এটা বিকাশ হার আরও বাড়ানোয় সাহায্য করবে। ধার নেওয়ার ব্যয় কমবে, কেননা, ঋণ বাবদ ঝুঁকির প্রিমিয়াম যাবে কমে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি মেটাতে টাকা জোগাড় সহজ হবে ও এ টাকা পাওয়া যাবে কম খরচে। বিনিয়োগে জোয়ার এনে, শেয়ার বাজারের পারফরম্যান্সেও হবে উন্নতি।

ভারতীয় অর্থনীতির সাফল্য

গত দশকে ভারতীয় অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো ফল করেছে। গড়ে বিকাশ হার বেড়েছে ৭.৬৮ শতাংশ। বস্তুত, উদীয়মান অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারতের বিকাশ হার সবচেয়ে বেশি। ২০১৭-'১৮-তে এই হার ৭.২ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিকাশ হার বেড়েছে মূলত রপ্তানি ও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির উপর ভর করে। ভারত বিকাশ হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে গেছে। ওইসব দেশের বিকাশ হার বেড়েছে মাত্র ৪.১ শতাংশ (বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ২০১৭)।

সারণি-১
ভারতীয় অর্থনীতির সমষ্টিগত অর্থনীতির নির্দেশক

বছর	কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশে)	সরকারি কোষাগারের ঘাটতি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশে)	প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট ঋণ (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতাংশে)
২০০৭	১.০	৫.১	২২.৮২৬	৭৪.০২৭
২০০৮	১.৩	৪.০	৩৪.৮৪৪	৭৪.৫৩৬
২০০৯	২.৩	৮.৩	৪১.৯০৩	৭২.৫২৭
২০১০	২.৮	৯.৩	৩৭.৭৪৫	৬৭.৪৫৮
২০১১	২.৮	৬.৯	৩৬.০৪৭	৬৯.৬৪৩
২০১২	৪.২	৭.৮	৪৬.৫৫১	৬৯.১০৫
২০১৩	৪.৮	৬.৯	৩৪.২৯৮	৬৮.৫২৯
২০১৪	১.৭	৬.৭	৩৬.০৪৭	৬৮.৫৭৬
২০১৫	১.৩	৬.৭	৪৫.১৪৭	৬৯.৫৫১
২০১৬	১.১	৭.৫	৫৫.৫৫৮	৬৯.৫৩৭

উৎস : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার—আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিসংখ্যান

সারণি-১-এ ভারতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নির্দেশক সংক্রান্ত খতিয়ান তুলে ধরেছে।

দেখা যাচ্ছে যে, দুনিয়াজোড়া আর্থিক সঙ্কট ইস্তক, কারেন্ট অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ২০১৩ সালে সরকারি কোষাগারের ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ৭ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পাশাপাশি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতিও পৌঁছে যায় ৪.৮ শতাংশে। অভূতপূর্ব এত চড়া ঘাটতির দরুন ভেঙে পড়ার ভয় ছিল। কর্মসংস্থান এবং বিকাশ হার আরও বাড়াতে, উৎপাদন শিল্পকে জোরদার করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্মসূচি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বা ভারতে বানাও-এর হাত ধরে, অর্থনীতি চড়া ঘাটতির ঝড়ঝাপটা সামলে নেয় এবং মূলধন আনার মাধ্যমে অর্থসংস্থানের হিল্লে করে ফেলে। প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি ২০০৭-র ২২.৮২৬ বিলিয়ন ডলার থেকে দু'গুণ বেড়ে ২০১৬-এ পৌঁছয় ৫৫.৫৫৮ বিলিয়ন ডলারে। ২০২০ সালের মধ্যে উৎপাদন শিল্পের অংশভাক বাড়িয়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২৫ শতাংশ করার লক্ষ্য নিয়ে, ভারতে বানাও কর্মসূচি ২৫-টি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। এই কর্মসূচি চালু হওয়া ইস্তক, সরকার ব্যাপক সংস্কার শুরু করেছে। এর মধ্যে আছে পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশগত অনুমতি ও ছাড়পত্র সহজ করা, মেধা সম্পদ অধিকার সুরক্ষা, ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, ছোটো ও মাঝারি সংস্থাকে উৎসাহ, কর ব্যবস্থায় সংস্কারসাধন, শ্রম আইন সংশোধন, প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি রীতির কড়াকড়ি শিথিল এবং বাণিজ্য নীতির রদবদলে গুরুত্ব দিয়ে খোলা অর্থনীতির বিকাশ। কয়েক বছর যাবৎ, সরকারের সুসঙ্গত ও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক নীতির দরুন বাণিজ্যের পরিবেশ থিতু হয়েছে। মূলধন আগমন বৃদ্ধির ফলে, বিনিয়োগে আরও নিশ্চয়তা এসেছে। বিকাশ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে বলে গত কয়েক বছর এর সদর্থক প্রভাব পড়েছে। রাজস্ব ক্ষেত্রে অবশ্য কিঞ্চিৎ অবনতি দেখা গেছে। তবে রাজস্বে ভারসাম্য আনতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে।

কোনও দেশের রেটিং-এ মোট ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত এক বড়ো নির্ণায়ক। ২০০৩-এ ভারতে এই অনুপাত ছিল সবচেয়ে চড়া, ৮৪.২ শতাংশ। এরপর এই অনুপাত ফি বছর কমতে থাকে এবং ২০১৬ সালে তা দাঁড়ায় ৬৯.৫ শতাংশ। ভারতের মোট দেনার মধ্যে সরকারি ঋণ

মাত্র ৪২ শতাংশ। এর অধিকাংশ আবার অভ্যন্তরীণ। এস অ্যান্ড পি ভারতের রেটিং-এ উন্নতি দেখিয়েছিল ২০০৭-এ। তখন মোট ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ছিল ৭৭.১ শতাংশ। ২০১৬-এ তা কমে দাঁড়ায় ৬৯.৫ শতাংশ।

ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ২০২৩-এর মধ্যে ৬০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ঋণের একটা বড়ো অংশ খরচ হয় সুদ মেটাতে। কমিটি অবশ্য বলেছে অর্থনীতির রাজস্ব স্বাস্থ্য মজবুত রাখতে সরকারি কোষাগারে ঘাটতি বজায় রাখাই সমীচীন।

বিদেশি ঋণ নির্দেশকের প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, মোট বিদেশি ঋণের ৮৩ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদের। স্বল্পমেয়াদি ঋণ ঘোরাফেরা করেছে ১৭ শতাংশের কাছাকাছি (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। ঋণের আসল ও সুদ মেটানোর অনুপাত ২০১৪-র ৫.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬-এ দাঁড়িয়েছে ৮.৮ শতাংশ এবং তা একটু হলেও উদ্বেগের কারণ বৈকি। ২০০৭ থেকে ২০১৬-এ ভারতের বিদেশি ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত বেড়েছে প্রায় ৬ শতাংশ পয়েন্ট। ওই সময় অবশ্য দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ এবং মোট বিদেশি ঋণের অনুপাতে পরিবর্তন হয়েছে ১ শতাংশ পয়েন্টের কম। মোট বিদেশি ঋণে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণের অংশভাক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পরিস্থিতি নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়ার হেতু নেই। বস্তুত, মোট বিদেশি ঋণে দীর্ঘয়োদি ঋণের অনুপাত ২০১৩ থেকে ২০১৬-এ বেড়েছে ৬ শতাংশ পয়েন্ট, অর্থাৎ বর্তমানে তেমন একটা উদ্বেগের কারণ নেই।

ক্রেডিট রেটিং-এর ক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় আর এক স্থিতিশীলতার নির্দেশক। ২০০৭-এ ১৯,৯১৭.৯ কোটি ডলার থেকে ভারতের বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় ২০১৬-এ বেড়ে হয় ৩৬,০১৭.৬ কোটি ডলার। নিকট ভবিষ্যতে তাই মূলধন আসা কমলেও সামাল দেওয়া যাবে। ২০১৩ সালে ৭ মাস বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় কম হওয়া সত্ত্বেও, ২০১৭-এ বিদেশি মুদ্রা ভাঁড়ারে জমা ৪০,০০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায়, আমদানি বাবদ প্রাপ্য

সারণি-২
ভারতের প্রধান বিদেশি ঋণের নির্দেশক ও অনুপাত

বছর ঋণের আসল ও সুদ অনুপাত	বিদেশি সুদ মেটানো (মার্কিন ডলারে)	বিদেশি ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও মোট বিদেশি ঋণের অনুপাত	স্বল্পমেয়াদের ঋণ ও মোট বিদেশি ঋণের অনুপাত
২০০৭ (৪.৭)	১৭২.৩৬	১৭.৫	৮৩.৭	১৬.৩
২০০৮ (৪.৮)	২২.৪.৪০৭	১৮.০	৭৯.৬	২০.৪
২০০৯ (৪.৪)	২২৪.৪৯৮	২০.৩	৮০.৭	১৯.৩
২০১০ (৫.৮)	২৬০.৯৩৫	১৮.২	৭৯.৯	২০.১
২০১১ (৪.৪)	৩১৭.৮৯১	১৮.২	৭৯.৬	২০.৪
২০১২ (৬.০)	৩৬০.৭৬৬	২১.১	৭৮.৩	২১.৭
২০১৩ (৫.৯)	৪০৯.৩৭৪	২২.৪	৭৬.৪	২৩.৬
২০১৪ (৫.৯)	৪৪৬.১৭৮	২৩.৮	৭৯.৫	২০.৫
২০১৫ (৭.৬)	৪৭৪.৬৭৫	২৩.৮	৮২.০	১৮.০
২০১৬ (৮.৮)	৪৮৫.০২৩	২৩.৭	৮২.৮	১৭.২

সূত্র : ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

মেটাতে মাস ১২ কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নির্দেশকগুলিতে উন্নতি ছাড়াও, লগ্নি ও বিকাশের জন্য সরকার বেশ কিছু সংস্কারের কাছ চালাচ্ছে। পরিকাঠামো খাতে আরও সম্পদ বরাদ্দ, বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি, দ্রুত অনুমোদনের জন্য স্বচ্ছতা আনা, শ্রম সংস্কারের উদ্যোগ নিতে রাজ্যগুলিকে উৎসাহ দেওয়া, ব্যবসা সহজ করার জন্য দেউলিয়া বিধি-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি পণ্য ও পরিষেবা কর, এসবের অন্যতম। উৎপাদন শিল্পে আরও কর্মসংস্থান, আরও লগ্নির জন্য সরকার হাতে নিয়েছে 'ভারতে বানাও' কর্মসূচি এবং 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া', 'স্কিল ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-এর মতো অনুপূরক কর্মসূচি। থমকে যাওয়া প্রকল্প পুনরুজ্জীবন ও কর্পোরেট এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ব্যালান্স শিট সমস্যা ঘোচাতে সাহায্য করার জন্য দেউলিয়া বিধি প্রবর্তন লগ্নির রেটিং উন্নত করার অন্যতম সেরা উপায়।

বৈষম্য : চিন বনাম ভারত

ভারতীয় নীতি প্রণেতারা মনে করেন মূল্যায়নকারী সংস্থাগুলির স্ট্যান্ডার্ড বা গড়মান সঙ্গতিহীন, বিশেষত ভারত ও চিনের ব্যাপারে এবং সংস্থাগুলির ক্রেডিট রেটিং-এর সঙ্গে তারা একমত নন (ভারত সরকার, ২০১৭)। এবছর কিছুদিন আগে এ নিয়ে বিতর্ক আরও দানা বাঁধে যখন স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়োর'স (এস অ্যান্ড পি) সঠিকভাবেই চিনের রেটিং 'A+' থেকে 'AA–'-এ নামিয়ে আনে, কিন্তু সমষ্টিগত অর্থনীতিক মৌলগুলির উন্নতি সত্ত্বেও ভারতের রেটিং না বাড়ানোয়। ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা,

মূল্যায়নকারী সংস্থাগুলি, বিশেষত এস অ্যান্ড পি-র রেটিং-কে 'নিকৃষ্ট' বা ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দেন। ২০০৭-এ এস অ্যান্ড পি ভারতের রেটিং 'BBB–'-এ উন্নীত করে। তারপর গত ১০ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০০৯; মার্চ, ২০১০; এপ্রিল, ২০১২ ও সেপ্টেম্বর, ২০১৪) চার বার এস অ্যান্ড পি ভারতের রেটিং একই রেখে দেয়। মুডিজও ভারতের রেটিং বাড়াতে সময় লাগিয়েছে ১৩ বছরের বেশি। নীতি বিশ্লেষক ও বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উন্নতিও যতটা হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে কম দেখানো হয়েছে। এর আগেই এবং আরও এক ধাপ উঁচু রেটিং ভারতের প্রাপ্য ছিল।

এবার আসা যাক, অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির সঙ্গে তুলনায়। এস অ্যান্ড পি আরও গুটি কয়েক উদীয়মান অর্থনীতিকে 'BBB–'-এর তকমা দিয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতির মতো তারা কিন্তু ততটা ভালো ফল না করা সত্ত্বেও। ২০১৪-'১৬-এ হাঙ্গেরির গড় বিকাশ ৩.০৬ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ায় ৪.৯৬ শতাংশ, রাশিয়ায় – ০.৭৯ এবং উরুগুয়েতে ১.৮৮ শতাংশ (এসব দেশ পেয়েছে এস অ্যান্ড পি-র 'BBB–'-রেটিং), ভারতে কিন্তু এই সময়কালে গড় বিকাশ ৭.৩ শতাংশের মতো। এ থেকে দেখা যাচ্ছে রেটিং-এ একই বন্ধনীতে থাকা অন্যান্য দেশগুলিকে ভারত ছাড়িয়ে গেছে। মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রেও, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া ও উরুগুয়ের চেয়ে ভারত ভালো করেছে। মোট সরকারি ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাতে, হাঙ্গেরি (২০১৬-এ ৭৪.১৯) এবং ইটালির (২০১৬-এ ১৩২.৬০) তুলনায় ভারতের অবস্থা ভালো। তবে, হাঙ্গেরি, ইটালি, রাশিয়া ও উরুগুয়ের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে উদ্বৃত্ত আছে। ২০১৩-এ ৪.৮ শতাংশ থাকলেও, ২০১৬-তে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঘাটতি কমে আসে মাত্র ১ শতাংশে। দেনা মেটাতে ভারত কখনও খেলাপ করেনি। এমনকি ঘোর সঙ্কটকালেও। এ থেকে স্পষ্ট, ভারত তার পাওনাগণ্ডা শোধ দেওয়ার এলেম রাখে। এছাড়া, ভারত দেখিয়েছে, প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির মতো মূলধন মারফৎ বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে সে সক্ষম।

বক্স-১
ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য হালফিলের উদ্যোগ

- হরেক কিসিমের আগাম অনুমতির হ্যাপা হঠাতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন।
- এক ২৪ × ৭ বৈদ্যুতিন-ব্যবসা পোর্টাল প্রতিষ্ঠা, এর দরুন এক জায়গাতেই মিলবে ১৪-টি অনুমতি।
- আগামী চার বছরে কোম্পানি কর ৩০ শতাংশ থেকে নেমে হবে ২৫ শতাংশ।
- কর ফাঁকি দমন করার জন্য সাধারণ কর ফাঁকি বিরোধ বিধি (জেনারেল অ্যান্টি-অ্যাভয়ডান্স রুল) আরও দু' বছর বিলম্বিত এবং পূর্বাপর কর (রেট্রসপেকটিভ ট্যাক্স) প্রায় উঠেই গেছে।
- লগ্নিকারীদের সরে আসার পথ আরও সহজ করার নয়া দেউলিয়া বিধি।
- বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদ চটজলদি নিষ্পত্তির জন্য নতুন আইনি ব্যবস্থা।
- কর নিয়ে বিবাদের এক বারে নিষ্পত্তি।
- কোম্পানি আইনে প্রায় ৫০-টি সংশোধনের প্রস্তাব।
- এখনকার গড়ে ১৫-২০ দিনের জায়গায় ১ দিনে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের কাজ সমাধা করার পরিকল্পনা।
- যুবাদের দক্ষ করে তুলতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পর্ষৎ ছাড়াও, ১৫০০-টি বহু রকম দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি বরাদ্দ।
- ২০১৬-র পয়লা মার্চের পর পঞ্জিভুক্ত নতুন সংস্থার ক্ষেত্রে কোম্পানি কর ২৫ শতাংশ এবং স্টার্ট আপ বা সদ্যোজাত কোম্পানিগুলিকে ৫ বছরের মধ্যে ৩ বছর কর দিতে হবে না।
- বৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য ও 'ভারতে বানাও' কর্মসূচির ক্ষেত্রে সাজসরঞ্জাম ও উপকরণ আমদানিতে কর ও শুল্ক কাটছাঁট।
- কার্যনির্বাহী ও বিচার বিভাগের দায়বদ্ধতার উন্নতি করতে প্রযুক্তি ব্যবহার।
- আমদানি-রপ্তানির জন্য নথিপত্রের সংখ্যা ১১ থেকে কমে ৩।
- ৫৬ শতাংশ প্রতিরক্ষা সামগ্রীর জন্য লাগবে না কোনও লাইসেন্স।
- অনাবাসী ভারতীয়দের লগ্নি ভারতীয়দের বিনিয়োগের সমতুল বলে ধরা হবে।

ঋণের বাড়বাড়ন্তের কারণ দেখিয়ে, এস অ্যান্ড পি চিনের রেটিং 'A+' থেকে 'AA–'-তে নামিয়ে আনলেও, তারা ভারতের রেটিং একই রেখে দিয়েছে। ভারত তার বিকাশ হার, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি, মূলধন আগমন ও ঋণ অনুপাতে উন্নতি করা সত্ত্বেও। ভারত ও চিন এ দুই বড়োসড়ো উদীয়মান অর্থনীতি বিদেশি বিনিয়োগ টানার লড়াইয়ে আছে, কিন্তু তাদের সমষ্টিগত অর্থনীতির বনিয়াদ এবং আন্তর্জাতিক লগ্নিক্ষেত্রে অবস্থানের ফারাক এতটাই যে, দু' দেশের মধ্যে তুলনা টানা অসমীচীন।

চিন নয়, ভারত উদারীকরণের পর বাজার-চালিত মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থা অনুসরণ করে এবং অর্থনৈতিক বিকাশ বৃদ্ধির জন্য নয়ের দশকের গোড়া থেকে সরকারি কোষাগারে ও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি চালিয়ে আসছে। এখন, আমরা দেখাচ্ছি বেশ কিছু প্রধান সমষ্টিগত অর্থনীতির নির্দেশকে তার সাফল্যের ভিত্তিতে ভারতের রেটিং আরও উন্নত করার পক্ষে জোর সওয়াল। খুব গুরুত্বপূর্ণ এক মাপকাঠি, মোট ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাত বহু দেশে বেড়ে গেছে। অর্থাৎ, এই অনুপাতের ক্ষেত্রে ঘটেছে অবনতি। জাপানে এই অনুপাত বেড়েছে ২৩৯.২ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে ১১২ শতাংশ, আমেরিকায় ১০৭ শতাংশ। আর স্পেনে তা ৯৯ শতাংশ। ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলি কিন্তু সেদিকে চোখকান বন্ধ রেখে তাদের রেটিং না নামিয়ে একই রেখে দিয়েছে। এসব দেশের তুলনায় ভারতের এই অনুপাত ঢের কম। চিনের তুলনায় অবশ্য বেশি এবং মূল্যায়নকারী সংস্থাগুলি ভারতের রেটিং আরও উন্নত না করার জন্য এর দোহাই পাড়ে (রেখাচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। বিশ্ব ব্যাঙ্কের আন্তর্জাতিক ঋণ পরিসংখ্যান ২০১৬-এ কিন্তু বিদেশি ঋণের বেলায় ভারতের র‍্যাঙ্ক দেখিয়েছে চিন ও ব্রাজিলের পর পরই। ভারত তার ঋণ শুধতে কখনও ব্যর্থ হয়নি। ভারতের রেটিং উন্নত করার পক্ষে এ এক অকাট্য যুক্তি।

এমনকি সরকারি কোষাগারে ও কারেন্ট

অ্যাকাউন্ট ঘাটতির ক্ষেত্রেও, গত ক' বছরে ফাকার এসেছে কমে, যা কি না এসব মাপকাঠিতে উন্নতির পরিচায়ক (রেখাচিত্র-২ দ্রষ্টব্য)। সরকারি কোষাগার ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টের যৌথ ঘাটতি কয়েক বছর যাবৎ আদর্শ বা মান-নির্ণায়ক ১০ শতাংশের নিচেই আছে। সেখানে ২০০৭-এ প্রায় ১০ শতাংশ উদ্বৃত্ত থেকে চিনের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট উদ্বৃত্ত নেমে দাঁড়িয়েছে ২ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতের তুলনায় চিন ভালো অবস্থায় থাকলেও, ভারতীয় অর্থনীতির অনেক ইতিবাচক দিকের জন্য তার রেটিং-এ উন্নতির দাবি যুক্তিসঙ্গত। ২০০৭-এ ২৩০০ কোটি ডলার থেকে দু'গুণের বেশি বেড়ে ২০১৬-এ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি হয়েছে ৫৬০০ কোটি ডলার, যা কিনা এক বছরে এযাবৎ সবচেয়ে বেশি। ভারতের মোট ঋণের মধ্যে, সরকারি ঋণ হচ্ছে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ৪২ শতাংশ। এর মধ্যে বিদেশি ঋণের অংশ শুধুমাত্র ৪ শতাংশ। চিনে ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ২০১০-র ১৪২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-এ হয়েছে ২০৫ শতাংশ। ভারতে কিন্তু তা অনেক কম, ৭০ শতাংশ। সে যাহোক, দু' দেশের মধ্যে তুলনা টানাটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

রেখাচিত্র-১
চিন ও ভারত : মোট ঋণ ও বিদেশি ঋণের ধারা

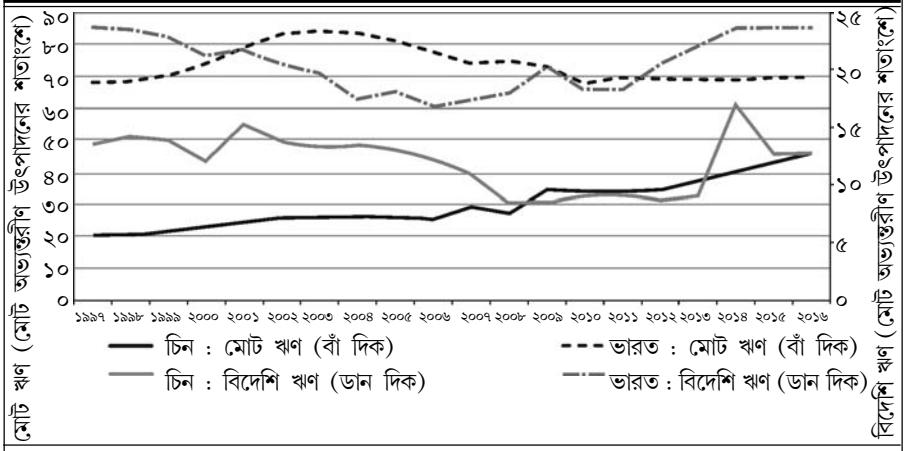

সূত্র : সেন্সাস ইকনমিক ইনফরমেশন সেন্টার (সিইআইসি)

রেখাচিত্র-২
চিন ও ভারত : রাজস্ব ভারসাম্য ও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট

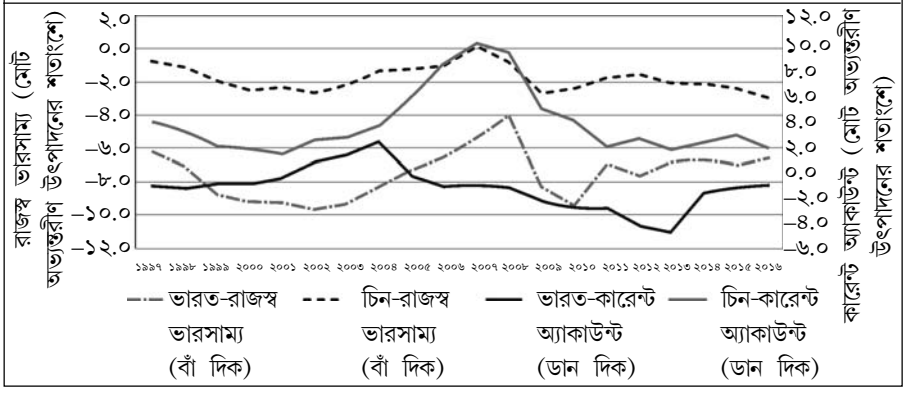

শেষপাত

ভারতের সমষ্টিগত অর্থনীতির হাল, বিশেষত তার লগ্নির অবস্থা ও ঋণের নির্দেশকগুলি (আর্থনীতিক বিকাশ, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স, প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি এবং বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয়) ২০১৩ সাল থেকে উন্নতি করে চলেছে। দেনা শোধ করার ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রশ্নাতীত। ভারত কখনও ঋণ খেলাপ করেনি। ভারত বড়োসড়ো ঋণের বোঝা বওয়ার ক্ষমতা ধরে। স্থিতিশীল এদেশ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বেড়ে চলা অর্থনীতিগুলির অন্যতম। গত ক' বছর যাবৎ ভারতে লগ্নির ব্যাপারে বিনিয়োগকারীদের সদর্থক মনোভাবে তার পরিচয় মেলে।

আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থাগুলি আজ অবধি ভারতের প্রতি অন্যায় করে এসেছে। ভারতের রেটিং মুডিজ সদ্য সদ্য বাড়ানোয় তা ভারতীয় অর্থনীতির থিতু হওয়ার পরিচায়ক। এটা ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় লগ্নিকারীদের আস্থার প্রমাণও বটে। এস অ্যান্ড পি এসব দিক উপেক্ষা করে ভারতের রেটিং একই রেখে দিয়েছে। ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলির মনোভাব তাই ভারতের প্রতি বৈমাসুলভ, এ বক্তব্য বেশ যুক্তিপূর্ণ। এই বিরুদ্ধ মনোভাবে ভারতের ক্ষতি হচ্ছে; কেননা, তার অর্থনীতি বেড়ে চলেছে এবং আরও বেশি বিকাশ হার অর্জনের জন্য এদেশ বিদেশি লগ্নি টানতে মরিয়া। অন্যান্য সংস্থা রেটিং ঠিকঠাক বাড়ালে পুঁজি টানতে তা ভারতকে সাহায্য করবে। আর্থনীতিক বিকাশ বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির লাগাম টেনে ধরার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিকে ঠুনকো করার জন্য দায়ি অন্যান্য দেশের সাপেক্ষে ভারতের রেটিং উন্নত হওয়ার দাবি রাখে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

- GOI (2017). Economic Survey 2016-17. Ministry of Finance. New Delhi.
- Kerwer, D. (2005), Holding Global Regulators Accountable: The Case of Credit Rating Agencies. Governance, 18: 453–475. doi:10.1111/j.1468-0491.2005.00284.x
- World Bank Group. (2016). International Debt Statistics 2016. Washington, DC. DOI:10.1596/978-1-4648-0681-0
- World Bank Group. (2017). Global Economic Prospects, June 2017: A Fragile Recovery. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26800 License: CC BY 3.0 IGO.

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা : সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

মঞ্জুলা ওয়াধাওয়া

গ্রামের গ্রাহক মানেই এখন আর কেবলমাত্র কৃষক ও অশিক্ষিত মানুষজন নন, এই দলে এমন এক প্রজন্ম ইতোমধ্যে শামিল হয়েছে যারা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও তার ব্যবহারে যথেষ্ট সড়োগড়ো। এই পরিবর্তনের সূত্রেই গ্রামের মানুষজনের মধ্যে ব্যাঙ্ক পরিষেবা পাওয়ার যোগ্যতা যথেষ্ট বেড়েছে। কাজেই গ্রামাঞ্চলে অর্থলগ্নির সময় নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। সেখানকার মানুষের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী বিবিধ আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাছে পৌঁছানোর সংস্থান করতে হবে। এই কর্মকাণ্ড চালাতে হবে এক বিস্তৃত আর্থিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে, যার অংশীদার দীর্ঘমেয়াদে নানা গোত্রের গ্রামীণ গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি। আর এটাই চলতি সময়ের দাবি।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর কথায়, গ্রামের মাটিতেই ভারতের অস্তিত্ব। কাজেই ভারতের সার্বিক উন্নয়নের প্রাক্ শর্ত হল গ্রাম ভারতের বিকাশ। স্বাধীনতা-লাভের পর থেকেই তাই আমাদের দেশের নীতি প্রণেতারা গ্রাম ভারতে সমৃদ্ধি আনার উপর পর্যাপ্ত জোর দিতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বিগত সত্তর বছর সময় পর্বে, এই লক্ষ্য পূরণে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের প্রসার ঘটাতে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শুরুটা হয়েছিল সমবায় ঋণ কাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে। তার পর একে একে PSB বা সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ, গ্রামাঞ্চলে সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির শাখা নেটওয়ার্ক বিস্তার, তথা ১৯৭৬ সালে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সূচনার দৌলতে প্রথাগত গ্রামীণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠে তথা তার বহুগুণ প্রসার ঘটে। দুর্ভাগ্যবশত, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে গ্রাম ভারতে ছড়িয়ে দিতে এত সব কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পরও এদেশে গ্রামীণ জনসংখ্যার সিংহভাগকেই প্রথাগত ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সঙ্গে জুড়ে 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তি' ঘটানো সম্ভব হয়নি। তারা এখনও মহাজনদের কুক্ষিগত রয়ে গেছেন, যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এমনকি আজকের দিনেও, গোটা বিশ্বের যত সংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে রয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে ২৪ শতাংশ ভারতীয়। আর এই সংখ্যাটা দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় শামিল না হওয়া প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। এদেশের গ্রামাঞ্চলের এক বিপুল সংখ্যক মানুষজন ব্যাঙ্কের সম্ভাব্য গ্রাহক হতেই পারতেন, অথচ প্রথাগত ব্যাঙ্কিং পরিষেবার নাগাল এরা পাননি এখনও। এদের সংখ্যাটা প্রায় ৩১ কোটির মতো। SLBC-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভারতের ছয় লক্ষের মতো গ্রামের মধ্যে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ১৫১ গ্রামকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসা গেছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ৯৭৬ গ্রামে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে। ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩৬ গ্রামে ব্যাঙ্ক করেসপন্ডেন্ট বা ব্যাঙ্ক মিত্রের মাধ্যমে পরিষেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আর বাকি ২০ হাজার ৫৩৯ গ্রামে ATM বা মোবাইল ভ্যানের মতো অন্যান্য উপায়ে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বোপরি, দুর্বল সামাজিক পরিকাঠামো ও অনুন্নত ভৌত পরিকাঠামো ব্যাঙ্কিং তথা আর্থিক পরিষেবার নাগাল পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গ্রাম ভারতের বিদ্যুতায়নের বাস্তব চিত্রটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

ব্যাঙ্ক শাখাগুলি আবার খোলা থাকে দশটা থেকে পাঁচটা। ভারতে গড় সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। কাজেই সহজেই অনুমেয়, নামমাত্র শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাটা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কী বিপুল! আর এই সব দিন আনে দিন খায় মানুষজন যে গোটা একটা দিনের মজুরি বরবাদ করে ব্যাঙ্কে যেতে আদৌ আগ্রহী হবেন না, সেটা

[লেখক এজিএম, নাবার্ড, হরিয়ানা আরও, চণ্ডিগড়। ই-মেল : manjula.jaipur@gmail.com]

আর বলার অপেক্ষা রাখে কি! কাজেই ব্যাঙ্কগুলিকে অন্য উপায় ভাবতে হচ্ছে, এদেরকে ব্যাঙ্ক ঋণ নিতে তথা সঞ্চয় খাতা খুলতে উৎসাহিত করতে। অসরকারি সংস্থা (NGO), স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মতো মধ্যস্থবর্তী তথা ব্যাঙ্ক মিত্র (Banking Correspondent) এবং ব্যবসা বৃদ্ধি সহায়ক (Business Facilitators) ইত্যাদির মতো আধা-প্রথাগত চ্যানেল ব্যবহার করছে ব্যাঙ্কগুলি। তবে এই সব চ্যানেলের মাধ্যমে পরিষেবা দিতে গিয়ে যেমন বেশ কিছু সমস্যার পড়তে হচ্ছে, তেমনি তাদের বর্তমান ফর্মে কেবলমাত্র সীমিত পরিষেবাই দিয়ে ওঠা যাচ্ছে (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

তা বাদেও গ্রামীণ বাজারকে অনেক ব্যাঙ্কই এক অর্থনৈতিক মওকা হিসাবে না দেখে কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলির তরফে ব্যাঙ্কের উপর চাপিয়ে দেওয়া দায় পূরণের বাধ্যবাধকতা হিসাবেই দেখে থাকে। এর পিছনে নির্দিষ্ট করে কিছু কারণও রয়েছে। গ্রামীণ পরিবারগুলির উপার্জন অনিয়মিত, তাদের খরচখরচার ধরনধারণও নির্দিষ্ট নয়। সেই কারণেই গ্রামীণ এলাকায় ব্যাঙ্ক ঋণ খেলাপের হার বেশ বেশি। গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি মূলত বর্ষার মেজাজ মর্জির উপর নির্ভরশীল বলে উল্লিখিত ইস্যুটি আরও জটিল রূপ ধারণ করে। রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার বাধ্যবাধকতার সূত্রে ঋণ মকুবের দৌলতে ব্যাঙ্কের সংকট আরও বাড়ে। গ্রামের মানুষজন ব্যাঙ্কে যখন আমানত জমা করে তার পরিমাণ যেমন কম, তেমনি তারা যখন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয় তার পরিমাণও হয় বেশ কম। যার অর্থ, গ্রামে ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটি শাখায় বা অপ্রথাগত চ্যানেলের মাধ্যমে (যেমন ব্যাঙ্ক মিত্রদের) প্রচুর গ্রাহক জোগাড় করা দরকার। গ্রামে নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এরা ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর চ্যানেলগুলি, যেমন, এটিএম, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং, নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহারে হয় একেবারে অপরাগ অথবা খুব একটা সড়োগড়ো নন। কাজেই পরিষেবা পেতে এরা মূলত ব্যাঙ্ক শাখার উপর নির্ভরশীল। ফলে এদের পরিষেবা

চিত্র-১
ভারতে বিদ্যুতায়ন চিত্র
বিদ্যুৎ পৌঁছেছে যত শতাংশ পরিবারে, রাজ্যওয়াড়ি খতিয়ান

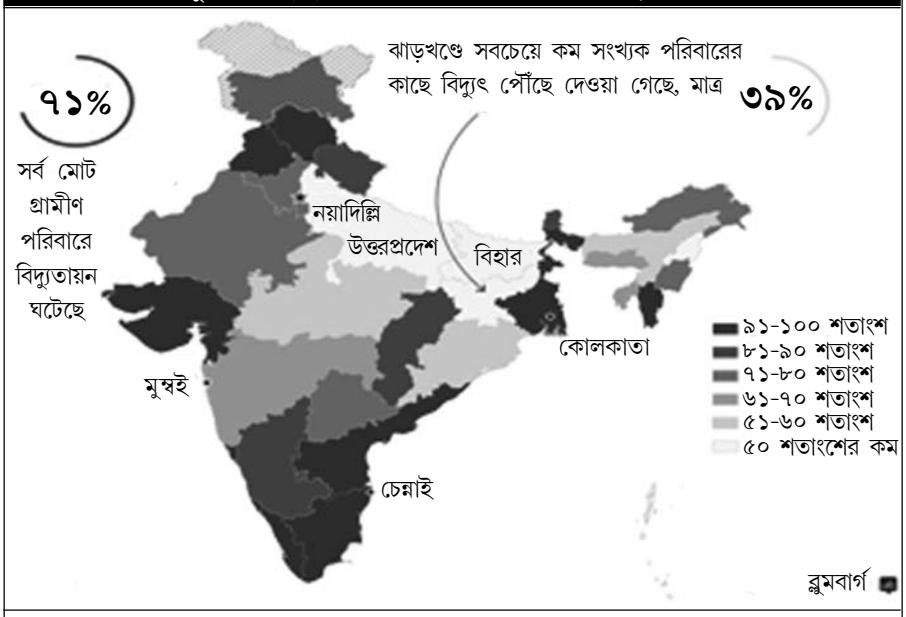

সূত্র : garv.gov.in

দিতে ব্যাঙ্ককে অনেক বেশি ব্যয় করতে হয়। গ্রামের এই অনিয়মিত তথা অস্থায়ী আয় গোষ্ঠীর কাঁধে আচমকা চিকিৎসা খাতে বা সামাজিক দায় মেটাতে ব্যয়ের বোঝা চাপলে তারা নাজেহাল হয়ে পড়ে। সেকারণেই ব্যাঙ্ক এদের ঋণ দেওয়াকে ঝুঁকিবহুল বলে ধরে নেয়। অথচ উৎপাদন ব্যয় মেটাতে তথা আকস্মিক ব্যয়ের ধাক্কা সমালানোর জন্য হতদরিদ্র মানুষজনেরই বুনিয়াদি সঞ্চয় পরিষেবা এবং ক্ষুদ্র ঋণের প্রয়োজন পড়ে। কৃষক ও কৃষক সংগঠনগুলিরই ফসল উৎপাদন, তার প্রক্রিয়াকরণ, বিপণনের জন্য বিশাল পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি ঝুঁকি প্রশমনের উপায় হিসাবে, যেমন, জীবন ও সম্পত্তি হানির লোকসান পুষিয়ে দিতে বিমার প্রয়োজনও এদেরই বেশি।

গ্রামের গ্রাহক মানেই এখন আর কেবলমাত্র কৃষক ও অশিক্ষিত মানুষজন নন, এই দলে এমন এক প্রজন্ম ইতোমধ্যে শামিল হয়েছে যারা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও তার ব্যবহারে যথেষ্ট সড়োগড়ো। এই পরিবর্তনের সূত্রেই গ্রামের মানুষজনের মধ্যে ব্যাঙ্ক পরিষেবা পাওয়ার যোগ্যতা যথেষ্ট বেড়েছে। কাজেই গ্রামাঞ্চলে অর্থলগ্নির সময় নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। সেখানকার মানুষের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী বিবিধ আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাছে পৌঁছানোর সংস্থান করতে হবে। এই কর্মকাণ্ড চালাতে হবে এক বিস্তৃত আর্থিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে, যার অংশীদার দীর্ঘমেয়াদে নানা গোত্রের গ্রামীণ গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি। আর এটাই চলতি সময়ের দাবি। গ্রামাঞ্চলে এরকম এক বিস্তৃততর তথা দীর্ঘমেয়াদের পরিষেবা দিতে সক্ষম অর্থলগ্নি ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। এজন্য আগে আনুষঙ্গিক বিবিধ ইস্যু সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবহিত হওয়া জরুরি। এই সব ইস্যুকে আমরা মূলত সাতটি গোত্রে ভাগ করতে পারি।

● **পণ্য সংক্রান্ত রণকৌশল :** গ্রামের মানুষ ছোটো মাপের লেনদেনে অভ্যস্ত। কিন্তু তাদের চাহিদায় ঢের বেশি রকমফের। এই সব ধরনের চাহিদা পূরণে একগুচ্ছ রকমারি আর্থিক পণ্য ও পরিষেবা উদ্ভাবন করা যায় কি না, তা ভেবে দেখতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, সেক্ষেত্রে পণ্য ও পরিষেবার নমনীয়তা, নিরবচ্ছিন্ন জোগান ও গুণমানের প্রশ্নে যেন কোনও আপোস না করা হয়।

দেখতে হবে, কোন ধরনের আর্থিক পণ্য বঞ্চিত গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস করতে এবং বৃদ্ধি হার বাড়াতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর?

● **পদ্ধতি :** নিজের আর্থিক কাঠামোকে বিপন্ন না করে ব্যাঙ্কগুলিকে জনসংখ্যার বঞ্চিত ও অসুরক্ষিত অংশের কাছে পৌঁছাতে হবে, তথা মসৃণভাবে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় পরিষেবা জোগান দিতে হবে। কোন ব্যবসায়িক পদ্ধতি সেকাজের সহায়ক, তা ভেবে দেখতে হবে। ব্যাঙ্ক শাখাহীন এলাকায় এজেন্ট বা প্রতিনিধি মারফৎ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিতে গিয়ে যেসব প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা কাটিয়ে উঠতে কর্মদক্ষ hub & spoke মডেলের রূপরেখা কীভাবে তৈরি করা সম্ভব?

● **অংশীদারিত্ব :** বিভিন্ন গোত্রের পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে আর্থিক পরিষেবা পেতে গিয়ে ব্যাঙ্ক শাখাবিহীন তথা স্বল্পসংখ্যক শাখাযুক্ত এলাকার মানুষজনকে কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে? ব্যাঙ্ক ও অন্যানদের (যেমন, ব্যবসা প্রতিনিধি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) মধ্যেকার গাঁটছড়া আর্থিক পরিষেবাকে মানুষের নাগালে অতি সহজে পৌঁছে দিতে উপযোগী হচ্ছে কি?

● **সুরক্ষা :** এধরনের পরিষেবার অপব্যবহার সূত্রে পরিষেবা প্রদানকারী ও গ্রাহক উভয়েরই লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রামীণ অর্থলগ্নি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত এই দু'পক্ষের স্বার্থই যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেজন্য কী পন্থাপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা চালু করা দরকার, তা ভেবে দেখতে হবে। ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঝুঁকি প্রশমনের বেশি সুযোগ থাকায়, তা কি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বেশি সংকট ঘনিয়ে আনছে। ঋণসংস্কৃতিতে জোয়ার-ভাটার যে অনিশ্চয়তা, তা থেকে কি ঋণদাতা সংস্থাগুলি সুরক্ষিত?

● **মুনাফার সম্ভাবনা :** গ্রামাঞ্চলের গ্রাহককুলের কাছে তাদের সাধ্যের মধ্যে গ্রহণযোগ্য পরিষেবার জোগান দিতে ব্যবসার রণকৌশল ও পরিষেবা ডেলিভারি মডেলের খোলনলচে এমনভাবে বদলে ফেলা কি সম্ভব, যাতে করে গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীরা দীর্ঘস্থায়ীভাবে মুনাফা কামিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে? গ্রাহকেরা যাতে গৃহীত পরিষেবার সঠিক মূল্য চোকাতে স্বেচ্ছায় রাজি থাকে, তাদের মধ্যে সেঅভ্যাস কীভাবে গড়ে তোলা যাবে?

চিত্র-২
ব্যাঙ্কিং কোরেসপন্ডেন্ট বা ব্যাঙ্ক মিত্রদের সামনে প্রতিবন্ধকতা

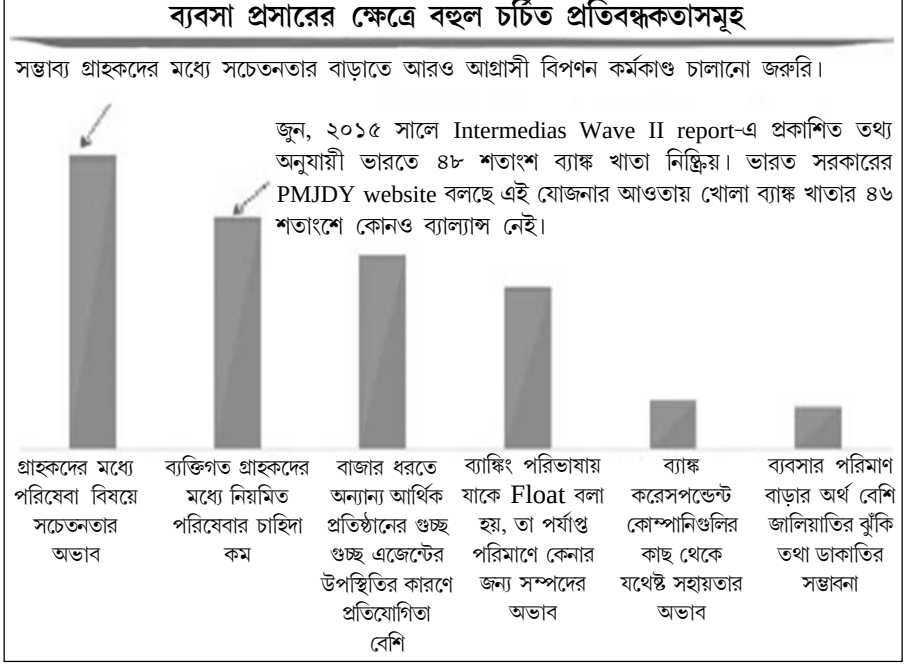

● **উৎপাদনশীলতা :** গ্রামীণ এলাকায় যে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা হয়, তার উৎপাদনশীলতা আমরা কীভাবে বাড়াবো। অর্থলগ্নির সাথে, অন্যান্য সম্পদের সংহতিসাধন করে, বলা যেতে পারে "credit plus" দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আর্থিক পরিষেবার ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতাকে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে যেতে গেলে কোন রণকৌশল গ্রহণ করতে হবে?

● মানুষজনকে ব্যাঙ্কমুখো করে তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটানোর প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হলে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও মননশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার গ্রামে ব্যাঙ্কের শাখার কর্মীদের সেই সব গুণাবলী আছে কি না তা চিন্তা করতে হবে। গ্রামের লোকেদের মধ্যে থেকে সম্ভাব্য গ্রাহককে চিনে নিয়ে তাদের সঠিক সময় বুঝে পরামর্শ দিয়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলার ক্ষমতা, স্বদিচ্ছা ও দায়বদ্ধতা সেসব কর্মীদের মধ্যে আদৌ আছে কি?

নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, যাদের প্রচুর আছে, তাদের প্রাচুর্যে আরও কতটা যোগ করতে পারলাম, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের অগ্রগতির অগ্নিপরীক্ষা হয় না, বরং যাদের কাছে যৎসামান্য আছে, তাদের জন্য যথেষ্ট বন্দোবস্ত করতে পারলেই সেই অগ্রগতির প্রমাণ মেলে। আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলির সমাধানে আমাদের সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে সেগুলিকে হাতিয়ার করেই আমাদের এখন সেই অগ্নিপরীক্ষাতে নামতে হবে।

ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংগঠিত আকারে সেই উদ্যোগ প্রথম নেওয়া হয় ২০০৫ সালে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান কে. সি. চক্রবর্তীর হাতে এর সূচনা। মঙ্গলম এদেশের প্রথম গ্রাম হিসাবে ইতিহাসে নাম তুলে ফেলে, যে গাঁয়ের প্রতিটি পরিবারের কাছে ব্যাঙ্কিং সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগকে এক মিশনের রূপ দেয়। এজন্য শীর্ষ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের রণকৌশল নেয়। একাজে সফল হতে নতুন নতুন আর্থিক পণ্যের চলন, নিয়ামক, নির্দেশিকায় ছাড় তথা অন্যান্য সহায়ক পন্থাপদ্ধতি চালু করে। জমা আমানতের তথা

লেনদেনের পরিমাণ যেন উল্লেখযোগ্য হয় এবং ব্যাঙ্কের সাথে একবার যুক্ত হওয়ার পর মানুষ যাতে ফের মুখ না ফিরিয়ে নেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই মহাযজ্ঞে সেদিকেও নজর দেয় শীর্ষ ব্যাঙ্ক। এজন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম ক্ষুদ্র আমানতকারীদের জন্য no-frill account (অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের খাতায় ন্যূনতম বা আদৌ কোনও টাকাপয়সা জমা না রাখলেও যে অ্যাকাউন্ট বাতিল হয়ে যায় না বা কোনও জরিমানা দিতে হয় না) ও সাধারণ ক্রেডিট কার্ডের (GCCs) সুবিধা চালু। বার্ষিক জমা আমানতের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার কম, এমন ব্যাঙ্ক খাতা খুলতে ইচ্ছুক মানুষদের ক্ষেত্রে রীতিনীতি শিথিল। যাতে সহজে ঋণ পেতে পারেন, সেই সুবিধা করে দিতে গরিব ও অসুবিধায় পড়া মানুষজনকে সাধারণ ক্রেডিট কার্ড (GCCs) ইস্যু করা হয়। ঝঞ্ঝাটঝামেলা ছাড়াই কৃষকরা যাতে সময়মতো মসৃণভাবে কৃষি ঋণ পান সেজন্য গত ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫০ মিলিয়নেরও বেশি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা হয়েছে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র থেকে। আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা জোগানোয় ব্যাঙ্কগুলিকে মদত করার জন্য ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বিভিন্ন অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী), ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংস্থার পরিষেবা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এই সব মধ্যবর্তী মদতকারীরা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তরফে ব্যবসা সহায়ক (business facilitators) বা ব্যবসা প্রতিনিধি (business correspondents) হিসাবে কাজ করে। তাছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে শীর্ষ ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়েছে, বিভিন্ন অঞ্চলে ১০০ শতাংশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এক প্রচারাভিযান শুরু করতে। ফলস্বরূপ, আমরা দেখছি পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং হিমাচলপ্রদেশ ও কেরালা, এই দুই রাজ্য ইতোমধ্যেই তাদের সব কয়টি জেলাকে ১০০ শতাংশ আর্থিক অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দূরদৃষ্টিসমৃদ্ধ পরিকল্পনা, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে ৬০০ মিলিয়ন নতুন গ্রাহকের ব্যাঙ্ক খাতা খোলা তথা তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের পরিষেবা প্রদান। তবে, গ্রামীণ এলাকায়, নিরক্ষরতা, নিম্ন আয়, সঞ্চয় ও ব্যাঙ্ক শাখার অপ্রতুলতা, এসবই বহু রাজ্যের ক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথে পাহাড়প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করছে। তা ছাড়াও আছে আইনি ও আর্থিক কাঠামোর অপর্যাপ্ততাও। আমাদের একে একে এসব সমস্যারই সমাধান করতে হবে।

দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে ব্যাঙ্কিং করেসপন্ডেন্ট মডেল যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি :

● মূলত নিম্ন আয়বর্গের গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে হয়, টাকাপয়সা যা লেনদেন হয় তার পরিমাণও স্বল্প। এজন্যই ব্যাঙ্কিং করেসপন্ডেন্টদের একাজ করে উপার্জন হয় বেশ কম। তাদের কর্মদক্ষতাকে সম্পূর্ণত ব্যবহারের জন্য ব্যাঙ্কগুলির তরফে যদি এই ব্যাঙ্ক করেসপন্ডেন্টদের পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা করা হয়, তবে তারাও গ্রামবাসীদের দোরগোড়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে উঠবেন।

● ব্যাঙ্ক করেসপন্ডেন্টরা দক্ষতার সঙ্গে সঠিকভাবে কাজকর্ম করছে কি না তার উপর নজরদারি চালাতে তথা নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ইস্যুগুলির সমাধান এবং গ্রাহকদের অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে ব্যাঙ্ককে যুক্তিসঙ্গত দূরত্ব অন্তর ছোটো ছোটো শাখা খুলতে হবে।

● এইসব কর্মীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য ব্যাঙ্কের তরফে এদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি চালাতে উদ্যোগী হতে হবে।

● গরিব গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মেটাতে তাদের সাধ্যের মধ্যে পড়ে এমন দামে উপযুক্ত উদ্ভাবনী পণ্যের ডিজাইন করাটা নিতান্তই আবশ্যক।

● গ্রামবাসীদের সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে ধার করার অভ্যাস ছাড়াতে ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ বিলিবন্টনের পদ্ধতি সরল করতে হবে। ঋণ দেওয়ার নিয়মকানুনও নমনীয় করতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-নির্ভর এই পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতায় সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে মূল হাতিয়ার হল প্রযুক্তি।

● গ্রামবাসীদের পরিষেবা দিতে গ্রামাঞ্চলে এবং ব্যাঙ্ক শাখাহীন এলাকায় ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ATM নেটওয়ার্কের পরিসর বাড়াতে হবে। পাশাপাশি, পর্যাপ্ত সুরক্ষা বন্দোবস্তের সংস্থান করতে তথা আর্থিক সাক্ষরতা বাড়াতে প্রচারাভিযান চালাতে হবে।

● গ্রামাঞ্চলে ছোটো ছোটো লেনদেনের দরুন সার্বিকভাবে ব্যাঙ্কের লেনদেন ব্যয় বেশি। এই ব্যয় কমাতে রুপে (RuPay) কার্ডের ব্যবহার প্রভূত বাড়ানো যেতে পারে।

● আমাদের দেশের শীর্ষ কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক, নাবার্ড (NABARD) কিষান ক্রেডিট কার্ডকে বৈদ্যুতিন ক্রেডিট কার্ড এবং রুপে কিষান ক্রেডিট কার্ডে (RuPay KCC) রূপান্তরিত করার জন্য ইতোমধ্যেই বিবিধ নয়া পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অতিরিক্ত হিসাবে ব্যাঙ্কগুলি বহুবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার উপযোগী কার্ড ইস্যু করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে পারে। গ্রামীণ এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী একাধারে ডেবিট কার্ড, কিষান ক্রেডিট কার্ড এবং সাধারণ ক্রেডিট কার্ড, সব ধরনের প্লাস্টিক মানি হিসাবেই যাতে এই কার্ড ব্যবহার করা যায়।

● মার্চ, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, ভারতের গ্রামাঞ্চলে, মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ৫০৬ মিলিয়ন। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে, যেকোনও ধরনের হ্যান্ডসেট-এ ব্যবহার উপযোগী একটি অ্যাপ্লিকেশন উদ্ভাবনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। যে অ্যাপের সাহায্যে অর্থ আদানপ্রদান করা যাবে এনক্রিপটেড SMS ব্যবহার করে।

● নাবার্ডের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে যে সংস্থান রাখা হয়েছে সেই অনুযায়ী, ব্যাঙ্কগুলি দেশের বৃহত্তম গ্রামীণ সমবায় নেটওয়ার্ক, প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতিগুলিকে (PACs) তাদের ব্যবসায়িক প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করতে পারে।

● উপার্জনের উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে পাড়ি জমানো জনসংখ্যার ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেনের সুযোগসুবিধার গুরুত্ব খুব বেশি। এদের জন্য সহজে এবং কম খরচে টাকাপয়সা লেনদেনের সংস্থান করাটা নিতান্তই জরুরি।

● দরিদ্র গ্রামবাসীদের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়ার সময় অত্যন্ত সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে হয়। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের এই মানবিক দিকটির সাথে নিজেদের কর্মী ও ব্যাঙ্ক করেসপন্ডেন্টদের সড়োগড়ো করে তোলার

জন্য ব্যাঙ্কগুলির উচিত তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।

● প্রকৃত অর্থে যদি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে হয় ঋণ বণ্টনের সময় বড়ো কৃষকদের পরিবর্তে ক্ষুদ্র চাষিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

● তাদের 'কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশান' মঞ্চের (CBS platforms) দিন দিন বাড়তে থাকা কাজের বোঝা সামলানোর মতো ক্ষমতা থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে।

● গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিংয়ে বাড়বৃদ্ধির জন্য বৈদ্যুতিন উপকার হস্তান্তর ব্যবস্থা (Electronic Benefit Transfer System) কার্যকরভাবে প্রসারিত করা জরুরি।

● কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধি করে গ্রামীণ এলাকায় মানুষের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যাঙ্ক ও সরকারকে নানা উদ্যোগ নিতে হবে।

● সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে গ্রামীণ এলাকায় ব্যাঙ্ক শাখার সংখ্যা মার্চ, ২০১০ সালের ৩৩ হাজার ৩৭৮ থেকে বেড়ে মার্চ, ২০১৬ সালে হয়েছে ৫১ হাজার ৮৩০। অন্যদিকে, শাখাহীন ব্যাঙ্কিং আউটলেট-এর সংখ্যা মার্চ, ২০১০ সালের ৩৪ হাজার ৩১৬ থেকে বেড়ে মার্চ, ২০১৬ সালে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৭৭। এর থেকে, শাখাবিহীন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার তারিফ করার মতো অগ্রগতির প্রমাণ মেলে। তা সত্ত্বেও মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলি মোট শাখার মাত্র ২০ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই বেসরকারি ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ যেমন রয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

● ভারতের ৬ লক্ষ গ্রামের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। কাজেই সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, যেমন, ভৌত ও ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে হবে।

● ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় ফর্ম শুধুমাত্র ইংরেজি, হিন্দির বদলে বিভিন্ন ভাষায়, নিদেন পক্ষে এদেশের প্রধান প্রধান ভাষায়, ছাপানো নিতান্ত জরুরি। আর্থিক সাক্ষরতা প্রসারের অঙ্গ হিসাবে, ব্যাঙ্কগুলিকে আমজনতাকে তাদের ইংরেজি ভীতি কাটিয়ে ওঠার জন্য

চিত্র-৩
গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং : ভিসন ২০২৫

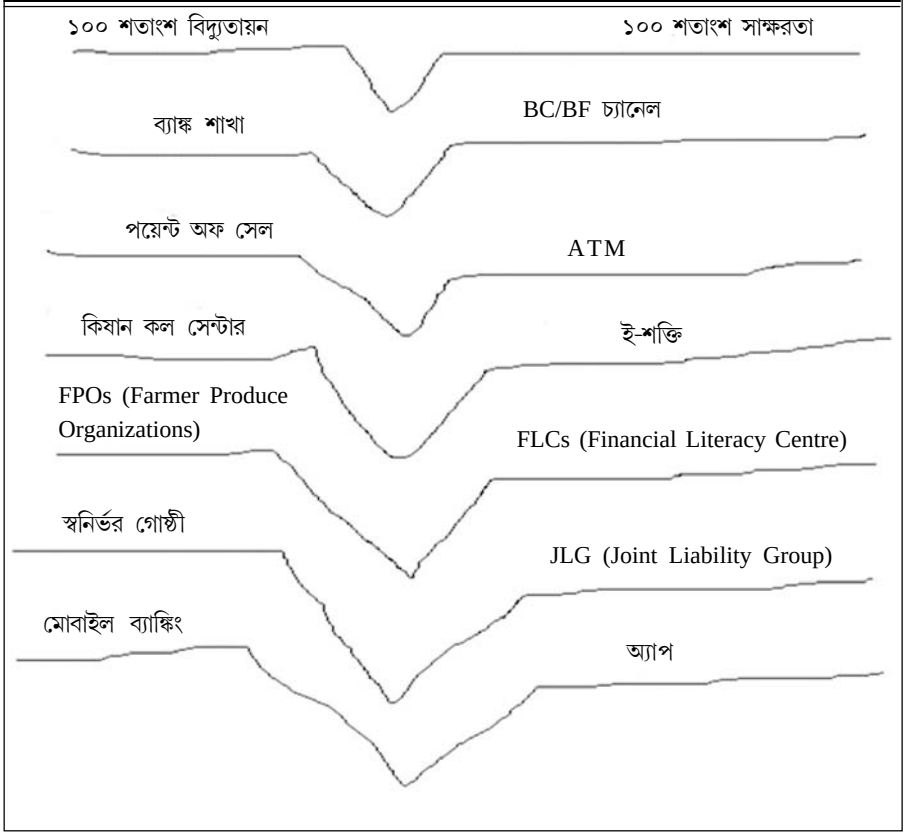

সাহায্য করতে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

● ভারতের ডাক ব্যবস্থা বিশ্বে বৃহত্তম। গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৮২ ডাকঘর, যার মধ্যে ৮৯ দশমিক ৮৬ শতাংশ, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৮২-টি ডাকখানা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এই প্রেক্ষিতে ডাকঘরগুলি তাদের প্রত্যক্ষ পূর্ব অভিজ্ঞতার সুবিধা থাকার সূত্রে যাতে আরও কার্যকর ও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে তা সুনিশ্চিত করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ চালাতে হবে। ভারতীয় ডাক ব্যাঙ্ক (India Posts Bank) চালু করা, নিঃসন্দেহে এই দিশায় ভারত সরকারের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

● স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে ব্যাঙ্কের যোগসূত্র স্থাপন করে নাবার্ডের তরফে যে কর্মসূচি চালানো হয়, তা বিশ্বের বৃহত্তম ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র সংস্থার ক্ষেত্রে তা দীর্ঘস্থায়ীভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং ক্রমশ প্রসার ঘটানো বিষয়ক ইস্যুগুলির সমাধান এখনও বাকি।

● ব্যাঙ্ক করেসপন্ডেন্টদের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা যারা গ্রহণ করেন, তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর তথা প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত নন। কাজেই প্রথমোক্ত পক্ষের দ্বারা এদের বিপথে চালিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

ভারত সরকার তথা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি বিভিন্ন পন্থাপদ্ধতি অবলম্বন করে উল্লিখিত ইস্যুগুলির সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে :

● প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় ২৬ কোটি নতুন ব্যাঙ্ক খাতা খোলা হয়েছে, যা এক বিপুল সাফল্য।

● চালু ক্ষুদ্র উদ্যোগে নতুন করে অর্থলগ্নির প্রয়োজন মেটাতে ক্ষুদ্র ঋণের সংস্থান করতে গঠন করা হয়েছে মুদ্রা বা Micro Unit Development Refinance Agency (MUDRA)।

● অটল পেনশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ইত্যাদি বিবিধ সামাজিক প্রকল্প মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করছে।

● ব্যাঙ্কিং করেসপন্ডেন্ট ও ব্যবসা সহায়কদের মদতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা জোগানো হচ্ছে।

● ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেনের উপর ছাড়ের প্রস্তাব।

● নগদে লেনদেন কমানোর জন্য তার জায়গায় ক্ষুদ্র ATM ও রুপে কার্ডের মাধ্যমে আধার-নির্ভর লেনদেনের চলন বাড়ানো।

● প্রথাগত ব্যাঙ্কিংয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভিন্ন গোত্রের ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বিস্তারে ১১-টি পেমেন্ট ব্যাঙ্ককে এবং ১০-টি স্বল্প পুঁজিলগ্নি ব্যাঙ্ককে (Small Finance Bank) নতুন লাইসেন্স বা ব্যবসা ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

তবে এসমস্ত উদ্যোগও ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়েছে।

❖ প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় প্রচুর অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে বহু ব্যাঙ্ক খাতাতেই দীর্ঘদিন ধরে কোনও আমানতই জমা পড়েনি। এই খাতাগুলিতে কোনও লেনদেনই হয় না, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর তা চালু রাখতে গিয়ে ব্যাঙ্কের খরচের বহর বেড়েই চলেছে। গ্রামের গরিব মানুষজন দিন আনে দিন খায়। নিয়মিত রোজগারের সংস্থান নেই বলে ব্যাঙ্কের খাতায় উদ্বৃত্ত জমানো তাদের কাছে স্বপ্নবিলাসের মতো। ফলত, এই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

❖ জনধন, আধার ও মোবাইল (JAM) ত্রয়ী যুক্ত করার মতো প্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবার কাজ এগোচ্ছে ঢিমে তালে।

❖ পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের দৌলতে ব্যাপকমাত্রায় গ্রাহকের নাগালে পৌঁছে যাওয়ার সুবিধা মিলছে বটে, কিন্তু ইতোমধ্যেই সামনে উঠে আসা ইস্যুগুলির সমাধান জরুরি হয়ে পড়েছে। জটিল ইউজার ইন্টারফেস, ইন্টারনেটের সুবিধা সর্বত্র না পৌঁছানো, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি এমনই কয়েকটি ইস্যু। যার দরুন পেমেন্ট ব্যাঙ্কের পরিষেবা গ্রহণে মানুষ উৎসাহ হারাচ্ছে। তার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবার তাদের বাড়তি দায়িত্ব চাপাতে চলেছে নতুন এই পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির উপর।

❖ সরাসরি উপকার হস্তান্তর (Direct Benefit Transfer) ক্ষেত্রে বিলম্ব এড়াতে বা উপকার পাওয়ার দাবি অস্বীকারের জন্য ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সাবেক মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সম্ভাবনা।

❖ পেমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের প্রসারের দৌলতে নিয়মিত ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকদের কাছ থেকে যে মাশুল আদায় করে, তা হারাতে পারে। এসব ফি ব্যাঙ্ক সংগ্রহ করে থাকে ডিমান্ড ড্রাফট তৈরি, নগদ টাকা হস্তান্তর, পেমেন্ট, চেকের তথা ATM লেনদেনের মাধ্যমে নগদ টাকা তোলার উপর ধার্য মাশুল হিসাবে।

❖ অটল পেনশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ইত্যাদি সামাজিক প্রকল্পগুলি মূলত নির্ভরশীল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গরিবদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সাফল্যের উপর। যখন জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ, এসব পেনশন বা বিমার মতো আর্থিক পণ্য বিষয়ে অবগতই নন বা তার নাগাল পেতে অপারগ, সেক্ষেত্রে প্রকল্পগুলি সফলভাবে চালাতে কী পাহাড়প্রমাণ কাজের দায়িত্ব চাপে, তা সহজেই অনুমেয়।

❖ ব্যাঙ্কের ব্যবসা করেসপন্ডেন্টরা গ্রাহকের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা জমা না করে আত্মসাৎ করে গা-ঢাকা দিয়েছে, এমন বহু নজির মিলেছে।

❖ ব্যাঙ্কিং প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত জালিয়াতি দিন দিন যে হারে বাড়ছে, তা এক অশনিসংকেত-বিশেষ।

❖ গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় মোবাইল সংযোগের দূরবস্থা এখন কহতব্য নয়।

❖ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণদানের সময় সেই ঋণের ঘোষিত হকদারদের কাছে পৌঁছানোর অভ্যাস নেই অনেক ব্যাঙ্কের। কারণ, বহু ব্যাঙ্কই গরিব মানুষদেরকে ঋণ দিতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে গিয়ে এরা শেষমেশ এমন মানুষদের ঋণ দেয়, যাদের শর্তানুযায়ী তা পাওয়ার আদৌ হকই নেই। জাল কাগজপত্র পেশ করে এরা সেই ঋণ আত্মসাৎ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কৃষকদের জন্য কম সুদে স্বর্ণঋণ দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। কিন্তু, চাষবাসের সাথে কোনও কালেই সংস্রব নেই এমন লোকজনও ব্যাঙ্কের সাথে যোগসাজশ করে সেই ঋণ পেয়ে যাচ্ছে। কাজেই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণদান (PSL) তার নির্ধারিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এদিকে সরকারকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। প্রকৃত হকদার আবেদনকারী যারা, তাদের কাছেই যাতে সেই ঋণ পৌঁছায়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। জাল আবেদনকারী তথা যে ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের মদতে এই দুষ্কর্ম হয়ে চলেছে, উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।

নিবন্ধের শেষপর্বে এসে আশা প্রকাশ করা যায় যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই এক অনুকূল নিয়ামক বাতাবরণ গড়ে তুলতে দায়বদ্ধতা দেখাবে। যেখানে আর্থিক সংস্থাগুলি নিজেদের আর্থিক ভারসাম্য বিঘ্নিত না করেই গরিব মানুষজনকে মসৃণ তথা সুষ্ঠুভাবে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করতে আগ্রহী হবে। অন্যদিকে ব্যাঙ্কগুলিকে সেই স্বাধীনতা দেওয়া হোক, যাতে করে তারা নিজেদের সার্বিক ব্যবসা বিষয়ক দর্শনের অঙ্গ হিসাবে নিজেদের মতো করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির রণকৌশল নির্বাচন করতে পারে। তথা এক্ষেত্রে নিজেদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা যাচাই করে ও আর্থিক পণ্যের গুণমান বাড়িয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকেও নিজেদের অন্যতম ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড হিসাবে চালিয়ে যেতে পারে। কয়েকটি আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে, এবং বিশেষ করে একটি সাবেক ক্ষুদ্র ঋণদান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে ব্যাঙ্ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ছোটো ব্যাঙ্ক ও পেমেন্ট ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্ভবত on-tap licensing নীতি চালু করতে চলেছে। অর্থাৎ, শীর্ষ ব্যাঙ্ক সারা বছর ধরেই ব্যাঙ্ক হিসাবে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য আর্থিক সংস্থাগুলির আবেদনপত্র জমা নেবে এবং লাইসেন্স বা ছাড়পত্র দেবে। পাশাপাশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজনের সাপেক্ষে বিদেশি ব্যাঙ্কগুলিকে এদেশের বাজারে প্রবেশের অনুমতি দিতেও উল্লিখিত নীতি চালু করতে পারে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। এইসব নয়া পদক্ষেপের দৌলতে গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক ব্যবস্থার ছবিটা শোধরাবে বলে আশা রাখা যায়। গ্রামে আর্থিক পণ্য ও পরিষেবার বাজার আয়তন ও সুযোগ, উভয় নিরিখেই বাড়বে। এবং সেই সূত্রে গ্রামাঞ্চলে অর্থলগ্নি ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে রয়ে গেছে তথা নতুন নতুন যেসব চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে, তার মোকাবিলা করে গ্রামের জনজীবনের গুণগত ও পরিমাণ, উভয়ত, দীর্ঘস্থায়ী বিকাশ সম্ভব হবে। এই কাজে সফল হতে, আগামী দিনে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং চিত্র কেমন হবে, তার যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে, ভিসন ২০২৫ (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য) নাম দিয়ে তার সার্থক রূপায়ণে নজর দিতে হবে আমাদের সবাইকে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ব্যাঙ্কের ভূমিকা

চরণ সিং, শিবকুমার রেড্ডি কে.

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সূত্রপাত কিন্তু ভারতেই। সমবায় ঋণ সমিতি আইন, ১৯০৪ ভারতে সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহ জুগিয়েছিল। সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কিং সুযোগসুবিধার প্রসার ঘটানো, তেজারতি কারবারিদের তুলনায় সহজ শর্ত ও কম সুদে ঋণ দেওয়া। ভারতে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কাজ বড়ো আকারে শুরু হয় ১৯৫৫ সালে ভারতের স্টেট ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে। সামাজিক ব্যাঙ্কিং নিয়ে বিচারবিবেচনার সূচনা ১৯৬৭ সালে। ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ থেকে বঞ্চিতদের কাছে ব্যাঙ্ক পরিষেবা পৌঁছে দিতে ১৪-টি বেসরকারি ব্যাঙ্ককে আনা হয় রাষ্ট্রের আয়ত্তে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হল সমাজের সব শ্রেণি, বিশেষত দুর্বল ও অসহায় গোষ্ঠীর মানুষের নাগালে তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়া। দেখা দরকার, এসব পণ্য ও পরিষেবা যেন মেলে তাদের সাধ্যায়ত্ত দামে, সহজসরল উপায়ে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে (ভারত সরকার, ২০০৮)। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে অসহায় মানুষ, প্রধানত গরিবদের জীবনে রূপান্তর আনা। এই উদ্দেশ্যে, তাদের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জোগাড় এবং স্থায়ী রোজগারপাতির ব্যবস্থা করা দরকার।

সাধারণ ধারণা অন্য রকম হলেও, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সূত্রপাত কিন্তু ভারতেই। সমবায় ঋণ সমিতি আইন, ১৯০৪ ভারতে সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহ জুগিয়েছিল (রায়, ২০১১)।[১] সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কিং সুযোগসুবিধার প্রসার ঘটানো, তেজারতি কারবারিদের তুলনায় সহজ শর্ত ও কম সুদে ঋণ দেওয়া। ভারতে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কাজ বড়ো আকারে শুরু হয় ১৯৫৫ সালে ভারতের স্টেট ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে। সামাজিক ব্যাঙ্কিং নিয়ে বিচারবিবেচনার সূচনা ১৯৬৭ সালে। ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ থেকে বঞ্চিতদের কাছে ব্যাঙ্ক পরিষেবা পৌঁছে দিতে ১৪-টি বেসরকারি ব্যাঙ্ককে আনা হয় রাষ্ট্রের আয়ত্তে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার ধ্যানধারণা জোরদার হয়ে ওঠে ১৯৭৪ সালের মধ্যে এবং ১৯৮০ সালে জাতীয়করণ করা হয় আরও ৮-টি ব্যাঙ্ক, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের বিস্তার ও সমাজের দুর্বল শ্রেণির কল্যাণের জন্য। সেই থেকে, বিশেষ করে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের জন্য শুরু হয় ব্যাঙ্ক থেকে যথেষ্ট ঋণ দেওয়ার চল। তার আগে, এসব ক্ষেত্রে ঋণ জোগাতে ব্যাঙ্ক বিশেষ আগ্রহ দেখাত না।

দেশজুড়ে ব্যাঙ্কিং-এর প্রসারের জন্য একযোগে চেষ্টা চালাচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং নাবার্ডও। দুই প্রতিষ্ঠানের এই উদ্যোগে ক্ষুদ্র ঋণ জোগান এবং বিজনেস করেসপনডেন্ট নিয়োগের প্রকল্প চালু হয়ে গেছে। অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (১৯৭৫), স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী-ব্যাঙ্ক সংযোগস্থাপন (১৯৮৯, ১৯৯০) কর্মসূচি।

সাম্প্রতিক কয়েক বছর, বিশেষত নভেম্বর ২০০৫ থেকে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এজন্য 'গ্রাহককে-জানো' (KYC)-এর আবশ্যিক শর্তাদি সহজসরল এবং নো-ফ্রিল, অর্থাৎ শূন্য বা সামান্য ব্যালান্সের অ্যাকাউন্ট চালু করেছে। ব্যাঙ্কগুলির ধার দেওয়ার ক্ষমতা

(১) এক শতকেরও বেশি পরে, সমবায় ব্যাঙ্কের বাড়বাড়ন্ত চলতে থাকে। ২০১৬-র মার্চে ভারতে ছিল ১৫৭৪-টি শহর এবং ৯৩,৯১৩-টি গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্ক।

[চরণ সিং, ভিজিটিং অধ্যাপক, আইআইএম, ব্যাঙ্গালোর ও প্রাক্তন ডিরেক্টর, ব্যাঙ্কিং রিসার্চ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। ই-মেল : charansingh@iimb.ac.in। শিবকুমার রেড্ডি কে., গবেষণা বিশ্লেষক, আইআইএম, ব্যাঙ্গালোর। ই-মেল : shivakumara.reddy@iimb.ac.in]

মাথায় রেখে, তাদের আর্থিক সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য বেশ সাবধানী নীতি নিয়েছে। দূরদূরান্তের দুর্গম এলাকায়, ব্যাঙ্কগুলিকে হাতে করে বহনযোগ্য যন্ত্র ব্যবহারের মতো প্রযুক্তি উদ্ভাবনে জুগিয়েছে উৎসাহ।

ব্যাঙ্কিং-এর সীমিত বিস্তার

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হরেক উদ্যোগ ভারতের অর্থনৈতিক চিত্র পরিবর্তনে অবদান রেখেছে। তা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগসুবিধে ছিল সীমাবদ্ধ। গরিবি, কম আয়, ব্যাঙ্কের শাখা ধারে-কাছে না থাকা, এহেন সব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অসহায় দুর্বল গোষ্ঠীর পক্ষে প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২০১১-র জনগণনামাফিক, ভারতে প্রথাগত ব্যাঙ্কিং-এর সুযোগ পায় ৫৮.৭ শতাংশ পরিবার। এর মধ্যে গ্রামীণ এলাকায়, এই সুযোগে মেলে মাত্র ৫৪.৭ শতাংশ পরিবারের (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

ভারতে ব্যাঙ্কিং-এর প্রসার ও মহাজনদের ভূমিকা

সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্কের শাখা বেড়েছে অনেক; কিন্তু সুদখোর মহাজনরা এখনও বেশ জাঁকিয়ে বহাল। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গোড়াপত্তনের ঠিক আগে, ভারতে ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ৯৪৬। এর মধ্যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ১৬০, ৯৮-টি এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং ৬৮৮-টি ভারতীয় যৌথ মালিকানার ব্যাঙ্ক। ১৯৬৯ সালের মার্চে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময়, ৮২৬২-টি শাখার মধ্যে গ্রাম ও আধা-শহরে ছিল যথাক্রমে ১৮৩০ এবং ৩৩৪২-টি শাখা।

অস্যার্থ, ৩ লক্ষ মানুষ পিছু একটি ব্যাঙ্ক শাখা। এমন পরিস্থিতিতে, জাতীয়করণের পরেও, গ্রামাঞ্চলে মহাজনদের চড়া সুদে ধার দেওয়ার ব্যবসা চলছিল রমরমিয়েই, কেননা ব্যাঙ্ক শাখা ছিল দরকার তুলনায় ঢের ঢের কম। অনেক ক্ষেত্রে লোকজনের বাড়ি থেকে শাখা ছিল বহু দূরে। ব্যাঙ্ক শাখার সংখ্যা পরে অনেক বেড়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ প্রদান বাড়ানোর জন্য সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ১৯৯১ সালের পর গাঁয়েগঞ্জে

সারণি-১
ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুযোগ পাওয়া পরিবারের শতাংশ (পরিবারের সংখ্যা কোটিতে)

	২০০১-এর জনগণনা অনুসারে			২০১১-এর জনগণনা অনুযায়ী		
পরিবার	মোট পরিবার	ব্যাঙ্কের সুযোগ পাওয়া পরিবার	শতাংশ	মোট পরিবার	ব্যাঙ্কের সুযোগ পাওয়া পরিবার	শতাংশ
গ্রামীণ	১৩.৮	৪.২	৩০.১	১৬.৮	৯.১	৫৪.৪
শহরের	৫.৪	২.৭	৪৯.৫	৭.৯	৫.৩	৬৭.৮
মোট	১৯.২	৬.৮	৩৫.৫	২৪.৭	১৪.৫	৫৮.৭

উৎস : ভারত সরকার

রেখাচিত্র-১

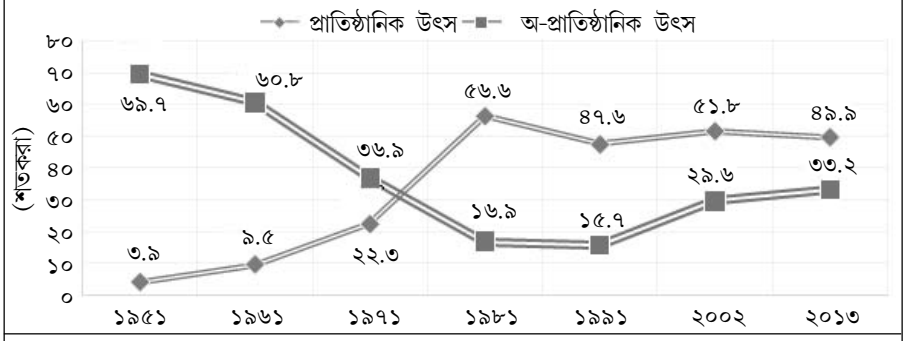

টীকা : অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস : মহাজন, প্রাতিষ্ঠানিক উৎস : সমবায় সমিতি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-সহ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

উৎস : নিখিল ভারত ঋণ ও লগ্নি সমীক্ষা, বিভিন্ন বিষয়, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা

সারণি-২
প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার হালহকিকত (২০১৭-র ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত)

ব্যাঙ্কের ধরন	উপকৃতের সংখ্যা			আমানত (কোটি টাকায়)	রুপে কার্ড ইস্যুর সংখ্যা
	গ্রাম	শহর	মোট		
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	১৩.৩	১১.৫	২৪.৮	৫৫৬৪৬.৬	১৮.৬
আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	৪.২	০.৮	৪.৯	১২০৩৩.৯	৩.৬
বেসরকারি ব্যাঙ্ক	০.৬	০.৪	১.০	২১৬০.৬	০.৯
মোট	১৮.১	১২.৭	৩০.৭	৬৯৮৪১.২	২৩.১

উৎস : https://pmjdv.gov.in/account, ভারত সরকার

সারণি-৩
জনসংখ্যা পিছু ব্যাঙ্ক শাখার সংখ্যা

বছর	গ্রাম	আধা-শহর	শহর	মহানগর	মোট
১৯৬৯	১৮৩৩	৩৩৪২	১৫৮৪	১৫০৩	৮২৬২
১৯৭৯	১৩৩৩৭	৭৮৮৯	৫০৩৭	৩৯৩৯	৩০২০২
১৯৮৯	৩৩০১৪	১১১৬৬	৭৫২৪	৫৯৯৫	৫৭৬৯৯
১৯৯৯	৩২৮৫৭	১৪১৬৮	৯৮৯৮	৮০১৬	৬৪৯৩৯
২০০৯	৩০৯৪৩	১৯২৮২	১৫৩৫৬	১৪২৮৮	৭৯৮৬৯
২০১৭	৪৮৮০৬	৩৮২০১	২৪৫৭৪	২৬৪৭৮	১৩৮০৫৯

টীকা : তথ্যের মধ্যে প্রশাসনিক কার্যালয়ের সংখ্যা ধরা হয় নি।

উৎস : আর বি আই, হ্যান্ডবুক অব স্ট্যাটিসটিক্স অন ইন্ডিয়ান ইকনমি।

সারণি-৪
বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর শাখা সংখ্যা—২০১৫

ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর ধরন	গ্রাম	আধা-শহর	শহর	মহানগর	মোট
ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী	৮০২৯	৬৫৯৩	৪৩০৪	৩৬২২	২২৫৪৮
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	২১৬০৫	১৬৯৫৬	১৩০৮৩	১১৭০৩	৬৩৩৪৭
আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	১৪৬১৩	৩৭৪৮	১০৭১	২২৮	১৯৬৬০
বেসরকারি ব্যাঙ্ক	৪৩০২	৬৪৫৭	৪৫২১	৪৬৯৮	১৯৯৯৭৮
বিদেশি ব্যাঙ্ক	৮	১২	৫৭	২৪৭	৩২৪
মোট	৪৮৫৫৭	৩৩৭৬৬	২৩০৩৬	২০৪৯৮	১২৫৮৫৭

উৎস : ভারত সরকার

সারণি-৫
তপশিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বকেয়া ঋণ
(অ্যাকাউন্ট ১০ লক্ষ ও টাকা ১০০ কোটিতে)

	১৯৯৬ মার্চ		২০১৬ মার্চ	
	অ্যাকাউন্টের সংখ্যা	বকেয়া	অ্যাকাউন্টের সংখ্যা	বকেয়া
ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী	১৪.২	৭৪২	২৬.৮	১৬১১৩
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক	২৫.৭	১৩০০	৫৬.৪	৩৫১৪৬
আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	১৩.১	৭৩	২৩.৪	২০৬৮
বেসরকারি ব্যাঙ্ক	২.৪	২০২	৫০.৩	১৮১২৯
বিদেশি ব্যাঙ্ক	১.২	২২৯	৫.৫	৩৭৭০
মোট	৫৬.৭	২৫৪৭	১৬২.৪	৭৫২২৬

উৎস : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বেসিক স্ট্যাটিসটিকাল রিটার্নস অব সিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কস ইন ইন্ডিয়া

মহাজনের কাছ থেকে ধার নেওয়ার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যেতে শুরু করে (রেখাচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

প্রতিটি পরিবারের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা করতে, ক্ষমতায় আসার পর, ১৫ আগস্ট ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে প্রদত্ত তার প্রথম ভাষণে সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার লক্ষ্য পরিবার পিছু নিদেন একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং সুযোগ সকলের নাগালে পৌঁছে দেওয়া। ২০১৭-র ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই যোজনার আওতায় খোলা হয়েছে ৩০.৭ কোটি অ্যাকাউন্ট। গ্রামে প্রায় ১৮.৬ কোটি। শহরাঞ্চলে ১২.৭ কোটির মতো। রুপে কার্ডের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.১ কোটি। ওই তারিখে জনধনে ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ৬৯,৮৪১.২ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে, সাফল্যের পাল্লা বেশ ভারী।

গ্রামে ব্যাঙ্ক শাখা বেড়েছে দ্রুত, তবে বিকাশ হার বৃদ্ধি বেশি শহর ও মহানগরে (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। ২০১৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও তার সহযোগীগুলির শাখা সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল গ্রামাঞ্চলে (সারণি ৪ দ্রষ্টব্য)।

ব্যাঙ্কবিহীন এলাকায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বিস্তারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত। তবে গত দশকে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা এবং বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাঙ্কের অংশভাক বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে (সারণি-৫ দ্রষ্টব্য)।

উত্তরাঞ্চলে ঋণ দেওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, বিশেষত গ্রাম ও আধা-শহর এলাকায় (সারণি-৬ দ্রষ্টব্য)। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বের শহরাঞ্চলেও এসব ব্যাঙ্কের ঋণদান যথেষ্ট বেড়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ঋণদানে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতির চেয়ে বেশি সফল হয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি (সারণি-৭ দ্রষ্টব্য)।

ঋণদানে উদ্ভাবনা

ব্যাঙ্কবিহীন এলাকার মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য, পাকাপাকি শাখার বদলে ব্যাঙ্কগুলি মোবাইল ভ্যান, ব্যাঙ্কিং কিয়স্ক ও বিজনেস করেসপনডেন্টের মাধ্যমে কাজ চালানো শুরু করেছে। ব্যাঙ্কের কোনও শাখায় পা দেয়নি এহেন বহু লোকের মধ্যে ব্যাঙ্কিংয়ের চল হয়েছে বিজনেস করেসপনডেন্টদের সৌজন্যে। এদের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং-এর প্রথা চালু হওয়ার দরুন শুধুমাত্র বাড়ি বা ব্যবসাপাতির যথাসম্ভব কাছাকাছি ব্যাঙ্কিংয়ের সুবিধে মিলছে এমন না, যাতায়াতের ঝুটঝামেলা এবং সময়/খরচ ইত্যাদির হাত থেকে গ্রাহকরা পাচ্ছে রেহাই। গ্রামাঞ্চলে এসব বাবদ সাশ্রয় নেহাত অল্প নয়। ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে একটা লেনদেন সারতে ঘন্টা দু'-তিন লেগে যায়। সেসময়টা

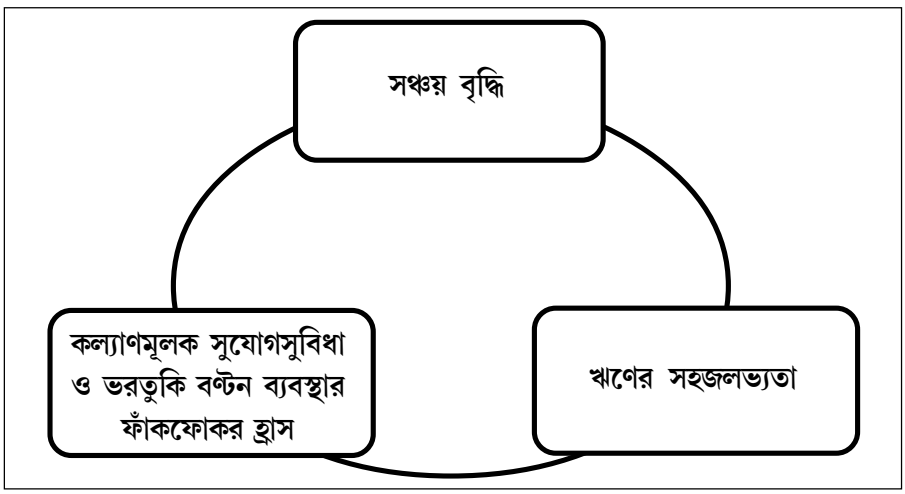

বাঁচলে গ্রাহক অন্য কাজে নিযুক্ত হতে পারে। বিজনেস করেসপনডেন্টরা দূরদূরান্ত বা বস্তিতেও পৌঁছে দেয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। মূলত এই করেসপনডেন্টদের মাধ্যমে প্রায় ৬ লক্ষ গ্রামে, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। ব্যাঙ্কের শাখা মার্চ, ২০১০-এর ৩৩,৩৭৮ থেকে বেড়ে মার্চ, ২০১৭-তে দাঁড়ায় ৫০,৮৬০। আর বিজনেস করেসপনডেন্টদের মারফত ব্যাঙ্কিংয়ের সুবিধে মেলা গ্রামের সংখ্যা ৩৪৩১৬ থেকে লাফিয়ে বেড়ে হয়েছে ৫,৪৭,২৩৩। গত ৭ বছরে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ও লেনদেন বেড়েছে বহু গুণ (সারণি-৮ দ্রষ্টব্য)। ওই সময়, শাখায় সেভিংস অ্যাকাউন্টে আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ গুণ। বিজনেস করেসপনডেন্টদের মাধ্যমে সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমার পরিমাণ বেড়েছে ২৬ গুণের কাছাকাছি। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার মারফত টাকাকড়ি লেনদেনে সবচেয়ে বেশি বিকাশ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার উৎসাহজনক ফল স্পষ্ট; ২০১৪-র পর প্রযুক্তি ব্যবহার করে লেনদেন এবং সেভিংস অ্যাকাউন্টে আমানত বেড়েছে যথেষ্ট।

কিছু বিশেষ ইস্যু ও পরামর্শ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে, কিছু ফাঁকফোকর বোজানোর দিকটি খতিয়ে দেখা দরকার। প্রথমত, প্রতিবন্ধীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসা চাই। এদের মধ্যে পড়েন ক্ষীণ চলৎশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তির প্রবীণরা। সব ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ তেমন একটা সফল হয়নি। কেননা খুব কম সংখ্যক এটিএম এবং ব্যাঙ্ক শাখা প্রতিবন্ধী সহায়ক।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আরও বিস্তারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাতে বাদ সাধছে হরবখত যন্ত্রপাতি বিগড়োনোর মতো প্রযুক্তিগত ইস্যু। ব্যাঙ্কের উপর আস্থা হারিয়ে, গ্রাহক ঝুঁকছে মহাজনদের দিকে। হাতে করে বহনযোগ্য যন্ত্রে ঝুটঝামেলা লেগেই থাকে। এর দরুন মার খাচ্ছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কাজকর্ম। গ্রামের মানুষজনের মনে বিশ্বাস জাগাতে বায়োমেট্রিক-সক্ষম এবং অনেকগুলি

সারণি-৬
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বকেয়া ঋণ
(১০০ কোটি টাকায়)

	১৯৯৬				২০১৬			
	গ্রাম	আধা-শহর	শহর	মহানগর	গ্রাম	আধা-শহর	শহর	মহানগর
উত্তরাঞ্চল	৭৭	৫৩	৮৫	২৬১	১৭৭৪	১৯৯০	২৯৬৪	১০৫০২
উত্তর-পূর্বাঞ্চল	১২	৮	৮	—	১৮১	২৫২	২২০	—
পূর্বাঞ্চল	৫৯	৩৭	৪৬	১১৬	৮৬৬	৭১৪	১৩৫১	২৮৩৭
মধ্যাঞ্চল	৬৬	৫৮	৭১	৪৭	১৩৫২	১২২৬	২২৩১	১৭০৮
পশ্চিমাঞ্চল	৬৪	৫৭	৬০	৬৪৬	৯১৩	১৩৬৮	১৪১৪	২০৭০৩
দক্ষিণাঞ্চল	১০৯	১৫৫	১৭২	২৭৮	২২৭০	৩৮১৩	৪৭৮৪	৯৭৮৯
নিখিল ভারত	৩৮৬	৩৬৯	৪৪৪	১৩৪৮	৭৩৫৮	৯৩৬৩	১২৯৬৬	৪৫৫৪০

সূত্র : আরবিআই, বেসিক স্ট্যাটিসটিকাল রিটার্নস অব সিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কস ইন ইন্ডিয়া

সারণি-৭
কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও সফলতা
(১০০ কোটি টাকা)

বছর	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক		সমবায় ব্যাঙ্ক		আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক		মোট	
	লক্ষ্য	সফলতা	লক্ষ্য	সফলতা	লক্ষ্য	সফলতা	লক্ষ্য	সফলতা
২০১৩-'১৪	৪,৭৫০	৫,০৯০	১,২৫০	১,১৯৯	১,০০০	৮২৭	৭,০০০	৭,১১৬
২০১৬-'১৭*	৬,২৫০	৭,৯৯৮	১,৫০০	১,৪২৮	১,২৫০	১,২৩২	৯,০০০	১০,৬৫৮

*চূড়ান্ত নয়
সূত্র : ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বার্ষিক প্রতিবেদন

সারণি-৮
ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অগ্রগতি
(মার্চে বছর শেষ)

পরিমাণ **(১০০** কোটি টাকা)

বছর	সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট		ওভারড্রাফট	কিসান ক্রেডিট কার্ড	সাধারণ ক্রেডিট কার্ড	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
	শাখা	বিজনেস করেসপনডেন্ট				
২০১০	৪৪	১১	০.১	১,২৪০	৩৫	৭
২০১৪	২৭৩	৩৯	১৬	৩,৬৮৪	১,০৯৭	৫২৪
২০১৭	৬৯১	২৮৫	১৭	৫,৮০৫	২,১১৭	২,৬৫২

পরিমাণ **(১০** লক্ষ)

বছর	সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট		ওভারড্রাফট	কিসান ক্রেডিট কার্ড	সাধারণ ক্রেডিট কার্ড	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
	শাখা	বিজনেস করেসপনডেন্ট				
২০১০	৬০	১৩	০.২	২৪	১	২৭
২০১৪	১২৬	১১৭	৬	৪০	৭	৩২৯
২০১৭	২৫৪	২৮০	৯	৪৬	১৩	১,১৫৯

সূত্র : ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ভাষায় কাজ করতে পটু হাতে ধরা যন্ত্রপাতি থাকা চাই। টাকা তোলা ও সেই সঙ্গে জমা দেওয়ার সুবিধে যুক্ত মেশিন, নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা এবং ঋণের টাকা বন্টনের জন্য কাগজপত্র স্ক্যান করার সুযোগের মতো প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ব্যাঙ্কিং-এর প্রসার ঘটাতে সাহায্য করতে পারে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পগুলি নিয়েও ভাবনাচিন্তা করা চাই। গ্রামীণ ভারতে বসবাসকারী মানুষের আর্থ-সামাজিক পটভূমি অনেকটা ভিন্ন ধাঁচের। সেখানে এযাবৎ ব্যাঙ্ক পরিষেবা না মেলা বিভিন্ন শ্রেণির জন্য আর্থিক প্রকল্পগুলিতে তাই তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার। রেকারিং ডিপজিট বা পৌনঃপুনিক আমানত প্রকল্পের ছক করা হয়েছে সমাজের বেতনভোগী অংশের দিকে তাকিয়ে। গ্রামাঞ্চলে এর বদলে, ফসল বিক্রির মরশুম ভিত্তিক আয়ের ধাঁচের দিকে নজর দিয়ে টাকা জমা দেওয়ার সূচি ঠিক করতে হবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতিতে নজরদারির দায়িত্ব ন্যস্ত করা দরকার একটি বিশেষ আর্থিক সংস্থার ওপর। নাবার্ড এক্ষেত্রে

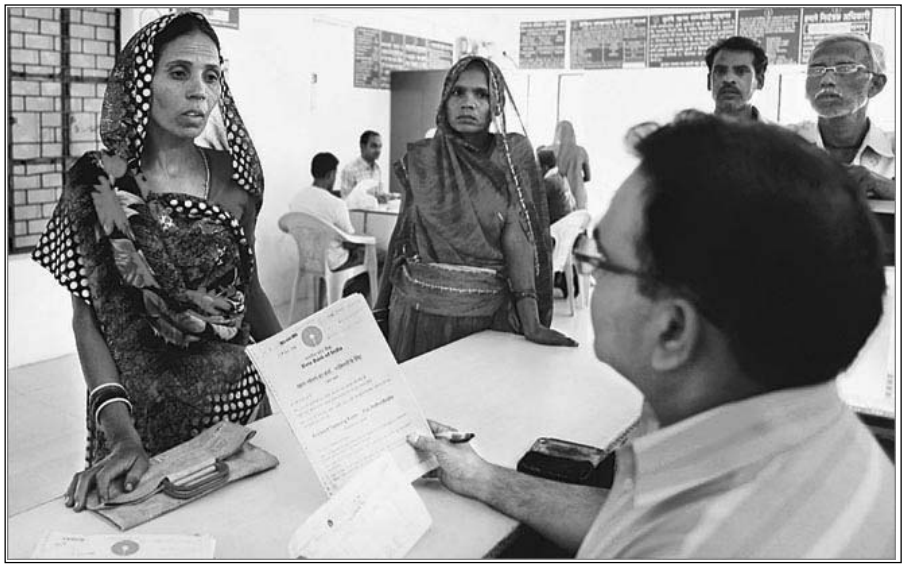

গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে যোগ্য প্রতিষ্ঠান, কেননা, এব্যাপারে সংস্থাটির জ্ঞানগম্যি ও দক্ষতা সবচেয়ে বেশি ও ইতোমধ্যেই প্রমাণিত।

আর্থিক সাক্ষরতার চ্যালেঞ্জ থাকছেই এবং ব্যাঙ্ক তাই সমাজের, বিশেষত গ্রামের আরও বেশি বেশি শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছতে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি বা কর্মকৌশল গ্রহণ করছে। গ্রাহক, বিশেষ করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক গেড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আস্থাভাজন হতে পারলে, তারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে। আর্থিক সাক্ষরতা বাড়াতে, কিছু ব্যাঙ্ক কলেজে কলেজে কুইজ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। কমিক বা মজাদার বই ছাপায়, ম্যাজিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

শেষপাত

দেশে, বিশেষত গ্রাম ও আধা-শহর এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বিশেষ করে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ব্যাঙ্কের বিস্তারকে বিমা ও পেনসন ফান্ডের মতো আর্থিক পণ্যের জন্য পরিকাঠামো হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) Government of India, (2008), Committee on Financial Inclusion, (Chairman: Dr. C. Rangarajan).

(২) Reddy, Y. V., (2017), Advice and Dissent, Harper Business.

(৩) Reserve Bank of India, (2016), Report on Trend and Progress of Banking in India 2015-16, December.

(৪) Roy, T, (2011), The Economic History of India: 1857-1947, Oxford University Press, New Delhi.

(৫) Singh, C. and G. Naik, (2017), Financial Inclusion in India: A Case Study of Gubbi,IIMB Working Paper No. 549, May.

(৬) Singh, C., and S. Ananth, (2016), Creating an Enabling Digital Ecosystem: Issues & Challenges, In S. Kochhar, and (editor) Modi's Odyssey: Digital India, Developed India, Skoch Media Pvt. Ltd., Haryana.

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফৎ অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

ডব্লুবিসিএস মোটেই কঠিন পরীক্ষা নয়

রাজ্য সরকারের শীর্ষ পদগুলিতে নিয়োগ হয় ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নেয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত ডব্লুবিসিএস –ই হল একমাত্র পরীক্ষা যেটি প্রতি বছর নিয়মিত আয়োজিত হয়। শূন্যপদও প্রতি বছর প্রায় সমান থাকে। রাজ্য প্রশাসনের ব্যুরোক্রাট নিয়োগের পরীক্ষাটি নিয়ে সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীরা একটু হীনমণ্যতায় ভোগে। ভেবে নেয় এ পরীক্ষা তাদের জন্য নয়, তাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। পরীক্ষাটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবই এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পিছনে কাজ করে। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাটি কতটা সহজ, কেন সহজ এবং কিভাবে সাফল্য লাভ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন সার্সিস সরকার।

ডব্লুবিসিএস সম্পর্কে সকলের বিশেষত গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েদের মনে এক ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভীতি শুধুমাত্র অবাস্তব নয়, অলীকও বটে। অন্যান্য চাকরির পরীক্ষাতে যদিও বা সামান্যতম সৌভাগ্যের প্রয়োজন হয়, ডব্লুবিসিএস-এ তার কোনো দরকার পড়ে না। সঠিক পন্থায় একনাগাড়ে ধৈর্য্যসহ পড়াশুনা করলে সাফল্য আসবেই আসবে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কেন বহু পরীক্ষার্থী বছর বছর পরীক্ষা দিয়েও সাফল্য পাচ্ছে না? তাদের ব্যর্থতার কারণ হল তারা ডব্লুবিসিএস-এর ধাঁচটাকে ধরতে পারেনি, পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে পিএসসি ঠিক কি চাইছে তা বুঝতে পারেনি। ডব্লুবিসিএস-কে ঠিকমতো জানতে পারলে, বুঝতে পারলে সাফল্য শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই তো দেখা যায় বহু পরীক্ষার্থী প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই গ্রুপ—'এ' বা 'বি' তে চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্য ডব্লুবিসিএস -এর মেধা তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে।

ডব্লুবিসিএস -এর প্রিলি, মেনস্ এবং ইন্টারভিউ তিনটি পর্যায় বা পর্বের জন্য আলাদা আলাদা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের প্রয়োজন হয়। এই পরিকল্পনাগুলি ফ্লেক্সিবল অর্থাৎ নমনীয় হওয়া দরকার। কিংবা এক-একটি পর্যায়ের জন্য একাধিক পরিকল্পনা তৈরি রাখতে হয় — একটি ব্যর্থ হলে যাতে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়টিকে অনুসরণ করা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এক পরীক্ষার্থীর পরিকল্পনা ছিল ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভূগোল এবং মেন্টাল এবিলিটি থেকে ১০০-এর মধ্যে ৯০ তুলবে। তার জন্য সে বছর খানেক ধরে প্রাণপাত করে ওই চারটি বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করল। কিন্তু প্রিলি পরীক্ষায় দেখা গেল তার টার্গেটের চারটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো তিনটি বিষয়ে ভীষণ কঠিন প্রশ্ন এলো—৯০ তো দূরঅস্ত, ৫০ তুলতেই নাজেহাল অবস্থা। এমতাবস্থায় যদি প্ল্যান-'বি' না থাকে তবে সেই বছরের জন্য ডব্লুবিসিএস-এর দৌড় শেষ। সুযোগের জন্য আরও এক বছরের অপেক্ষা। শুধু পরিকল্পনায় ব্যর্থতায় নয়, আরও অনেক কারণ রয়েছে ব্যর্থতার পিছনে। যারা পরীক্ষাব ধাঁত না বুঝে গাঁতিয়ে নোট মুখস্থ করল, উপযুক্ত বইয়ের অভাবে যাদের প্রস্তুতি সঠিক মাত্রায় হল না, কিংবা যারা পরীক্ষাগৃহে যথাযথ প্রদর্শন করতে পারল না — ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাটা তাদের কাছে কঠিন। আর যারা পরীক্ষার ধরনটিকে ভালো করে বুঝে প্রস্তুতি নিল, পরীক্ষা গৃহে আত্মবিশ্বাস না হারিয়ে দক্ষতা ও পারদর্শিতার সাথে পরীক্ষা দিল — ডব্লুবিসিএস তাদের কাছে সহজ। আর তাই দেখা যায় এমন বেশ কিছু পরীক্ষার্থী আছে যাদের জন্য প্রতি বছর একটি করে পদ সংরক্ষিত আছে।

এই পরীক্ষার বিশেষত্ব হল প্রশ্নের ধাঁচ বা প্যাটার্ন বোঝা যায় আগেভাগেই। তারজন্য অবশ্য প্রার্থীকে বিগত বছরের প্রশ্নগুলিকে নিয়ে গভীরভাবে কাটাছেঁড়া করতে হবে, করতে হবে ট্রেন্ড অ্যানালিসিস। ২০১৪ সাল থেকে পরীক্ষার সিলেবাস, প্যাটার্ন এবং বিষয়ের নতুন করে বিন্যাস ঘটেছে। মেনস পরীক্ষাটি আগের মত আর পুরোপুরি ডেসক্রিপটিভ নয়। বাংলা, ইংরাজী এবং অপশনাল ছাড়া বাকি পরীক্ষাগুলি এম.সি.কিউ টাইপের। সুতরাং পাতার পর পাতা নোট মুখস্ত করা কিংবা পরীক্ষার খাতায় এক নাগাড়ে লিখে যাওয়ার ব্যাপারটি আর নেই। এখন শুধু দরকার সঠিক অপশনটিকে ডার্কেন করা। ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলেছে। **সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের একনম্বর সংস্থা।**

এরকম অকল্পনীয় সাফল্যের পিছনে দুটি ফ্যাক্টর কাজ করছে। এক কোর্সটি কনসিভ, ডিজাইন করা থেকে শুরু করে প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজী ফর্মুলেশন সম্পূর্ণ কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন ডব্লুবিসিএস অফিসারদের একটি ডেডিকেটেড টিম। বেশির ভাগ ক্লাসই নেন তারা এবং অন্য ফ্যাক্টরটি হল এখানকার নোটস্ উন্নত মানের, যেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন কমন পাওয়া যায়। 2017 সালের প্রিলি পরীক্ষায় এখানকার দুটি বই **'স্ক্যানার'** এবং **'প্র্যাকটিস সেট ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স'** থেকে ১৩০টির ও বেশী প্রশ্ন কমন ছিল। চাকরি নিশ্চিত করতে চাইলে আজই আমাদের WBCS-2019 ব্যাচে যোগদান করুন। আসন সংখ্যা সীমিত।

WBCS-2019 নতুন ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে। ক্লাস নেবেন WBCS অফিসাররা।

Academic Association
53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in ✹ Barasat-9073587432 ✹ Uluberia-9051392240
✹ Siliguri-9474764635 ✹ Birati-9674447451 ✹ Darjeeling-9832041123
9038786000
9674478600
9674478644

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

ব্যাঙ্কিং পরিষেবার উন্নতিতে অশেষ কাজে আসবে 'বিগ ডেটা'

চতুর্ভুজ বারিক, শ্রীকান্ত শর্মা

কোর ব্যাঙ্কিং চালু হওয়ার আগে, কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে তার গ্রাহকদের সংযোগের একমাত্র সেতু ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মীরা। তারা প্রতিটি গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। কোর ব্যাঙ্কিং চালু হওয়ার পর ছবিটা পালটে গেল। মাঝে চলে এল কেন্দ্রগত ব্যবস্থাপনার উপস্থিতি। ফলে ব্যাঙ্ক কর্মী এবং গ্রাহকদের মধ্যে সরাসরি সংযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী পরিষেবার সংস্থানের সুযোগ আর রইল না। হালফিলে কিন্তু সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার এবং তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুরোনো দিনের মতো গ্রাহকভিত্তিক পরিষেবা জোগানো সম্ভব হয়ে উঠছে।

একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। ধরে নিই এটা গত শতকের নব্বইয়ের দশক। আর আমি মাপতে চাই আমার দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ। তার জন্য আমার নিত্যকার খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্মের একটা তালিকা করা দরকার। তার পর প্রতিটি কাজের জন্য, কতটা ক্যালরি গ্রহণ বা বর্জন হচ্ছে তা বিচার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

না, এখন অতটা জটিল অঙ্ক কষার আর দরকার নেই। কারণ সালটা ২০১৭। মোবাইল ফোনে একটা অ্যাপ ভরে নিলেই কেল্লা ফতে। কোনও ব্যক্তির প্রতিটি কাজকর্ম নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ হবে, ক্যালরি গ্রহণ বা বর্জন মাপা হয়ে যাবে, সেসংক্রান্ত তথ্যাদি বা data নির্দিষ্ট জায়গায় বা memory-তে জমা হবে এবং সেসব তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিখুঁত সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যাবে।

আসলে গোটা বিষয়টির পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি একই রয়েছে। তফাৎ হল এই যে, এখন আমরা অনেক বেশি তথ্য সংগ্রহ করে তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম। সেই বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ করার কাজটাও হয় অনেক সহজে। বিপুল পরিমাণ এই তথ্য ভাণ্ডারকেই সংক্ষেপে বলা হচ্ছে 'বিগ ডেটা'। উপভোক্তাদের চাহিদার বিশ্লেষণ ও আগাম অনুমানে এই 'বিগ ডেটা'-র ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য সোশাল মিডিয়া, বিভিন্ন ওয়েবসাইট-সহ নানান উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক প্রায় সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিজেদের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। এর পর সেই তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের আরও নিপুণ করে তোলার কাজে এগোয়।

বিগ ডেটা বা সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার বাজার এবং গ্রাহক সম্পর্কে আগে না জানা নানা চমকপ্রদ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্ধান দিতে সক্ষম। ওয়ালমার্ট, নেটফ্লিক্স, মাইক্রোসফট-এর মতো বড়ো বড়ো সব সংস্থার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয় সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডারের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। ভারত ও আমেরিকার সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি নির্বাচনের ফল ও গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণেও কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে 'বিগ ডেটা'।

সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার বা বিগ ডেটা আদতে কীভাবে ব্যবহার করা হয়?

নানা গুরুত্বপূর্ণ এবং সুবৃহৎ ক্ষেত্রে 'বিগ ডেটা'-র ব্যবহার হচ্ছে। নানা উদ্দেশ্যে তা কাজে লাগানো যায়। যেমন :

১. বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের মনোভাবের হদিশ পাওয়া এবং তাদের আকৃষ্ট করা;

২. বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতিকে দক্ষতর করা;

[চতুর্ভুজ বারিক, ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞ। ই-মেল : chatupnb@gmail.com। ড. শ্রীকান্ত শর্মা, শিক্ষণবিদ। ই-মেল : shreekant21@gmail.com]

৩. স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন;

৪. বিজ্ঞান এবং গবেষণার কাজে গতি আনা;

৫. শহরাঞ্চল এবং দেশভিত্তিক পরিকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপত্রের উন্নয়ন ও প্রসার;

৬. নিরাপত্তা এবং আইনরক্ষা ব্যবস্থাপত্রের সুচারু প্রয়োগ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব

সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার বা 'বিগ ডেটা'-র বিশ্লেষণাত্মক প্রয়োগ আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে। সমকালীন ডিজিটাল দুনিয়ায় তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। গোটা দুনিয়া এখন internet-এর মাধ্যমে সংযুক্ত।

আমরা প্রত্যেকেই এই সংযোগজালকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে পারি। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ভরে দিতে পারি আমাদের ব্যয়সংক্রান্ত প্রবণতা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার ধরনধারণের নানা খবরাখবর। 'অ্যামাজন'-এ ঢুকে কোনও নির্দিষ্ট পণ্যের খোঁজ করলে আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে চলে আসে ব্যক্তিগত পছন্দভিত্তিক নানা তথ্য। এমনকি সেখানে সঙ্গে থাকে সংশ্লিষ্ট পণ্যটির দাম সংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্যও। ইন্টারনেটে আমাদেরই আচরণ ও পছন্দ সংক্রান্ত খবরাখবরের হদিশ পেয়ে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি নানা তথ্য জোগান দিয়ে গ্রাহক হিসেবে আমাদের আকৃষ্ট করতে চায়। ডিজিটাল বিপ্লবের যেমন গতি দেখা যাচ্ছে, তাতে ২০২০ নাগাদ মানুষ প্রতি প্রতি সেকেন্ডে ১ দশমিক ৭ এমবি তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে বলে অনুমান। এই বিশাল তথ্যভাণ্ডার শুধুমাত্র ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ থেকেই নয়, নির্গত হচ্ছে ফোনের GPS, ইন্টারনেটে ভরে দেওয়া ও ইন্টারনেট থেকে নেওয়া লক্ষ লক্ষ ছবি এবং আরও অগণিত উৎস থেকে। ভারতে সমস্ত ক্ষেত্রের 'আধার' সংযুক্তিকরণ তৈরি করছে সুবিশাল সন্নিবিষ্ট তথ্যপঞ্জি।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে 'বিগ ডেটা' বিশ্লেষণ

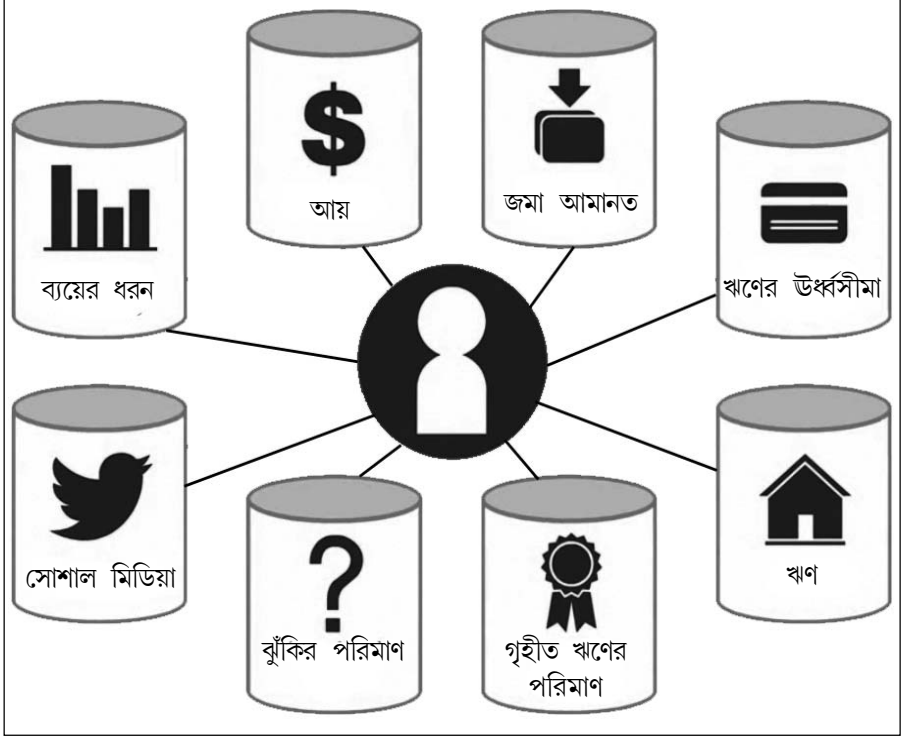

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাপেক্ষে ভারতের প্রেক্ষাপট

কোর ব্যাঙ্কিং চালু হওয়ার আগে, কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে তার গ্রাহকদের সংযোগের একমাত্র সেতু ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মীরা। তারা প্রতিটি গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। কোর ব্যাঙ্কিং চালু হওয়ার পর ছবিটা পালটে গেল। মাঝে চলে এল কেন্দ্রগত ব্যবস্থাপনার উপস্থিতি। ফলে ব্যাঙ্ক কর্মী এবং গ্রাহকদের মধ্যে সরাসরি সংযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী পরিষেবার সংস্থানের সুযোগ আর রইল না। হালফিলে কিন্তু সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার এবং তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুরোনো দিনের মতো গ্রাহকভিত্তিক পরিষেবা জোগানো সম্ভব হয়ে উঠছে। এই ধরনের ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে 'identinomics' বলা যেতে পারে। তথ্যভাণ্ডারের নিরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে গ্রাহকদের প্রত্যেকের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে আগাম অনুমান সম্ভব এখন। তবে, অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের হাতে দেশের নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যাদির পরিমাণ অনেক বেশি থাকলেও এখনও কিন্তু তার যথাযথ ব্যবহার শুরু হয়নি। তা হতে থাকলে পরিষেবা প্রদানের নিরিখে অন্যান্য সংস্থার থেকে ব্যাঙ্কগুলি অনেক এগিয়ে যাবে।

প্রাথমিকভাবে এখন এই বিষয়ে কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পুরোনো পদ্ধতি এবং কর্মীদের অপারগতা বা অনীহার কারণে বহু সময়েই সঠিক তথ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হচ্ছে না। এই বাধা পেরোতে গেলে কতগুলি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে :

(১) তথ্য সংগ্রহ

(২) তথ্য সংরক্ষণ

(৩) তথ্য বিশ্লেষণ

(৪) তথ্যের ব্যবহার।

সমস্ত বিষয়টি যথাযথ রূপায়ণের জন্য সংগৃহীত তথ্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা জরুরি। প্রথম বর্গে থাকবে বর্তমান গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্কিত খবরাখবর। তার

বিশ্লেষণ করতে হবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর, দ্বিতীয় ভাগে রাখতে হবে সম্ভাব্য গ্রাহকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী। তা কাজে লাগিয়ে ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহকসংখ্যা বাড়াতে পারবে।

বর্তমান গ্রাহক

বর্তমান গ্রাহকদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলি এই রকম :

(ক) ব্যাঙ্কের শাখা, (খ) মোবাইল ফোনে ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত অ্যাপের ব্যবহার, (গ) ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, (ঘ) এসএমএস এবং ই-মেল, (ঙ) ঋণযোগ্যতা এবং ঋণদান বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা।

(ক) **ব্যাঙ্কের শাখাসমূহ :** দেশের নানা প্রান্তে শাখা রয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের। তথ্যসংগ্রহে কর্মীদের সঠিকভাবে নিয়োজিত করলেই অনেক দূর কাজ এগোবে।

(খ) **অ্যাপস ও ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং :** এই সব বৈদ্যুতিন মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পরিষেবা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও সুযোগসুবিধার খবরাখবর পৌঁছে দিলে তাদের প্রতিক্রিয়া থেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। কর সংক্রান্ত হিসেবনিকেশ, অর্থের সঞ্চয় ও ব্যবহারের বিষয়ে সহায়তা—এই সব নানা বিষয়ে গ্রাহকদের অবহিত করার মাধ্যমে মিলতে পারে বিবিধ তথ্য।

(গ) **এসএমএস ও ই-মেল :** খুবই চালু পদ্ধতি। সরাসরি গ্রাহকদের কাছে SMS পাঠিয়ে নিজেদের পরিষেবার মান সম্পর্কে গ্রাহকদের মতামত জানতে পারে ব্যাঙ্কগুলি। পেতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য।

(ঘ) **ঋণযোগ্যতার বিশ্লেষণে নিযুক্ত বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা (Credit Rating Agencies) :** ঋণদানের ক্ষেত্রে এই সব সংস্থার সংগৃহীত তথ্য বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারে ব্যাঙ্ক। টাকা ধার দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে আগে থেকেই বিশদ তথ্য হাতে থাকলে নানান দিক থেকেই সুবিধা।

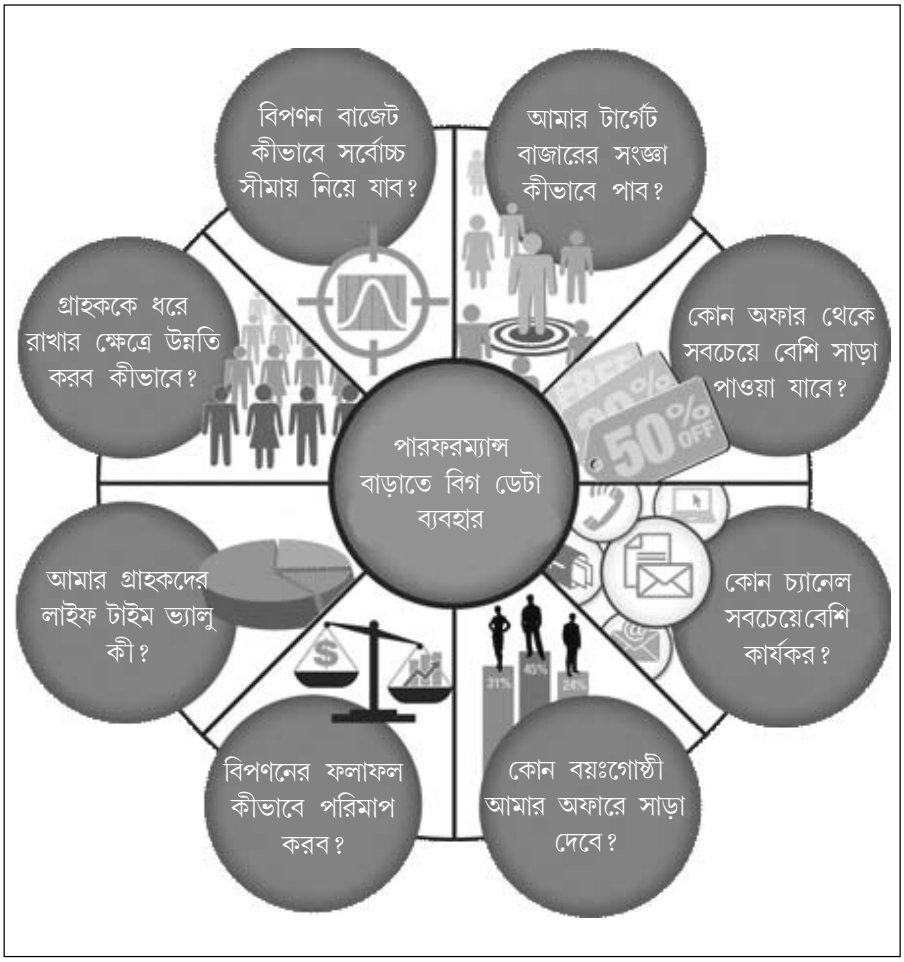

(ঙ) **ঋণদান বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা (Credit information Companies) :** এই সব সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে গ্রাহকদের ঠিকানা ও ফোন নম্বর বদল সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম তথ্য পাওয়া সম্ভব। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের বিষয়েও এই সব তথ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যেতে পারে।

(চ) **তথ্য সংরক্ষণ :** এক্ষেত্রে তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে।

(ছ) **তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যবহার :** যে তথ্য বিশ্লেষণ বা কাজে লাগানো সম্ভব নয় তার কোনও দামই নেই। এক্ষেত্রে যথাযথ নির্বাচন জরুরি। এর পর প্রাসঙ্গিক তথ্যের পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং ব্যবহারের বিষয়টি আসে।

তথ্যভাণ্ডার বিশ্লেষণের পর প্রয়োগের কয়েকটি ক্ষেত্র

নির্বাচিত গ্রাহকদের রুচি অনুযায়ী উপহার, জন্মদিনের শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়ে আরও কাছে টানার চেষ্টা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনও ব্যাঙ্ক তার উন্নত পরিষেবার বিষয়ে অন্যদের সম্যকভাবে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অনুরোধ করতে পারে। আবার, পরিষেবার বিষয়ে কোনও গ্রাহকের অভিযোগ থাকলে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়াও জরুরি। অসন্তোষের কথা জানাতে পারলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ক্ষোভও প্রশমিত হবে। এসব কিছুই ই-মেল বা সমজাতীয় যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে হওয়া সম্ভব।

● ঋণযোগ্যতার সমীক্ষায় নিয়োজিত সংস্থাগুলি (Credit Rating Agency)-র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক নির্ভরযোগ্য ঋণগ্রহীতা বেছে নিতে পারে।

গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ সব ক্ষেত্রেই নির্বাচিত সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে নিজের পরিষেবা এবং শর্তাবলী আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরে নিজের ব্যবসার প্রসারে উদ্যোগ নিতে পারে ব্যাঙ্কগুলি।

● ঋণদানসংক্রান্ত সংস্থা (Credit Bureau)-গুলির সংগৃহীত তথ্য যে কোনও ব্যাঙ্কের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে ক্ষেত্রভিত্তিক তথ্যও পাওয়া সম্ভব। ধরা যাক, ২৫ লক্ষ টাকার বেশি গৃহঋণ নিয়েছেন এমন গ্রাহকদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য দরকার। আবার, কোনও সময়ে হয়তো ক্রেডিট কার্ড বা গাড়ি ঋণ-এর গ্রহীতাদের সম্পর্কে তথ্য চাই কোনও ব্যাঙ্কের। এসব কাজে Credit Bureau পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর দিতে সক্ষম। গ্রাহকদের চাহিদা, মতিগতি সব কিছু সম্পর্কেই তারা বিশদে অবহিত করতে পারে ব্যাঙ্কগুলিকে। ঋণখেলাপের সমস্যা মোকাবিলাতেও এসব তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন গ্রাহক

নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করতে ব্যাঙ্কগুলির ওয়েবসাইট চমকপ্রদ ফল দিতে সক্ষম। ওয়েবসাইটে প্রবেশের জন্য যেসব স্তর পেরনো বাধ্যতামূলক, সেখানেই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নিজেদের পরিষেবার উল্লেখ করে রাখতে পারে। এজন্য আরও নানা সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এগোনো যেতে পারে। www.fundoodata.com-এর মতো ওয়েবসাইট সামান্য মাশুলের বিনিময়ে তথ্য প্রদান করে থাকে। এসবের ব্যবহারে ব্যাঙ্কগুলি উদ্যোগী হতেই পারে।

শেষ কথা

অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো ব্যাঙ্কের শাখায় সশরীরে গ্রাহকদের আসা অনেক কমে যাবে। পরিষেবার ধরনধারণ আমূল পালটে যেতে দেরি নেই। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলানো বেশ কঠিন। তাই পরিবর্তন পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কে এখন থেকে চিন্তাভাবনা করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নিরন্তন প্রবহমান সুবিশাল তথ্যভাণ্ডারের বিরামহীন বিশ্লেষণ।

ব্যক্তি পরিচয়ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাপত্রের (identinomies) মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়তর করে তোলা সময়ের চাহিদা।❑

WBCS পরীক্ষার জন্য চাই-ই চাই

কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল সম্পাদিত

প্রকাশিত হল

3000+MCQ Chapterwise Questions

1. বিজ্ঞান (জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা) প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিবেশ ₹ 280
2. ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতি ₹ 240
3. ভারতের ইতিহাস ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ₹ 280
4. ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ₹ 240
● ভারতের ইতিহাস ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম (Free 5 Practice Sets) ₹ 495
● কম্পিটিটিভ্ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড জেনারেল ইনটেলিজ্যান্স (Free 10 Online Practice Sets) ₹ 495
● কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড জিকে 2018 ₹ 70

● জেনারেল স্টাডিজ - 2018 ₹ 950

বইটির বিষয়বস্তু ● বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ● বর্তমান ভারত ● পশ্চিমবঙ্গ ● পৃথিবী ● বিবিধ ● সাহিত্য সংস্কৃতি ● কলচিত্র ● ভারতীয় রাজনীতি ● আন্তর্জাতিক সংস্থা ● ভারতীয় অর্থনীতি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ● পরিবেশ ● জীববিজ্ঞান ● রসায়ন ● পদার্থবিদ্যা ● কম্পিউটার ● বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ● ভারতের ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ● সাধারণ ভূগোল ● ভারতের ভূগোল ● পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ● খেলাধুলা ● পুরস্কার ● ইংরেজি ● গণিত ও জি. আই ● কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং 5 Free Practice Sets

মন্ডল প্রকাশনী
21, রামনাথ বিশ্বাস লেন
শিয়ালদহ, কলকাতা - 700 009
মোবাইল ঃ 98362 23112
ইমেল : mondalprakashoni@gmail.com

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক : ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যে চিরাচরিত ভূমিকা নির্দেশিত রয়েছে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কও তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা পালন করে চলেছে। ১৯৩৪-এর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে তার পাওয়া সবটুকু টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে এবং সরকারি ঋণ ব্যবস্থার দেখভালের দায়িত্বও শীর্ষ ব্যাঙ্কের হাতেই। কোনও রাজ্যের সরকারও নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে নিজের এইসব কাজের দায়ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিতেই পারে। বস্তুত, একমাত্র সিকিম ছাড়া এখন সব রাজ্যের ব্যাঙ্কার-ই হল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সিকিমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের ঋণ ব্যবস্থার দেখভালের জন্যই চুক্তি রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পথ চলা শুরু ১৯৩৫-এর পয়লা এপ্রিল। স্থাপিত হয় ১৯৩৪-এর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইনের আওতায়। সদর দপ্তর একেবারে শুরুতে কলকাতায় হলেও ১৯৩৭ সালে পাকাপাকিভাবে চলে যায় বোম্বাইয়ে (অধুনা মুম্বাই)। শুরুতে বেসরকারি মালিকানায় থাকলেও ১৯৪৯ সালে জাতীয়করণের পর থেকে দেশের এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবনায়, কাজকর্ম এবং দায়িত্ব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজারে ব্যাঙ্ক নোট আনা এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সাযুজ্য বজায় রাখা এই ব্যাঙ্কের অন্যতম দায়িত্ব। নগদ এবং আমানত ও ঋণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের রাশও রয়েছে এই সংস্থার হাতে।

জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক মুদ্রানীতি কাঠামোর আওতায় মূল্য স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক বৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুদায়িত্বও বর্তায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর।

দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কটির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় একটি নির্দেশকমণ্ডলীর মাধ্যমে। এই নির্দেশকমণ্ডলীকে নিয়োগ করে ভারত সরকার।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি (Monetary Policy)

নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলির যথাযথ রূপায়ণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের এক্তিয়ারের আওতায় যেসব উপায় অবলম্বন করে, তা-ই হল তার মুদ্রানীতি।

১৯৩৪-এর আইন অনুযায়ী এসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ও অধিকার সঁপে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে। দামের স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের হার-এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হল মুদ্রানীতির লক্ষ্য। এটা মনে রাখা জরুরি যে, মূল্য স্থিতিশীলতা নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত।

সাম্প্রতিক নানা উদ্যোগ

সময়ের চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণের দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন ১৯৩৪-এ কিছু সংশোধনী নিয়ে আসা হয় ২০১৬-র মে-তে। পরিমার্জিত আইন অনুযায়ী, প্রতি ৫ বছর অন্তর ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির কাঙ্ক্ষিত হারের লক্ষ্য স্থির করার সংস্থান রয়েছে।

এর আগে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হ'ত মুদ্রানীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ২০১৫-র ২০ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক।

দেশের মুদ্রার নকশা, উৎপাদন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যৌথভাবে রয়েছে ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে। নির্ভেজাল নগদ টাকার যথোপযুক্ত জোগান নিশ্চিত করা এর লক্ষ্য।

মুদ্রা বা কয়েন-এর উৎপাদন এবং অনুমোদনের অধিকার রয়েছে সরকারের

[সূত্র : রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট।]

হাতে। চাহিদা অনুযায়ী তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সরবরাহ করা হয়। এর পরে সরকারের তরফে তা বাজারে আনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

দেশের মুদ্রার ওপর যাতে মানুষের আস্থা অটুট থাকে সেই লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে কাজ করে চলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। জাল বা ভেজাল নোটের সমস্যা মোকাবিলায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর আনা হয় নতুন নকশা এবং সুরক্ষাচিহ্ন।

নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

● **লক্ষ্য এবং অবশ্যকর্তব্য** : আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা, দেশের ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের দেখভাল ও উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

● **কাজকর্মের পরিধি ও এক্তিয়ার** : ৯১-টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ৫-টি সর্বভারতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, চারটি ঋণ ও আমানত বিষয়ক তথ্য প্রদানকারী সংস্থা (Credit Information Companies), ৫৬-টি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং চারটি স্থানীয় আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক (Local Area Bank), রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন।

● **বিবর্তন** : ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের হাল-হকিকতের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকাও বিবর্তিত হয়েছে।

● **ব্যাঙ্ক অনুমোদন নীতি** : বেসরকারি ক্ষেত্রে নতুন ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদন বিষয়ে ২০১৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জারি হওয়া নির্দেশিকা অনুসারে ২০১৪ সালের ২ এপ্রিল IDFC Limited ও Bandhan Financial Services Ltd.-এর আবেদন নীতিগতভাবে মঞ্জুর করা হয়। এই দু'টি সংস্থার কাজকর্ম ও সাফল্য বিচার করে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায় প্রয়োজনীয় পরিমার্জন এনে বেসরকারি ক্ষেত্রে আরও নিয়মিতভাবে ব্যাঙ্ক স্থাপনের অনুমতি দিতে চায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সর্বাঙ্গীণ পরিষেবা প্রদানে সক্ষম আরও ব্যাঙ্ক আসুক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এটাই চায়।

● **অনুৎপাদক সম্পদ এবং পরিশোধের বিষয়ে সংশয় রয়েছে এমন ঋণের সমস্যা মোকাবিলা** : এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা এবং পরামর্শ দেয়

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কোনও সমস্যার ইঙ্গিত মিললেই আগে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়।

● **বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নির্দেশকমণ্ডলীর কাজের মূল্যায়ন** : এই পর্যালোচনার কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে পড়ে।

● **সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ** : ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সহজে ঋণের সংস্থানের বিষয়ে গ্রামীণ সমবায় ঋণ ব্যবস্থার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি এবং

দীর্ঘমেয়াদি দু' ধরনের ঋণই পাওয়া সম্ভব। স্বল্পমেয়াদি ঋণদান ব্যবস্থারও আবার তিনটি স্তর রয়েছে—গ্রাম স্তরে প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতি (PAC), জেলা স্তরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (CCB) এবং রাজ্য স্তরে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক (SCB)। PAC-গুলি ১৯৪৯-এর ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইনের এক্তিয়ারভুক্ত বা হওয়ায় তাদের ওপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ নেই।

অন্য দিকে, শহর এবং আধা-শহর অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার চাহিদা অনেকটাই মেটে প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্ক (PCB) বা নগরভিত্তিক সমবায় ব্যাঙ্ক (UCB)-গুলির মাধ্যমে।

এই সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ওপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে সমবায় সমিতি সংক্রান্ত নিবন্ধক (Registrar of Cooperative Societies) এবং সমবায় সমিতি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নিবন্ধক (Central Registrar of Co-operative Societies)-এর মতো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে।

● **ব্যাঙ্ক নয়, অথচ বহুলাংশে ব্যাঙ্কের মত কর্মকাণ্ডে সামিল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির (NBFC) ওপর নিয়ন্ত্রণ** : ভারতে এমন বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা ব্যাঙ্ক না হলেও আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ দেওয়ার কাজ করে থাকে (NBFC)। আর্থিক স্থিতিশীলতা, এবং টাকাপয়সা লেনদেন-এর বাজারে এই সব সংস্থার বড়ো ভূমিকা থাকায়, এগুলির প্রসারে উৎসাহ দিতে চায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তবে এখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য। NBFC-গুলির ধরনধারণের কথা মাথায় রেখে তাদের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বর্তমানে এজন্য একটি নির্দিষ্ট নীতি কাঠামো তৈরির কাজ চলছে।

● **গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা ও শিক্ষণ :** এই লক্ষ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে তৈরি হয়েছে গ্রাহকদের অভিযোগ প্রতিবিধান কেন্দ্র বা Customer Redressal Cell। ২০০৬ সালে গড়া হয় গ্রাহক পরিষেবা বিভাগ (Customer Service Department)। সম্প্রতি এর নাম পালটে করা হয়েছে গ্রাহক শিক্ষণ ও সুরক্ষা বিভাগ (Consumer Education and Protection Department)। ব্যাঙ্কগুলির গ্রাহকদের অভাব-অভিযোগের সমাধানে ১৯৯৫ সালে Banking Ombudsman (BO) প্রকল্পের সূচনা করা হয়। সারা দেশে বর্তমানে ২০-টি BO কার্যালয় আছে।

এইসব কার্যালয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, তপশিলভুক্ত প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্ক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের অভিযোগে নিষ্পত্তি হয়। ২০০৬ সালে BO প্রকল্পের পরিমার্জন হয়েছে। তার সংস্থান অনুযায়ী BO কার্যালয়গুলির কর্মী নিয়োগ করা হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কর্মরতদের মধ্যে থেকে। গ্রাহকদের প্রশিক্ষণ এবং নিরাপত্তায় সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে আরও কিছু উদ্যোগ।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাঙ্কগুলির অনুসরণীয় গ্রাহক সুরক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর তালিকা (Charter of Consumer Rights) তৈরি করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা RBI। সেখানে গ্রাহকদের ৫-টি অধিকারের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

(১) সুব্যবস্থার অধিকার;

(২) স্বচ্ছতা, সততা ও ভালো আচরণ পাওয়ার অধিকার;

(৩) প্রয়োজন ও সুবিধাসংক্রান্ত অধিকার;

(৪) ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার;

(৫) অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং ক্ষতিপূরণের অধিকার।

● **সরকারের অর্থভাণ্ডার এবং ঋণসংক্রান্ত ব্যবস্থাপক হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা :** কোনও দেশের সরকারের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত লেনদেনের ব্যবস্থাপক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যে চিরাচরিত ভূমিকা নির্দেশিত রয়েছে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কও তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা পালন করে চলেছে। ১৯৩৪-এর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে তার পাওয়া সবটুকু টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে এবং সরকারি ঋণ ব্যবস্থার দেখভালের দায়িত্বও শীর্ষ ব্যাঙ্কের হাতেই। কোনও রাজ্যের সরকারও নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে নিজের এইসব কাজের দায়ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিতেই পারে। বস্তুত, একমাত্র সিকিম ছাড়া এখন সব রাজ্যের ব্যাঙ্কার-ই হল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সিকিমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের ঋণ ব্যবস্থার দেখভালের জন্যই চুক্তি রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্বসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা রয়েছে এবং সরকারকে নানা

ফিরে দেখা

বাজারে ব্যাঙ্ক নোট নিয়ে আসা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, ঋণ ও নগদ ব্যবস্থাপত্রকে সঠিকপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যেই তৈরি হয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তার আগে এইসব কাজের দায়িত্ব ছিল নগদ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক (Controller of Currency) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যাত্রা শুরু হওয়ার পর সাবেক অবিভক্ত ভারতের কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, কানপুর, করাচি, লাহোরের নগদ দপ্তর বা Currency Office-গুলি তার ইস্যু বিভাগের শাখা হয়ে যায়। আর ব্যাঙ্কিং দপ্তরের কার্যালয় খোলা হয় কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অধুনা মায়ানমারের রেঙ্গুন-এ। উল্লেখ, ১৯৩৭-এ সাবেক বর্মা তথা অধুনা মায়ানমার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে গেলেও ওই অঞ্চল জাপানের দখলে আসার আগে পর্যন্ত, এবং জাপানের দখলমুক্ত হওয়ার পরেও ১৯৪৭-এর এপ্রিল পর্যন্ত, সেখানকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই সব কিছু সামলেছে। অন্যদিকে, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর ১৯৪৮-এর জুনে পাকিস্তানের স্টেট ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করার আগে পর্যন্ত সেখানকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ চালিয়ে গেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ প্রথমে ছিল শেয়ারমালিকদের হাতে। এর জাতীয়করণ হয় ১৯৪৯ সালে।

যা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল, সূচনার পর থেকেই উন্নয়নের প্রশ্নে, বিশেষত, কৃষিক্ষেত্রে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিশেষ ভূমিকায় দেখা গেছে। তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এদেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জমানা শুরু হওয়ার সময়। ষাটের দশকে মুদ্রাভাণ্ডারকে ব্যবহার করে উন্নয়নের নানা শর্তপূরণে কার্যত অণুঘটকের দায়িত্ব নির্বাহের কাজে শামিল হয় দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। আমানত বিমা ও ঋণ নিশ্চয়তা নিগম (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India), Unit Trust, শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠান গঠনের পেছনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের।

মুক্ত অর্থনীতির যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম ধীরে ধীরে তথাকথিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট দায়দায়িত্বকে ভিত্তি করেই এগিয়ে চলেছে। মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মে নজরদারি, আর্থিক বাজার ব্যবস্থার দেখভালের দিকেই এখন তার বেশি ঝোঁক।

মুম্বাইয়ের স্যর ফিরোজশাহ মেহতা রোডে অমর বিল্ডিং-এ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংগ্রহশালা।

ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে এই ব্যাঙ্ক। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের হয়ে টাকা দেওয়া-নেওয়ার পাশাপাশি বাজার থেকে সরকারের হয়ে ঋণবাবদ টাকা তোলা এবং তার যথাযথ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সামলায় RBI—একথা আগেই বলা হয়েছে। কোনও রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সাময়িকভাবে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে তা মেটানো হয় সুদের বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া স্বল্পমেয়াদি ধারের সাহায্যে (Ways and Means Advances)। আবার সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থাও করে RBI। অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরামর্শও নেয় সরকার। একীকৃত তহবিল (Consolidated Fund), আপৎকালীন তহবিল (Contingency Fund)-সহ বিভিন্ন খাতে টাকা জমা, সঞ্চয় এবং ব্যয়ের বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি নিজের নিজের মতো নিয়ম তৈরি করতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তা মেনে চলতে হয়। কারণ, এই সব খাতে তহবিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হেফাজতেই থাকে।

● **সরকারের ঋণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা :** প্রতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকারের ঋণের চাহিদা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সুদের হার এবং ঋণ সংগ্রহের সময়সূচির ওপর প্রভাব ফেলে নগদ জোগানের পরিমাণ এবং বাজারের চাহিদা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্য থাকে ঋণ সংগ্রহের খরচ এবং ঝুঁকি যাতে কম হয় সেদিকে। তার সঙ্গে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ঋণের মেয়াদ এবং বাজারে সরকারের শেয়ার কেনা-বেচার বিষয়টি যাতে সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক হয় তার ওপর।

● **ব্যাঙ্কগুলির সম্পদকোষ হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা :** ঋণখেলাপের মতো ঘটনা রুখতে দেশের ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের ওপর সবসময় নজর রাখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কতটা পরিমাণ ন্যূনতম উদ্বৃত্ত (Minimum Balance) ব্যাঙ্কগুলিকে রাখতে হবে তা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থির করে দেয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পারস্পরিক আদানপ্রদান হয় দেশের নানা প্রান্তে। এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলে তারা। কোনও নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের একটি শাখার উদ্বৃত্ত অন্য শাখায় পাঠানোর বিষয়টিতেও সহায়তা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কম্পিউটারে e-Kuber নামে একটি বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে। কম্পিউটারের জমানায় দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাজকর্মের প্রতিনিয়ত নজরদারি চালানো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে অনেক সহজে সম্ভব হচ্ছে।

● **লেনদেন এবং সমাধান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ :** বিভিন্ন ব্যাঙ্কের লেনদেন এবং গ্রাহক ও অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে আদানপ্রদানে হিসেবনিকেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির নিষ্পত্তির কাজটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের আওতাতেই হয়ে তাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে চলতি ব্যবস্থায় পরিমার্জন এবং উন্নত ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলার বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ওপর। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজকর্মে যাতে সাধারণ মানুষের আস্থা থাকে তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। ২০০৭-এর Payment and Settlement Systems Act এবং ২০০৮-এর Payment and Settlement Systems Regulation Act মোতাবেক এসংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিধিবদ্ধ ক্ষমতা সমর্পণ করা রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে।❑

গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করায় উদ্যোগ

- ছেঁড়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া নোটের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহ প্রদান।
- ব্যাঙ্কের শাখায় নোট বদলের সুযোগ।
- দেশের প্রান্তিক এলাকায় নোট এবং কয়েন পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সহায়ক সংস্থা নিয়োগে ব্যাঙ্কগুলিকে অনুমতি প্রদান।
- নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুরোনো নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার আন্তর্জাতিক রীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, ২০০৫ সালের আগেকার সব টাকা ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ।
- মাইক্রো সাইট 'পয়সা বোলতা হ্যায়'-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক নোট সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করে তোলার প্রয়াস।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থাপনা

দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রসঙ্গটিকে একটি কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় বলে ভাবা হ'ত। সীমিত জোগানই এজন্য দায়ি। দেশে প্রথমদিকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনার মূল অভিমুখই ছিল তার চাহিদার নিয়ন্ত্রণ। ১৯৩৯-এর তেসরা সেপ্টেম্বর ভারতের প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় এসংক্রান্ত অন্তর্বর্তী নিয়মকানুন জারি করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত স্থায়ী আইন প্রণয়ন হয় (১৯৪৭)-এ (Foreign Exchange Regulation Act)। ১৯৭৩-এ আরও সার্বিক রূপ দিয়ে জারি হয় নতুন আইন (Foreign Exchange Regulation Act, 1973)। এই আইনের আওতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার), দেশের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে অর্থপ্রদান, টাকার নোটের ও মূল্যবান ধাতব পিণ্ডের (bullion) আমদানি-রপ্তানি, আবাসী এবং অনাবাসীদের মধ্যে শেয়ারের লেনদেন, বিদেশের শেয়ার কেনা, দেশের ভেতরে এবং বাইরে স্থাবর সম্পত্তি কেনা-বেচা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের অধিকারপ্রাপ্ত।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত রীতিনীতি অনেকটাই শিথিল করা হয় ১৯৯১-এ উদারীকরণের সূচনার সময় থেকে। ১৯৯৩ সালে ফের সংশোধিত হয় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (Foreign Exchange Regulation Amendment Act, 1993)।

বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার, আমদানি শুল্ক হ্রাস, চলতি খাতে রূপান্তরকরণের সুযোগ এবং অন্য দেশে ভারতীয় বিনিয়োগের প্রসারের সঙ্গে তাল মেলাতে ১৯৯৯ সালে গৃহীত হয় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (Foreign Exchange Management Act—FEMA)। তা চালু হয় ২০০০ সালে পয়লা জুন। Foreign Exchange Regulation Act বা FERA-র জায়গা নেয় FEMA। নতুন এই আইনে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং দেশে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার জোরদার করে তোলা লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্থান রয়েছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ২০০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি তার বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের নাম পালটে করে বৈদেশিক মুদ্রা দপ্তর।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অনলাইন ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সাইবার সুরক্ষা

আর. সুব্রহ্মণীকুমার

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের হার রকেটের গতিতে বাড়ার সূত্রে ডিজিটাল দুনিয়ায় সাইবার সুরক্ষার প্রয়োগের দিকটি ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমাদের দেশ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এক সাইবার পরিকাঠামো নির্মাণের দিকে এগোচ্ছে, যেখানে ডিজিটাল লেনদেন নির্ভাবনায় করা যায়। তবে সব সময়েই নতুন নতুন আশঙ্কা থাকায়, সাইবার নিরাপত্তার এই বলয় ক্রমাগত উন্নত করে যেতে হবে। নিরাপত্তা আসলে এক পরিবর্তনশীল ধারণা। ঝুঁকি প্রশমন ও মোকাবিলায় সচেতনতাই মূল হাতিয়ার।

'ডিজিটালাইজেশন' বলতে বোঝায় ব্যাঙ্ক, উপভোক্তা, বাণিজ্যমহল, শিল্পমহল তথা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এমন এক অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যেখানে সাবেক নগদে লেনদেনের পথ ত্যাগ করে ডিজিটাল উপায়ে লেনদেনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। ব্যাঙ্কিং শিল্পক্ষেত্রের সামনে ডিজিটাইজেশন আজ আর বহু বিকল্প পথের অন্যতম মাত্র নয়, বরং তা অনিবার্য ভবিতব্য হয়ে উঠেছে। প্রতিটি শিল্পক্ষেত্রই ডিজিটাল পদ্ধতিতে তাদের কাজকর্মকে ঢেলে সাজানোর পথে হাঁটছে, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক লেনদেনগুলির গুরুত্ব বিশাল। ব্যাঙ্কের বা বাজারহাটে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অন্তত এক বারও আর্থিক লেনদেন হয়নি, আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই জীবনে এমন কোনও একটি দিনও খুঁজে পাওয়া ভার। তাই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহারে গ্রাহকদের সড়োগড়ো করে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে, এভাবেই মুছে ফেলতে হবে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার ফারাক।

ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে :

➢ ডিজিটালাইজেশনের সপক্ষে উপভোক্তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন।

➢ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের তরফে প্রয়াস।

➢ স্মার্টফোনের ব্যবহার ও মোবাইলের নেটওয়ার্কের প্রসারে দ্রুত বাড়বাড়ন্ত।

সীমিত নগদের অর্থনীতি বলতে এমন এক অর্থনীতিকে বোঝায়, যেখানে মানুষ অধিকাংশ লেনদেনই ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে করতে অভ্যস্ত। ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড,কার্ড সোয়াইপ বা পয়েন্ট অব সেল মেশিন, ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI) -BHIM, QR কোড ভিত্তিক লেনদেন, টাচ-এন-গো কার্ড ইত্যাদি এই ডিজিটাল পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত পন্থা।

● **ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস—BHIM :** BHIM UPI (Bharat Interface for Money–Unified Payments Interface) ভারতে চালু হওয়া এমন এক বৈপ্লবিক পেমেন্ট বা দাম মেটানোর ব্যবস্থা, সারা বিশ্বে যার জুড়ি মেলা ভার। এযাবৎ ৬০-টি ব্যাঙ্ক এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ ইতোমধ্যে BHIM অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৮২ লক্ষ লেনদেন সংঘটিত হয় BHIM অ্যাপের মাধ্যমে (লেখচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে BHIM অ্যাপ চালু হওয়ার পর পর এই অ্যাপটির মাধ্যমে মাসে প্রায় ৪০ হাজার লেনদেন হ'ত। এই সংখ্যাটি ২০০ গুণ বেড়ে এখন মাসিক ৮২ লক্ষ লেনদেনে পৌঁছে গেছে।

[লেখক ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তথা মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকর্তা (CEO)। ই-মেল : mdsec@iob.in]

আধার সংযুক্ত BHIM অ্যাপ এমন এক ডিজিটাল পেমেন্ট বা দাম মেটানোর ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের কাছ থেকে বিক্রীত পণ্য বা পরিষেবার দাম কাউন্টারে বসেই আধার যাচাই করে ডিজিটাল মাধ্যমে হাতে পাচ্ছেন। ক্রেতারা কোনও কার্ড বা নগদ টাকা ব্যবহার না করে শুধুমাত্র নিজের আধার সংখ্যা এবং বায়োমেট্রিক তথ্য দিয়ে এই ব্যবস্থার দৌলতে কেনাকাটা করতে পারছেন।

● **সাইবার সুরক্ষা :** সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের হার রকেটের গতিতে বাড়ার সূত্রে ডিজিটাল দুনিয়ায় সাইবার সুরক্ষার প্রয়োগের দিকটি ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ডিজিটালাইজেশনের পুরো ব্যবস্থাটির মধ্যে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পক্ষ রয়েছেন, এরা হলেন :

- উপভোক্তা/লেনদেনের সূত্রপাতকারী
- সূত্রপাতকারী সংস্থা
- লেনদেন প্রক্রিয়া চালায় যে সংস্থা
- সুফলভোগকারী সংস্থা
- সুফলভোগকারী

ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষ যে যে বিন্দুতে একে অন্যের সঙ্গে জুড়ছে, গুরুত্বপূর্ণ সেইসব সংস্পর্শ বিন্দুতেই সাইবার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সামগ্রিক লেনদেন ব্যবস্থাটিকে সাইবার নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলতে হবে। প্রতিটি লেনদেন কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি ছাড়া মসৃণভাবে সম্পন্ন করতে কোনও বিপদসংকেতকে উপেক্ষা না করার পাশাপাশি তিনটি শর্তরক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজন :

- গোপনীয়তা
- সংহতি
- সলজলভ্যতা

এবারে দেখে নেব, গোটা লেনদেন পর্বের কোনও একটি পর্যায়েও যাতে সাইবার নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সেবিষয়টিকে এই লেনদেনের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ কীভাবে নিশ্চিত করতে পারে। প্রথমে আসা যাক উপভোক্তা/লেনদেন সূত্রপাতকারী প্রসঙ্গে। যে ডিভাইস বা যন্ত্র ব্যবহার করে ক্রেতা ও উপভোক্তা লেনদেন করছেন তার

সাইবার সুরক্ষা সর্বাগ্রে নিশ্চিত করতে হবে তাকে। সেই ডিভাইসে অন্তত পক্ষে অত্যাধুনিক অ্যান্টি-ভাইরাস লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে ই-মেল থেকে ক্লিক করে ওয়েবসাইটে যেন না ঢোকা হয়; তবে ওয়েবসাইটের ঠিকানা টাইপ করার সময় সতর্ক থাকা দরকার।

"মাগনায় কিছুই মেলে না"—তাই মোবাইল বা অনলাইনে আসা যেসব বার্তা বিনামূল্যে সুবিধা দেওয়ার কথা জানায়, সেইসব সুবিধা গ্রহণের আগে ভালো করে সব দিক খতিয়ে দেখা উচিত। লেনদেনের সময় যেসব পাসওয়ার্ড ও পিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, তা অবশ্য করে গোপন রাখতে হবে। কখনওই কাউকে সেসব তথ্য জানানো বা অনলাইনে কোন লিঙ্কে দেওয়া ঠিক নয়। এইসব নিয়ম মেনে চললে লেনদেনের গোপনীয়তা লেনদেন প্রক্রিয়া চলাকালীন আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এবার আসা যাক লেনদেনের সূত্রপাতকারী/সুফলভোগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গে। উপভোক্তা বা সূত্রপাতকারীর তরফের পর্ব মেটার পরের ধাপে লেনদেনে যুক্ত হয় সূত্রপাতকারী প্রতিষ্ঠান, যা সাধারণত কোনও আর্থিক সংস্থার তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কুঁড়েঘর হোক বা বিলাসবহুল বাংলো, সব বাড়ির যেমন একটা তালাচাবি বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকে, ঠিক তেমনি প্রতিটি তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা, তা সর্বাধুনিক মানের বা সেকেলে ঢঙের, যাই হোক না কেন, তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়া দরকার। লেনদেন চক্রের সংহতিকে সুনিশ্চিত করে কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

লেনদেনের সঙ্গে জড়িত সব পক্ষের মধ্যে যথাযথ সংহতি থাকলে লেনদেন চক্রের গোটা সময়পর্ব জুড়ে তথ্যের ধারাবাহিকতা, নির্ভুলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সুনিশ্চিত থাকে। লেনদেনের কোনও পর্বেই

লেখচিত্র-১
BHIM অ্যাপের মাধ্যমে লেনদেনের খতিয়ান

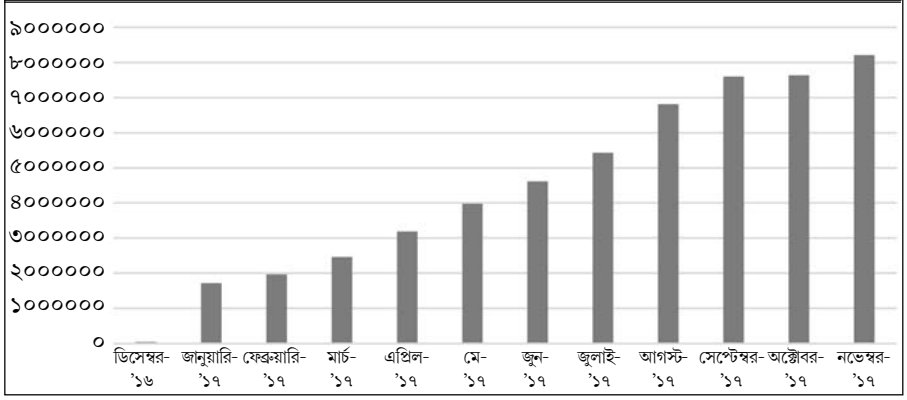

তথ্য বদলানো যাবে না এবং কোনও অবৈধ উপায়ে হস্তক্ষেপ করে কিছুতেই যাতে তথ্য পালটানো না যায়, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আসা যাক লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্নকারী সংস্থা প্রসঙ্গে। অধিকাংশ ডিজিটাল লেনদেনই একটি কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সির মারফত পাস হয়। তা হয় মুম্বাইস্থিত NPCI (ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া) অথবা হায়দরাবাদস্থিত IDRBT (ইন্সটিটিউট ফর ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ইন ব্যাঙ্কিং টেকনোলজি), এর মধ্যে যেকোনও একটির মাধ্যমে।

এই ব্যবস্থায় অনলাইন লেনদেনে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির এসংক্রান্ত তথ্য-প্রযুক্তি কাঠামো নির্মাণ করতে হয় এই কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সিদের নির্ধারিত মান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংস্থা যাতে উল্লিখিত লেনদেন ব্যবস্থার নাগাল পায় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সির উপরই ন্যস্ত। এই লেনদেন ব্যবস্থার শেষ প্রান্তে অবস্থান করে সুফলভোগকারী। গোটা লেনদেন চক্রে তার সাইবার সুরক্ষার দায় সবচেয়ে কম। কারণ এই সংস্থা লেনদেন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অর্থ গ্রহণ করছে। একে একমাত্র একটাই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর/ IFSC কোড বা ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেস লেনদেনের সূত্রপাতকারীকে জানানো হচ্ছে, তা যেন নির্ভুল হয়।

সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করে তুলতে ভারত সরকার বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

জাতীয় সাইবার সুরক্ষা নীতি, ২০১৩ (NCSP)

সাইবার সুরক্ষার লক্ষ্যে আইনসঙ্গত পদক্ষেপ হিসাবে বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের তরফে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রক, ২০১৩ সালে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা নীতি প্রকাশ করে। আমনাগরিক, শিল্পমহল ও সরকার—সকলের

চিত্র-১

জন্য এক সুরক্ষিত ও প্রশস্ত সাইবার পরিসর সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এই নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতির প্রণয়নের উদ্দেশ্য, সাইবার দুনিয়ার তথ্য ও পরিকাঠামোর সুরক্ষা বিধান, সাইবার আক্রমণ প্রতিহত করা ও প্রত্যাঘাতের সামর্থ্য অর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, মানবসম্পদ, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে সাইবার আক্রমণের দরুন লোকসানের পরিমাণ যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা চালানো। সংশ্লিষ্ট নীতিতে কয়েকটি রণকৌশলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- জাতীয় স্তরে একটি নোডাল এজেন্সি গঠন, পরিচালন গোষ্ঠীর একজন বরিষ্ঠ সদস্যকে মুখ্য তথ্য নিরাপত্তা আধিকারিক হিসাবে নিয়োগে সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করা, প্রতিটি সংস্থার নিজস্ব তথ্য সুরক্ষা নীতি প্রণয়নের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে একটি সুরক্ষিত সাইবার পরিবেশ গঠন।
- তথ্য-প্রযুক্তি এবং সাইবার নিশ্চয়তাদান করবে এমন এক কাঠামো সৃষ্টি।
- এসংক্রান্ত নিয়ামক কাঠামোর সামর্থ্য বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার পর্যালোচনা, সাইবার নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সাযুজ্যসাধন এবং সাইবার সুরক্ষার আইনি কাঠামো বিষয়ে সচেতনতার প্রসার।
- সাইবার হামলা রুখতে জাতীয় স্তরে যথাযথ প্রতিরোধী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- সাইবার সুরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগ, আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং সংকট ব্যবস্থাপনায় নোডাল এজেন্সি হিসাবে National Computer Emergency Response Team (CERT-in) কাজ করবে বলে স্থির করা হয়েছে।
- মূল সরকারি পরিকাঠামোগুলি আরও বেশি বেশি করে ব্যবহার করে তথা বিশ্বমানের সেরা পদ্ধতি অনুসরণ করে ই-প্রশাসনকে সুরক্ষিত করা।
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সুরক্ষায় নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করবে National Critical Information Protection Centre (NCIPC)।
- সাইবার সুরক্ষায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন ও গবেষণায় কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানো।
- সাইবার সুরক্ষায় সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

সাইবার স্বচ্ছতা কেন্দ্র

সাইবার সুরক্ষা লঙ্ঘনের ঘটনা মোকাবিলায় তথা তার বাড়বাড়ন্ত রুখতে ভারত সরকারের কম্পিউটার জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা দল (National Computer Emergency Response Team, CERT-in) ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাইবার স্বচ্ছতা কেন্দ্র (Botnet Cleaning and

Malware Analysis Centre) চালু করে। এই কেন্দ্রে ডেস্কটপ কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের সাইবার সুরক্ষায় নতুন পন্থার উদ্ভাবন করেছে।

২০০০ সালের তথ্য-প্রযুক্তি আইনের ৭০বি ধারা মোতাবেক এই কেন্দ্রের পরিচালনভার CERT-in-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই উদ্ভাবনা ভারত সরকারের বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির অঙ্গ। উল্লিখিত উদ্ভাবনা ভারতে Botnet Infection চিহ্নিত করে সেগুলি যাতে আর ছড়াতে না পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি End User বা ব্যবহারকারীদের সিস্টেম পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত রাখে। ম্যালওয়্যারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ, এগুলোর সম্বন্ধে বিশদ তথ্য জোগানো, নাগরিকদের এই ম্যালওয়্যার হটাতে সক্ষম করা, এবং নিজেদের তথ্য, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ও হোম রাউটারের মতো সরঞ্জামগুলিকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় সেসম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতার প্রসারে সাহায্য করাও এই কেন্দ্রের কাজের মধ্যে পড়ে।

জাতীয় সাইবার সুরক্ষা নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অনুসারে দেশে নিরাপদ এক সাইবার পরিসর গড়ে তোলার দিকে সাইবার স্বচ্ছতা কেন্দ্র এক বড়ো পদক্ষেপ। এই কেন্দ্র সাইবার নিরাপত্তা প্রদান ও সাইবার হামলা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন টুল উদ্ভাবন করেছে।

● **ইউএসবি প্রতিরোধ**, নামক টুল চালু করে কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন মন্ত্রকের মন্ত্রী, রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছিলেন, এর লক্ষ্য হল পেন ড্রাইভ, এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ ও ইউএসবি সাপোর্টেড মাস স্টোরেজ ডিভাইসের মতো রিমুভেবল ইউএসবি স্টোরেজ মিডিয়া ডিভাইসের অবৈধ উপায়ে ব্যবহারের উপর রাশ টানা।

● **সন্ত্রিদ** নামে একটি অ্যাপ উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেটি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করে। এটি কেবলমাত্র আগে থেকে অনুমোদিত ফাইলগুলিকেই খুলতে দেয়, ফলে সন্দেহজনক অ্যাপ্লিকেশনগুলির হাত থেকে ডেস্কটপ সুরক্ষিত থাকে।

● অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের সুরক্ষায় **এম-কবচ** নামে একটি ডিভাইস বানানো হয়েছে। ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য চুরি করে যেসব ম্যালওয়্যার, তার সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলির হাত থেকে সুরক্ষা জোগায় তা। ওয়াই-ফাই ও ব্লুটুথ রিসোর্সের অপব্যবহার রোধের সঙ্গে সঙ্গে স্প্যাম ও প্রিমিয়াম রেট মেসেজ এবং অবাঞ্ছিত কল আসা আটকায় এটি। মোবাইল হারানো বা চুরির ভয়ও দূর করে এই যন্ত্র।

● **ব্রাউজার জেএস গার্ড** এমন এক টুল, যা ব্রাউজারের এক্সটেনশন হিসাবে কাজ করে এবং Heuristics-এর ভিত্তিতে ওয়েবব্রাউজারের ওপর চালানো ক্ষতিকারক HTML ও জাভাস্ক্রিপ্ট হামলা চিহ্নিত ও প্রতিহত করে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কোনও সন্দেহজনক ওয়েবপেজ খুললেই তাকে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে সেই ওয়েবপেজ থেকে বিপদের আশঙ্কার ধরনধারণ সব বিশদে বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দেয় এটি।

তথ্য-প্রযুক্তি আইন ২০০০, এবং ২০০৮

তথ্য-প্রযুক্তি আইন, ২০০০ হল ভারতে সাইবার অপরাধ মোকাবিলা ও অনলাইন ব্যবসা বা ই-কমার্স বিষয়ক প্রাথমিক আইন। ২০০৮ সালে এই আইন সংশোধন করা হয়। তথ্য-প্রযুক্তি আইনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে।

➢ ডিজিটাল ও বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর
➢ ই-প্রশাসন
➢ বৈদ্যুতিন রেকর্ড প্রেরণের স্বীকৃতি
➢ সুরক্ষিত বৈদ্যুতিন রেকর্ড ও ডিজিটাল স্বাক্ষর
➢ শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ামন
➢ বৈদ্যুতিন স্বাক্ষর শংসাপত্র

বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ এবং তার শাস্তি সম্পর্কে বিশদে জানানো হয়েছে এই আইনের নথিতে। এই আইনে যেসব অপরাধকে সাইবার অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে তাহল :

➢ কম্পিউটারের উৎস নথিতে অনধিকার পরিবর্তন
➢ কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করা
➢ চুরি করা কম্পিউটার বা অন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস কারও থেকে নেওয়া
➢ অন্যের পাসওয়ার্ড ব্যবহার
➢ কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রতারণা
➢ সাইবার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ
➢ রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি
➢ নির্দেশ পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন বা গাফিলতি
➢ তথ্য ও ডেটা Decrypt করতে গাফিলতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন
➢ কোন সুরক্ষিত সিস্টেম অ্যাকসেস করার চেষ্টা করা বা তা অ্যাকসেস করা
➢ মিথ্য বা বিভ্রান্তিকর পরিচয় জ্ঞাপন

এবার আসা যাক অনলাইন প্রতারণা সম্পর্কে তথ্য-প্রযুক্তি আইন কী বলা আছে সেপ্রসঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের সাইবার প্রতারণার সংজ্ঞা তথা অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে সাইবার প্রতারণার শাস্তি সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানানো হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি আইনে। অনলাইনে ঘটে এমন সবচেয়ে আম ব্যাঙ্কিং প্রতারণা হল ফিশিং (Phishing)।

❖ **ফিশিং** : ফিশিং বলতে বোঝায় ভুল বুঝিয়ে কারও লগ-ইন পাসওয়ার্ড, পিন, ক্রেডিট কার্ড নম্বরের মতো অত্যন্ত গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে কোনও আস্থাভাজন সংস্থার প্রতিনিধির ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রতারক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন ই-মেল, ইন্সট্যান্ট মেসেজ বা টেক্সট মেসেজ খুলে দেখার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফিশিং প্রতারণার ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলি প্রযুক্ত হয়।

✓ ধারা ৬৬ (কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং) : কোনও ব্যক্তি যদি জ্ঞানত অন্য ব্যক্তি বা জনসাধারণের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে কম্পিউটারে থাকা তথ্য নষ্ট করে, মুছে দেয় অথবা পালটে দেয়, কিংবা তার উপযোগিতা কমিয়ে দেয়, বা সেকাজ করার চেষ্টা চালায় তাহলে তাকে হ্যাকিং বলা হয়। এই ধারার আওতায় তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা একসাথে দুয়েরই সংস্থান রয়েছে।

✓ ধারা ৬৬বি (চুরি করা কম্পিউটার বা অন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস নেওয়া) : কোনও চুরি করা কম্পিউটার কারও কাছ

থেকে নিলে বা নিজের কাছে রাখলে এই ধারা তার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। শাস্তি, তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং/অথবা ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

✓ ধারা ৬৬সি (অন্যের পাসওয়ার্ড ব্যবহার) : কোনও ব্যক্তি প্রতারণা করে অন্যের পাসওয়ার্ড, ডিজিটাল স্বাক্ষর বা অন্য কোনও অভিন্ন পরিচয়জ্ঞাপক তথ্য ব্যবহার করলে তার শাস্তি তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা/এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

✓ ধারা ৬৬ডি (প্রতারণা করে কম্পিউটার ব্যবহার) : কোনও ব্যক্তি কম্পিউটার বা অন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস ব্যবহার করে অন্যকে প্রতারণা করলে সেই অপরাধের শাস্তি তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা/এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

❖ **ক্রেডিট কার্ড প্রতারণা** : ক্রেডিট কার্ড প্রতারণা হল আর এক ধরনের অনলাইন ব্যাঙ্কিং প্রতারণা, যেখানে কোনও গ্রাহকের কার্ডের তথ্য হাতিয়ে নিয়ে (spoofing) অনলাইনে ব্যবহার করা হয়। এধরনের প্রতারণার ক্ষেত্রেও তথ্য-প্রযুক্তি আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধিতে প্রতিকার তথা প্রতারকের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের সংস্থান রয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি আইনের নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

✓ ধারা ৬৬—কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং।

✓ ধারা ৬৬সি—অন্যের পাসওয়ার্ড ব্যবহার।

✓ ধারা ৬৬ডি—কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রতারণা।

এছাড়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারাটিও এর সঙ্গে যুক্ত হবে। ক্রেডিট কার্ড প্রতারণার সর্বাধিক শাস্তি হল ৭ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা।

তথ্য-প্রযুক্তি আইনে একজন গ্রাহক এইসব সুরক্ষাকবচের সুবিধা তো ভোগ করেনই, এর সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের প্রতিটি ব্যাঙ্ককে সাইবার প্রতারণার বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও নিশ্ছিদ্র করার নির্দেশ দিয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা

গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার নির্দেশ সম্বলিত, "গ্রাহক সুরক্ষা-অননুমোদিত বৈদ্যুতিন ব্যাঙ্কিং লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সীমিত দায়" শীর্ষক একটি নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

প্রতারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি গ্রাহক সে তথ্য ব্যাঙ্ককে জানিয়ে দেন, তাহলে তাকে যাতে কোনও দায় বহন করতে না হয়, অথবা ন্যূনতম দায় বহন করেই রেহাই পান, তার ওপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ জোর দিচ্ছে।

প্রতারণামূলক লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি ব্যাঙ্কের কোনও ভূমিকা থাকে, অথবা ব্যাঙ্কের তরফে গাফিলতির প্রমাণ মেলে, তাহলে গ্রাহককে কোনও দায় বহন করতে হবে না। ব্যাঙ্কের ভূমিকা বাদে, তৃতীয় কোনও পক্ষ যদি প্রতারণামূলক লেনদেনের ষড়যন্ত্রী হয়, তবে, লেনদেনের খবর জানার পর তিনটি কাজের দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ককে তা জানিয়ে দিলেও গ্রাহককের কোনও দায় থাকে না। যে পরিমাণ অর্থ প্রতারণা করা হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে দশ দিনের মধ্যে জমা করা হয়।

সব গ্রাহককে বাধ্যতামূলকভাবে টেক্সট মেসেজ সতর্কতা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিটি ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়েছে। ওই মেসেজেই উত্তর দেবার ব্যবস্থা থাকবে যার মাধ্যমে গ্রাহক কোনও প্রতারণামূলক লেনদেনের খবরাখবর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের নজরে আনতে পারবেন।

ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ওয়েবসাইটেও অননুমোদিত লেনদেন জানাবার সংস্থান রাখতে হবে যাতে গ্রাহকদের অভিযোগের নিষ্পত্তি সহজে হয়। ফোন ব্যাঙ্কিং, এসএমএস, ই-মেল, কল সেন্টার, ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম, যেকোনও মাধ্যমেই গ্রাহকরা তাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তবে গ্রাহকের গাফিলতিতে প্রতারণার ঘটনা ঘটলে, সেক্ষেত্রে তাকেই পুরো দায়ভার বহন করতে হবে, যতক্ষণ না তিনি ব্যাঙ্ককে এই লেনদেনের খবর জানাচ্ছেন।

তৃতীয় পক্ষের কারণে ক্ষতি হলে, গ্রাহক যদি ব্যাঙ্কের তরফে প্রতারণামূলক লেনদেনের মেসেজ অ্যালার্ট পাওয়ার চার থেকে সাত দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ না করেন, তা হলে ক্ষতির সম্পূর্ণ দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। আর চার থেকে সাত দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করলে অ্যাকাউন্টের ধরণ ও ক্রেডিট কার্ডের ঊর্ধ্বসীমার ওপর নির্ভর করে গ্রাহককে সর্বাধিক ৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতির দায় বহন করতে হবে।

উপসংহার

এইসব ব্যবস্থাপত্র ও হাতিয়ারে বলীয়ান হয়ে আমাদের দেশ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এক সাইবার পরিকাঠামো নির্মাণের দিকে এগোচ্ছে, যেখানে ডিজিটাল লেনদেন নির্ভাবনায় করা যায়। তবে সব সময়েই নতুন নতুন আশঙ্কা থাকায়, সাইবার নিরাপত্তার এই বলয় ক্রমাগত উন্নত করে যেতে হবে। নিরাপত্তা আসলে এক পরিবর্তনশীল ধারণা। ঝুঁকি প্রশমন ও মোকাবিলায় সচেতনতাই মূল হাতিয়ার।❑

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের পুনর্মূলধনীকরণ

আশুতোষ কুমার

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে অভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকার একটি বিশদ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এজন্য যেসব পন্থা-প্রকরণ অনুসৃত হবে, তার মধ্যে রয়েছে বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ, বাজেটে আর্থিক সংস্থান এবং ব্যাঙ্ক পুনর্মূলধনীকরণ বন্ড চালু করা। পরিকল্পনাটি ঘোষণা করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, "ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে উঠলে আরও কর্মসংস্থান, আরও বিকাশ ও আরও বিনিয়োগ সুনিশ্চিত হবে।"

বিগত কয়েক বছরের বিপুল পরিমাণ অনুৎপাদক সম্পদের বোঝায় সংকটাপন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির রুগ্নতা কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা চলতি বছরের ২৪ অক্টোবর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। দেখা যাচ্ছিল ব্যালান্স শিটে অনাদায়ী ঋণের বোঝা ওই সব ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতার ওপর ভীষণভাবে প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে যার ফলে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগ ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সামগ্রিক মূলধন গঠন। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, ২.৭৩ লক্ষ কোটি টাকার অনুৎপাদক সম্পদ বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-এর জুনে দাঁড়িয়েছে ৭.৩৩ লক্ষ কোটি টাকায়। মোদ্দা কথা হল মাত্র দু' বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ের ব্যবধানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় ঋণখেলাপের হিসাব তিনগুণের বেশি বেড়েছে। আরও কেটি খতিয়ান বেশ উদ্বেগজনক, তা হল দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ সম্প্রতি তাদের ঋণপ্রদান ও আগাম অর্থ সংস্থানের প্রায় ১০ শতাংশে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ওই দিনের বৈঠকে অভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকার একটি বিশদ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এজন্য যেসব পন্থা-প্রকরণ অনুসৃত হবে, তার মধ্যে রয়েছে বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ, বাজেটে আর্থিক সংস্থান এবং ব্যাঙ্ক পুনর্মূলধনীকরণ বন্ড চালু করা। পরিকল্পনাটি ঘোষণা করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, "ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে উঠলে আরও কর্মসংস্থান, আরও বিকাশ ও আরও বিনিয়োগ সুনিশ্চিত হবে।" ঘোষিত ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকার ওই পরিকল্পনার মধ্যে বাজেট সংস্থান বাবদ ১৮ হাজার কোটি টাকা, ইক্যুইটি ইস্যুবাবদ ৫৮ হাজার কোটি টাকা এবং ব্যাঙ্ক পুনর্মূলধনীকরণ বন্ডবাবদ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা ধার্য হয়েছে।

প্রথমেই দেখা যাক বন্ডের সাহায্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কীভাবে উপকৃত হতে পারে। বন্ড ইস্যুর রূপরেখাটি চূড়ান্ত করা হচ্ছে অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা বিভাগ ও অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগের যৌথ প্রয়াসে। বন্ড ইস্যুর মধ্যবর্তিতায় কোনও ব্যাঙ্ক কী পরিমাণ মূলধন পাবে, তা নিয়ে শীঘ্রই বিস্তারিতভাবে জানানো হবে। বলা হচ্ছে যে, বন্ড ইস্যুর সময় এগুলিকে 'ফ্রন্ট-লোডেড' করা হবে। এর অর্থ হল, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকার গরিষ্ঠাংশই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় ঢালা হবে।

এবার রিক্যাপিটালাইজেশন বন্ড বা পুনর্মূলধনীকরণ বন্ডের ভূমিকা এবং অর্থনীতিতে তার সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়টি খতিয়ে দেখা যাক। খুব সম্ভবত সরকারের তরফেই বন্ড ইস্যু করা হবে এবং ব্যাঙ্কগুলিই তা সাবস্ক্রাইব বা সরাসরি গ্রহণ করবে। এভাবেই এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র প্রবেশকালীন গণনায় পরিণত হবে এবং সার্বভৌম অর্থের

[লেখক সাংবাদিক, BTVI চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : kr.ashu09@gmail.com]

বহির্গমণ ঘটবে না। অর্থের হস্তান্তর রুদ্ধ হবার দরুন সরকারও বাড়তি আর্থিক বোঝা বহন করার দায় থেকে অব্যহতি পাবে।

সরকার কি ঋণদাতাদের সেকেন্ডারি বাজারে বন্ড বিক্রয় করার অনুমতি দেবে? বিশদ ঘোষণা না হওয়া অবধি এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, উভয় সম্ভাবনাই তাদের মূলধন ভিত্তি প্রসারিত হওয়ার দরুন ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। ব্যাঙ্কগুলিকে সেকেন্ডারি বাজারে বন্ড বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হলে তারাও নিজস্ব অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে এবং তাদের হিসাবপত্রে উন্নতি ঘটবে। অন্যদিকে আবার ওই অনুমতি না পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিনিয়োগের ওপর সুদবাবদ আয়ের সুযোগ থাকছে। এককথায় বলা যেতেই পারে যে, পুনর্মূলধনীকরণ বন্ড ইস্যু ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ওপর অনুকূল প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

নোটবন্দির পর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা পড়েছে, তার নিরিখেও বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্তকে সঠিক পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সূত্রে ইতোমধ্যেই জানানো হয়েছে যে, বাতিল হওয়া ৫০০ এবং এক হাজার টাকার নোটের ৯৯ শতাংশই ব্যাঙ্কিং চ্যানেলে ফিরে এসেছে।

ঋণ পরিশোধে অসমর্থতা ও দেউলিয়া নিয়মাবলি বা কোডের প্রেক্ষিতেও বন্ড ইস্যুর তাৎপর্য যাচাই করা সম্ভব। গত বছর প্রণীত দেউলিয়া কোডের ভিত্তিতে বর্তমানে প্রায় ৩০০ অ্যাকাউন্টের সমস্যা মীমাংসা করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলির ১২-টি হল বিপুল পরিমাণ অর্থের ঋণখেলাপি অ্যাকাউন্ট, যার মূল্য প্রায় ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকা। ওই ১২-টি অ্যাকাউন্টকে গত বছরের জুন মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল বা National Company Law Tribunal (NCLT)-এ পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক ও ঋণখেলাপি সংস্থাগুলি যদি নিজেদের মধ্যে আপস-মীমাংসায় ব্যর্থ হয়, তা হলে আরও ২৯-টি তালিকাভুক্ত সংস্থাকে ওই ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হবে। এতগুলি খাতক কোম্পানি নিষ্পত্তির পথ খোঁজায়, তাদের বকেয়া টাকার বেশ কিছুটা অংশ ব্যাঙ্কগুলিকে হয়তো ছেড়ে দিতে হবে। বস্তুত, এক বিশেষজ্ঞ মনে করেন কিছু মোটা অঙ্কের অনুৎপাদনশীল সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে পারে।

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরামর্শদাতা সংস্থা, ক্রিসিল গত জুলাইয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে ৫০-টি বড়ো অঙ্কের বিপন্ন অ্যাকাউন্ট বা সম্পদ (স্ট্রেসড অ্যাসেটস বা বিপন্ন সম্পদ = অনুৎপাদনশীল সম্পদ + ডুবন্ত বা খারাপ ঋণ + বাতিল বা

খরচের খাতায় ফেলা ঋণ) ফয়সালায় ব্যাঙ্কগুলির ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা বা ৬০ শতাংশ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এসব কোম্পানি অর্থনীতির খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির আওতায় পড়ছে। এধরনের মোট ঋণের ৩০ শতাংশ নিয়েছে ধাতু শিল্পের কিছু কোম্পানি। ২৫ শতাংশের খাতক নির্মাণ শিল্প এবং শক্তি ক্ষেত্রের কয়েকটি কোম্পানির কাছে বকেয়া আছে ১৫ শতাংশ ঋণ। চলতি বছর ৩১ মার্চ পর্যন্ত, মোট খেলাপি ঋণের প্রায় অর্ধেকের জন্য দায়ি এসব কোম্পানি। ক্রিসিলের কথায়, ৫০-টি বিপুল বিপন্ন সম্পদে আটকে থাকা ৪ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের মীমাংসায় ব্যাঙ্কগুলি হয়তো ৬০ শতাংশ, অর্থাৎ ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

পরামর্শদাতা সংস্থাটি এই ছাড় দেওয়ার চারটি শ্রেণিভাগ করেছে। এগুলি হচ্ছে; দেদার (৭৫ শতাংশের বেশি), পেল্লায় (৫০-৭৫ শতাংশ), মাঝারি (২৫-৫০ শতাংশ) এবং সামান্য (২৫ শতাংশের কম)। প্রায় ২৫ শতাংশ ঋণে সামান্য বা মাঝারি ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এক-তৃতীয়াংশে পেল্লায় এবং ৪০ শতাংশের ক্ষেত্রে দেদার ছাড় দরকার।

এবার আসা যাক ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে। শক্তি ক্ষেত্রে চাই মাঝারি মকুব। আর ক্রিসিলের মতে ধাতু ও নির্মাণ ক্ষেত্রে দেদার রেহাই দরকার। ধারদেনা দেদার বাদ দেওয়া প্রয়োজন এমন কোম্পানিগুলি, ব্যবসা টিকিয়ে রাখার মতো অবস্থায় না থাকায়, টাকাকড়ি উদ্ধারে এদের সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মাঝারি ও পেল্লায় মকুবের শ্রেণিভুক্ত কোম্পানিগুলি মূলধনী ব্যয়ের সংস্থান করতে ঋণ নিয়েছে। তবে চাহিদায় মন্দা বা নিয়ামক ইস্যুর গেরোয় প্রকল্প আটকে পড়ার দরুন সময় ও খরচ দুই-ই বেড়ে যাওয়ায়, এসব কোম্পানি আর লাভজনকভাবে চালানো সম্ভব নয়।

ক্রিসিলের রিপোর্ট অনুসারে, ঋণে সামান্য রেহাই পাওয়ার প্রয়োজন, এমন কোম্পানিগুলি সাময়িক ঝুটঝামেলার শিকার। কিছুদিন পরে তারা এসব হ্যাপা কাটিয়ে উঠতে পারে। সংস্থাটি বলেছে, "অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে, পাত্রটিকে লাথি দিয়ে রাস্তায় ফেলার চেয়ে, ঋণে ছাড় দেওয়ার তেতো বড়ি গেলা ভালো।"

দেউলিয়া দশা ঘোচাতে ঋণে ছাড় দেওয়া এবং বাসেল ও চুক্তি মাফিক মূলধনের নির্দিষ্ট রীতি মেনে চলার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আরও পুঁজি জোগানো দরকার। আর এ দায়িত্ব খোদ সরকারের, কেননা সরকারই এসব ব্যাঙ্কের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার। এক্ষেত্রে পুনর্মূলধনীকরণ বা আরও পুঁজি ঢালতে বন্ডই

মুশকিল আসানের হাতিয়ার। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে তখনই, যখন সরকার বন্ড মারফত টাকা তোলার পরিমাণ, বন্ড কে ইস্যু করবে ও কারা তা কিনতে পারবে, বন্ডের সাইজ ও কুপনের দাম ইত্যাদি ঘোষণা করবে।

অন্যদিকে বন্ড ইস্যু ম্যাক্রো-অর্থনীতি, বিশেষ করে আর্থিক ঘাটতির দিকটিকে কীভাবে প্রভাবিত করছে, সেটাও দেখা যেতে পারে। বন্ডের কারণে বার্ষিক সুদবাবদ খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮ হাজার থেকে ৯ হাজার কোটি টাকা। সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যনের মতে, বন্ড ইস্যু মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন বা আর্থিক ঘাটতিতে বিস্তার ঘটাবে না। সমগ্র বিষয়টি অবশ্য গণনা প্রক্রিয়ার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।

বন্ড ইস্যু ঘোষণার পর দিনই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক বক্তৃতায় মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বলেন, 'পুনর্মূলধনীকরণ বন্ডের বার্ষিক সুদবাবদ ৮-৯ হাজার কোটি টাকা খরচ হলেও তা মুদ্রাস্ফীতি বা আর্থিক ঘাটতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না বরং এর ফলে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জোয়ার আসবে এবং নতুন সম্পদ সৃষ্ট হবে।' তিনি আরও জানান যে, ভারতীয় গণনা পদ্ধতির আওতায় রিক্যাপ বন্ডের দরুন ঋণের বিস্তার ঘটায় আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে, তবে IMF নির্দিষ্ট পন্থায় গণনা পরিচালিত হলে সেরকমটা হবার সম্ভাবনা নেই।

তবে শুধু বন্ড ইস্যুই নয়, পাশাপাশি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রটির ব্যাপক সংস্কারসাধনও বাঞ্ছনীয়; যা নিয়ে ইতোমধ্যেই সরকারের তরফে সদিচ্ছা ও সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে। গত মাসের ১২ তারিখ দিল্লির নিকটস্থ গুরুগ্রামে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির এক মন্থন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং এবং আর্থিক পরিষেবা সচিব রাজীব কুমার আভাস দেন যে, প্রস্তাবিত মূলধন ভিতের সম্প্রসারণের সঙ্গে একযোগে দায়বদ্ধতার ওপরও জোর দিতে হবে। তিনি বলেন, 'সবকিছুই ব্যাঙ্কিং সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেখানে প্রতিটি ব্যাঙ্কের বোর্ডকেই খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থির করতে হবে তারা আগামী দিনে কী ধরনের ব্যবস্থা ও কর্মপ্রণালী অনুসরণ করতে চলেছে। মনে রাখতে হবে টাকার সংস্থান করাটা খুব সহজ কাজ নয়। পরবর্তী ধাপে সর্বস্তরে অবশ্যই সংস্কার আনতে হবে। তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন যে, ব্যাঙ্কিং সংস্কারের অঙ্গীভূত হয়েই সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলিকে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে এবং নিতে হবে সংহতিকরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা।

রাজীব কুমারের মতে, বন্ড সংক্রান্ত পরিকল্পনাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলতি বছরের মধ্যেই অনেকটা কাজ সম্পন্ন করা দরকার।

এদিকে ব্যাঙ্ক পুনর্মূলধনীকরণের এসব ভাবনাচিন্তার প্রতি দেশের করপোরেট ক্ষেত্রও সমর্থন ব্যক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে পেশ করা তাদের প্রাক্-বাজেট সুপারিশে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (CII) বলেছে যে, 'পুনর্মূলধনীকরণ বন্ডগুলির রি-ইস্যু করার জন্যও ব্যাঙ্কগুলিকে অনুমতি দেওয়া হোক, যাতে করে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ছাড়া জনসাধারণও সেগুলি কিনতে পারেন।'❑

WBCS হতে গেলে

● প্রিলির জন্য ●

❖ কী পড়বে—কীভাবে ↳ এটা জানো
❖ নেগেটিভ কমানোর টেকনিক আছে ↳ রপ্ত করো
❖ প্রশ্নের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে কি? বোঝো

আমাদের সঙ্গে যুক্ত না হলেও নিতে পারো

➲ স্পেশাল রিভিশন ক্লাস
➲ মেমোরি কিট and many more

● মেন ●

❖ প্রচুর তথ্য ↳ সহজে মনে রাখার টেকনিক জোগাড় করো
❖ কতটুকু পড়তে হয় ↳ এটা একটা আর্ট, শেখো

2011 থেকে WBCS / মিসলেনিয়াস etc.-র জন্য আমরা এভাবেই পরিষেবা দিই। ফোন করে দেখতে পারো।

5 টির্চাস গ্রুপ | 9593411432 ■ 8013505753
171A, APC Road, k-y (H.O.) পাশকুড়া। মেমারী

দেউলিয়া বিধি : সমস্যা মোকাবিলার নতুন পথ

ইন্দিভজল ধাসমানা

বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠার অন্যতম শর্ত হল ব্যবসার লক্ষ্যে কোনও পক্ষের বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধির সংস্থান। এক্ষেত্রে যে ফাঁকফোকর ছিল, দেউলিয়া বিধি ২০১৬ তার অনেকটাই মিটিয়ে দিয়েছে। এই আইন লাগু হওয়ার আগে, দেউলিয়া সংস্থার সমস্যা মোকাবিলার প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ দীর্ঘ। ছিল নানা কিসিমের আইন। তাদের আওতা বা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট বিভাজন না থাকায় পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল।

ব্যবসা সহায়ক দেশের তালিকায় অনেকটাই উঠে এল ভারত। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে প্রকাশিত ২০১৮-র এই তালিকায় এদেশের ক্রমিক অবস্থান একলপ্তে ৩০ ধাপ উঠে এখন হয়েছে শততম। এই অগ্রগতির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, দেউলিয়া সংস্থার সমস্যা মোকাবিলায় অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছে এই দেশ। শুধু ওই বিষয়টির নিরিখে বিচার করলে ভারতের স্থান এখন ১০৩ নম্বরে। কিন্তু ২০১৭-র হিসেব অনুযায়ী এই জায়গা ছিল ১৩৬ নম্বরে। কাজেই, অবস্থার যে অনেক উন্নতি হয়েছে, তা বলাই যায়। বিশেষত, আরও আগের বছরগুলিতে এক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল একেবারেই নগণ্য। এই তালিকায় ২০১৫-এ ভারত ছিল ১৩৭-তম স্থানে। ২০১৬-এ উঠেছিল মাত্র এক ধাপ। সরকার, ২০১৬ সালে দেউলিয়া বিধি বা Insolvency and Bankruptcy Code কার্যকর করা এবং এ সংক্রান্ত পর্ষদ বা Insolvency and Bankruptcy Board of India গড়ে তোলার পরে পরিস্থিতির অনেকটা বদল ঘটেছে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ব্যক্তিবিশেষ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলা সংস্থাগুলির দেউলিয়া হয়ে পড়ার সমস্যা দূর করতে এখনও কাগজে-কলমে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি, বা সেসংক্রান্ত নিয়মকানুন এখনও তৈরি হয়নি। ঋণের টাকা মেটাতে অপারগ ব্যক্তি বা সংস্থাকে দেউলিয়া বলা হয়। ঋণ পুনর্গঠনের সাহায্যে অনেক সময় বিপত্তারণ হয়। আর তাতেও কোনও ফল না হলে, দেউলিয়া ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। দেউলিয়া সংস্থার পুনর্গঠন করা হতে পারে তখন। অথবা ওই সংস্থার সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের টাকা শোধ করার রাস্তাতেও হাঁটা হয় অনেক সময়।

বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠার অন্যতম শর্ত হল ব্যবসার লক্ষ্যে কোনও পক্ষের বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধির সংস্থান। এক্ষেত্রে যে ফাঁকফোকর ছিল, দেউলিয়া বিধি ২০১৬ তার অনেকটাই মিটিয়ে দিয়েছে।

এই আইন লাগু হওয়ার আগে, দেউলিয়া সংস্থার সমস্যা মোকাবিলার প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ দীর্ঘ। ছিল নানা কিসিমের আইন। তাদের আওতা বা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট বিভাজন না থাকায় পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল।

ফলে ঋণদাতার টাকা উদ্ধারের পথ ছিল অত্যন্ত কঠিন। চুক্তি আইন বা Contracts Act, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া ঋণের পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত আইন (Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act) আর্থিক সম্পদের পরীক্ষণ ও পুনর্গঠন এবং ঋণ ও প্রাপ্য সুদ সংক্রান্ত নিরাপত্তা আইন (Scrutinization and Reconstruction of Financial

[লেখক 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড' সংবাদপত্রের অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক। ই-মেল : indivjal@gmail.com]

Assets and Enforcement of Security Interest Act)—এরকম ১২-টি আইন বলবৎ ছিল দেউলিয়া বিধি কার্যকর হওয়ার আগে। এতগুলি আইন থেকেও কিন্তু বিশেষ কাজের কাজ হয়নি। রুগ্ন শিল্পসংস্থা (বিশেষ সংস্থান) আইন (Sick Industrial Companies, Special Provisions Act) বা ১৯৫৬-র কোম্পানি আইনের সংস্থানগুলিও বিশেষ কাজের ছিল না।

ব্যক্তিবিশেষের দেউলিয়া হয়ে পড়া সংক্রান্ত আইনগুলি (Presidency Towns Insolvency Act, Provincial Insolvency Act ইত্যাদি) প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো। খাতায়-কলমে তা এখনও রয়ে গেছে। কারণ, এই আইনগুলি বাতিল করে দেওয়ার কথা নতুন বিধির ২৪৩ নম্বর ধারায় বলা হলেও, তার বিজ্ঞপ্তি এখনও জারি হয়নি।

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির দেউলিয়া হয়ে পড়া সংক্রান্ত সমস্যা ও বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে National Company Law Tribunal বা NCLT। ব্যাক্তিবিশেষের দেউলিয়া হয়ে পড়া সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য রয়েছে Debt Recovery Tribunal বা DBT।

নতুন বিধি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির দেউলিয়া হওয়া সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য সময় ভিত্তিক প্রক্রিয়ার কথা বলে। এক লক্ষ টাকার বেশি ঋণখেলাপের ক্ষেত্রে ঋণদাতা NCLT-তে যেতে পারেন।

এই বিধি আগেকার আইনি ব্যবস্থাপত্রের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। এখানে ঋণখেলাপি সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ঋণদাতার ওপর।

আগে ছিল উলটোটা। দেউলিয়া অধমর্ণ বা ঋণগ্রহীতা নিজের অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার পর আইনি প্রক্রিয়া শুরু হ'ত। ঋণদাতা বা উত্তমর্ণকে ঋণ বাবদ দেওয়া টাকা ফিরে পেতে আলাদাভাবে এগোতে হ'ত। ঋণখেলাপি বাণিজ্যিক সংস্থা অবশ্য এখনও দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারে।

NCLT কোনও মামলা হাতে নিলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পুনরুজ্জীবনসংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া ১৮০ দিনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। তা আরও ৯০ দিন বাড়ানো যেতে পারে। জরুরি ভিত্তিতে এগোবার সংস্থানও আছে। সেক্ষেত্রে ৯০ দিনের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। বাড়তি সময় নেওয়া যেতে পারে ৪৫ দিন পর্যন্ত। তবে, ছোটোখাটো বাণিজ্যিক সংস্থা (যে সব বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থার শেয়ার বিক্রি বাবদ পাওয়া মূলধনের অঙ্ক ৫০ লক্ষ টাকা বা তার নিচে এবং বার্ষিক লেনদেন ২ কোটি টাকা পর্যন্ত) এবং Start-up বা নতুন উদ্যোগগুলিই কেবল শেষোক্ত ব্যবস্থাপত্রে সুবিধা পেতে পারে। শেয়ার বাজারে তালিভুক্ত নয় এবং পূর্ববর্তী বছরে মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকার নিচে, এমন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও অবশ্য জরুরি পুনরুজ্জীবনসংক্রান্ত প্রক্রিয়ার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার সময় ঋণগ্রহীতার ব্যবসা ফের চালু করা যায় কিনা, এবং তার পুনর্গঠন সম্ভব কি না, তা বিশদভাবে খতিয়ে দেখা হয়। এই সময়টুকুর মধ্যে ঋণদাতার দাবির ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে দেউলিয়া সংস্থার সম্পত্তি বিক্রির কাজ শুরু হয়।

এই পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকেন দেউলিয়া হয়ে পড়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পেশাদাররা (Insolvency Professionals —IPs)। চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট, কোম্পানি সেক্রেটারি, কস্ট অ্যাকাউনটেন্ট, আইনজীবী অথবা ম্যানেজমেন্ট-এর কাজে অন্তত দশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই কাজ করতে পারেন। তবে তাকে Limited Insolvency পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অন্য পেশার কোনও ব্যক্তিও জাতীয় স্তরের Insolvency বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর Insolvency Professional হতে পারেন।

ভারতের দেউলিয়া এবং সম্পদহীনতা বিষয়ক পর্ষদ বা IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India)-র কাছ থেকে কোনও সংস্থার ঋণ শোধে অপারগতার খবর পাওয়ার পর জাতীয় কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল বা NCLT ১৪ দিনের মধ্যে একজন পেশাদার বিশেষজ্ঞ বা IP-কে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে নিয়োগ করে। তার কার্যকালের মেয়াদ তিরিশ দিন। তিনি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক সংস্থাটির সম্পদ এবং কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন। বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণগ্রহীতা সংস্থাটির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। এর পর ঋণদাতা বা উত্তমর্ণদের একটি সমিতি তৈরি করেন। এতে, ঋণগ্রহীতা সংস্থাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পক্ষ ছাড়া সব ঋণদাতাই থাকেন। বাণিজ্যিক সংস্থাটির কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঋণদাতারা এই সমিতির সদস্য হতে পারেন বটে, কিন্তু ঋণ পরিশোধবাবদ মোট বকেয়া অর্থের অন্তত ১০ শতাংশ তাদের প্রাপ্য হতে হবে এবং সমিতিতে কোনও ভোটাধিকারও তাদের থাকে না।

ঋণদাতাদের সমিতি গঠিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে বৈঠকে বসে। অন্তর্বর্তীকালীন IP-কে পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত কাজে পেশাদার হিসেবে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হবে কি হবে না তা স্থির হয় সদস্যদের ভোটাভুটিতে। তবে হ্যাঁ বা না যে কোনও সিদ্ধান্তের পেছনে অন্তত পাঁচাত্তর শতাংশ সমর্থন থাকতে হবে। এর পর NCLT পাকাপাকিভাবে পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত পেশাদার বা Resolution Professional নিয়োগ করবে।

সংস্থার বিলোপসাধনের ক্ষেত্রে তার সম্পদ কীভাবে ভাগ করা হবে সে বিষয়ে দেউলিয়া বিধিতে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে। প্রদত্ত অর্থের পরিশোধ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত ঋণদাতারা (Secured Creditors) তাদের প্রাপ্য পুরোটাই ফেরৎ পাবেন। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সংস্থার সম্পদের তৎকালীন বাজারমূল্য বিবেচিত হবে না। সংশ্লিষ্ট সংস্থার পণ্য বা পরিষেবা প্রদান বাবদ যাদের বকেয়া প্রাপ্য (Trade Creditors) রয়েছে, তাদের তুলনায় প্রদত্ত অর্থের পরিশোধ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত নন (Unsecured Creditors), এমন ঋণদাতাদের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে Unsecured Creditor-দের বকেয়া মেটানোর পর শোধ করা হবে সরকারের প্রাপ্য অর্থ।

একটা বিষয়ে কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। আবাসন নির্মাতাদের একাংশের কার্যকলাপে

অসুবিধাগ্রস্ত ঘরবাড়ি ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষায় কিছু বলা নেই দেউলিয়া বিধিতে। আন্দোলনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নতুন F ফর্ম বা নিদর্শপত্র পূরণের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট বাড়িঘরের ক্রেতাদের দাবিদাওয়া পেশ করতে দিয়েছে বটে, কিন্তু অগ্রাধিকারের ক্রমতালিকায় তাদের জায়গা হয়নি এখনও। তবে, সময়ের সঙ্গ সঙ্গে নতুন নতুন বিষয়ের সমাধানের সংস্থানও বিধিতে জায়গা পাবে এবং এই বিধি আরও কার্যকর ও দক্ষ হয়ে উঠবে তা আশা করাই যায়।

একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক এখানে। দেউলিয়া বিধির আওতায় প্রথম নিষ্পত্তিটি নিয়েই বেশ আলোড়ন উঠেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন গাড়ি নির্মাতা সংস্থাকে সংকর অ্যালুমিনিয়ামের চাকা সরবরাহকারী সংস্থা Synergies Doorary Automotive-এর অধিগ্রহণের সময় Synergies Castings সংস্থাকে পূর্বোক্ত সংস্থার মোট ৯০০ কোটি টাকা ঋণের মাত্র ৫৪ কোটি টাকা মেটাতে বলে NCLT। শুধু তাই নয়, এই টাকাও শোধ করতেও খুবই সুবিধাজনক শর্ত দেওয়া হয়েছিল। ৫৪ কোটি টাকার মধ্যে ২০ কোটি টাকা মেটাতে বলা হয়েছিল তাৎক্ষণিকভাবে। বাকিটা ৫ বছর ধরে কিস্তিতে মেটানোর কথা বলে NCLT। মোট ৯০০ কোটি টাকা ঋণের আসলের পরিমাণ ছিল ২১৫ কোটি টাকা। বাকি ৬৮৫ কোটি টাকা বকেয়া ছিল সুদ, বিধিবদ্ধখাতে প্রদেয় ইত্যাদি বাবদ। শিল্প ও অর্থসংক্রান্ত পুনর্গঠন পর্ষদ BIFR (Board of Industrial and Financial Restructuring)-এ জমে থাকা ৯৩ হাজার মামলার মধ্যে একটি ছিল এই Synergies Dooray মামলা। BIFR থেকে NCLT-তে হস্তান্তরিত প্রথম দিকের মামলাগুলির মধ্যে ছিল এটি।

এবছরের মে মাসে সরকারের জারি করা একটি অধ্যাদেশ (পরে যার জায়গা নিয়েছে ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী আইন বা The Banking Regulation Amendment Act, 2017) এদেশে ঋণখেলাপ ও সংস্থার দেউলিয়া হয়ে পড়া সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা প্রক্রিয়ায় গতি এনেছে। এই আইনে প্রাপ্য অর্থ ফেরাতে ঋণদাতাদের নির্দেশ

ভারতের সেরা দশ বেসরকারি ব্যাঙ্ক

দেওয়ার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা মারাত্মক বেড়ে গেছে। যেসব ক্ষেত্রে বকেয়ার পরিমাণ বেশি, সেগুলি হল বিদ্যুৎ, ইস্পাত, সড়ক পরিকাঠামো এবং বয়ন।

মে মাসের অধ্যাদেশের পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সবচেয়ে বেশি বকেয়া রয়েছে এমন ১২-টি ঋণ খাতকের বিষয়ে দেউলিয়া বিধির আওতায় সমাধানের সুপারিশ করেছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ উপদেষ্টা কমিটি বা IAC-র সুপারিশ অনুযায়ী।

এই সব ঋণ খাতকের বিষয়ে সমাধানের সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

এই ১২-টি ঋণ খাতক বা অ্যাকাউন্ট হল— ভূষণ স্টিল, ল্যানকো ইনফ্রা, এসার স্টিল, ভূষণ পাওয়ার, অলক ইন্ডাস্ট্রিজ, অ্যামটেক অটো, মনেট ইস্পাত, ইলেকট্রোস্টিল স্টিলস, এরা ইনফ্রা, জেইপে ইনফ্রাটেক, এবিজি শিপইয়ার্ড এবং জ্যোতি স্ট্রাকচারস। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে জমা হওয়া অনুৎপাদক সম্পদের ২৫ শতাংশের জন্য দায়ি ওই ১২-টি ঋণ খাতক। এবছর মার্চে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে এই ১২-টি অ্যাকাউন্টের অবদান ১ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা।

আর্থিক পরিষেবা সংস্থা মোতিলাল অসওয়াল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে NCLT-তে ঋণখেলাপ সংক্রান্ত ৩৭৬-টি মামলা পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ (১৮৭-টি) মামলায় আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক সংস্থার কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ঋণদাতারা। ১২২-টি মামলায় আবেদন করেছেন সংস্থার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নন (Financial Creditors) এমন ঋণদাতারা। বাকি মামলাগুলি দায়ের হয়েছে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রস্ত বাণিজ্যিক সংস্থার তরফে।

এই মামলাগুলির নিষ্পত্তি হলে বাণিজ্যিক ঋণদান সংস্থাগুলি উৎসাহ পাবে অবশ্যই। কিন্তু প্রাথমিকভাবে কাজ চলছে বেশ ধীরগতিতে। দু'টি মাত্র ঋণ খাতকের ক্ষেত্রে সমাধানে পৌঁছনো গেছে। সে দু'টি ক্ষেত্রেও আবার বকেয়া ঋণের মোট পরিমাণের তুলনায় অনেক কম অংশই ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে (haircut)। সাতটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৪-টি ক্ষেত্রে নতুন করে ওঠা আরও নানা রকম অভিযোগের শুনানি চলছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশে NCLT-তে যে ১২-টি মামলা গেছে সেখানেও 'হেয়ারকাট'-এর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।

আর একটি বড়ো সমস্যা হল এই যে, বহু ক্ষেত্রে ঋণখেলাপি উদ্যোগপতিরা নিজেরাই দেউলিয়া মামলা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নিজেদের সংস্থাকে ফের ঘুরপথে এবং কম দামে কিনে নেওয়া চেষ্টা করেন। এই চক্র ঠেকাতে নতুন বিধিতে কড়া সংস্থান রাখা হয়েছে।

ঋণদাতাদের আস্থা বাড়াতে অত্যন্ত জরুরি ছিল।

এখন, সাধারণভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপে সামিল অসাধু উদ্যোগপতিদের পক্ষে ঘুরপথে নিজেদের ঋণগ্রস্ত সংস্থার মালিকানা পাওয়া কঠিন। কারণ, এক্ষেত্রে ঋণদাতাদের সমিতি নজর রাখবে। অন্য অসাধু উদ্যোগপতিদের হাতেও যাতে ঋণগ্রস্ত সংস্থা না গিয়ে পড়ে, সেজন্যও বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান সংস্থান অনুযায়ী, ঋণগ্রস্ত সংস্থার পরবর্তী মালিকের বিষয়ে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া সমাধান প্রক্রিয়ার দায়ভারপ্রাপ্ত পেশাদারের অবশ্য কর্তব্য। নতুন আবেদনকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা, সীমাবদ্ধতা ভালো করে বিবেচনা করতে হবে এখন। তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ আছে কি না, তার ঋণখেলাপের ইতিহাস আছে কি না, Securities and Exchange Board of India বা সেবি তার ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কি না—সব বিষয়গুলিই এখানে বিবেচ্য।

তবে, বিষয়টি নিয়ে এখনও কিছুটা ধোঁয়াশা যে রয়েছে তা স্বীকার করতেই হয়। তা দূর করতে দেউলিয়া বিধিতে কিছু পরিবর্তন এনে সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে। NCLT-তে যাওয়া মামলায় ঋণগ্রস্ত সংস্থার ঘনিষ্ঠ সহযোগী, এমন কোনও সংস্থা যাতে কলকাঠি না নাড়তে পারে সেজন্যই এই অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশে দেউলিয়া বিধিতে ২৯-এ ধারাটি জুড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অধ্যাদেশটিতে যা বলা হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থে ধরলে এক বছরের বেশি সময় ধরে অনুৎপাদক সম্পদবহনকারী সংস্থার মালিক বা সেই সংস্থার সহযোগী কোনও সংস্থার পক্ষে ঘুরপথে পূর্বোক্ত সংস্থার মালিকানার জন্য আবেদন জানানো নিষিদ্ধ। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা দরকার। এক বছর শেষ হওয়ার ঠিক আগে সব দেনা মিটিয়ে তারা কিন্তু ফের মালিকানার আবেদন জানাতে পারেন।

তবে NCLT-তে মামলা উঠে গেলে আর তা করা যাবে না। অর্থাৎ, RBI-এর নির্দেশ মতো যে ১২-টি ঋণগ্রস্ত সংস্থার মামলা NCLT-তে গেছে, তাদের মালিকপক্ষ বা সহযোগী সংস্থার পক্ষে কোনওভাবেই আর সংস্থার মালিকানা ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়।

তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট সংস্থার হয়ে নিশ্চয়তা প্রদানকারীরাও (Guarantors) মালিকানার দৌড়ে থাকতে পারবেন না। আলোচ্য সংস্থার হোল্ডিং কোম্পানি অথবা তার মালিকপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনও পক্ষের (related party of promoters) ক্ষেত্রেও এই নিষেধাজ্ঞা খাটে।

এখানে 'Related Party of Promoters'-এর সংজ্ঞা নিয়ে একটু আলোচনার দরকার। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

ঋণ পরিশোধে অপারগ Uttam Galva-র সম্পত্তি কিনতে চায় ArcelorMittal। Uttam Galva-এ ২৯ শতাংশ শেয়ার ArcelorMittal-এর। Uttam Galva-র নির্দেশকমণ্ডলীতে ArcelorMittal-এর কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। এই সব তথ্য দাখিল করেছে ArcelorMittal।

মজার কথা হল, বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের খাতায় Migiani গোষ্ঠীর সঙ্গে ArcelorMittal-কেও Uttam Galva-র প্রোমোটার হিসেবে নথিবদ্ধ করা রয়েছে।

দেউলিয়া বিধি অনুযায়ী, কোনও পক্ষের কোনও ঋণগ্রস্ত সংস্থায় ২০ শতাংশের বেশি ভোটাধিকার থাকলে 'সেই পক্ষ' সংস্থাটির 'Related Party' বলে বিবেচিত হওয়ার কথা এবং পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে কোনও পক্ষের ২ শতাংশ শেয়ার থাকলেই কোম্পানিটির 'ডিরেক্টর' হিসেবে তারা গণ্য হবে।

সেবি বা Securities and Exchange Board of India Act অনুযায়ী, কোনও বাণিজ্যিক সংস্থায় কোনও পক্ষের ১০ শতাংশ শেয়ার থাকলে এবং সংস্থাটির কাজকর্মে নিয়ন্ত্রণ থাকলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির 'প্রোমোটার'।

কাজেই, কোনও ঋণগ্রস্ত সংস্থার মালিকানার আবেদনকারী হিসেবে কোনও পক্ষ যোগ্য বা অযোগ্য কি না, তা সঠিকভাবে স্থির করতে 'Related Party of Promoters'-এর সংজ্ঞা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

দেউলিয়া বিধির আওতায় সমাধান প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য যে ১২-টি বাণিজ্যিক সংস্থাকে NCLT-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ৫-টি ইস্পাত প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং Amtek Auto কেনার প্রস্তাব এসেছে।

এই ১২-টি সংস্থা ছাড়া, আরও ২৯-টি বাণিজ্যিক সংস্থার ঋণখেলাপের সমস্যা মোকাবিলার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে দিয়েছে RBI। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সব কিছু নিষ্পত্তির জন্য প্রাথমিকভাবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। সমাধানসূত্র না মিললে এই মামলাগুলিও NCLT-তে পাঠানো হবে।

এখানে সাযুজ্যের প্রশ্নটি ওঠে। ২৯-টি সংস্থার ঋণখেলাপের সমস্যা ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মেটাবার সুযোগ দেওয়া হল। কিন্তু আগে উল্লিখিত ১২-টি সংস্থার ক্ষেত্রে তা দেওয়া হল না কেন?

ঋণখেলাপের বিভিন্ন মামলায় এরকম পরস্পরবিরোধী নির্দেশ-এর নজির আগামী দিনে হয়তো আরও মিলবে। কিন্তু এটা ঠিকই যে, গোটা প্রক্রিয়াটিকে সরল করা প্রয়োজন। নিশ্চিত করতে হবে, অবস্থা অনুযায়ী ঋণগ্রস্ত সংস্থাগুলি যেন নিজেদের পুনর্গঠন অথবা ঝাঁপ বন্ধ করার সিদ্ধান্তের যে কোনও একটি বেছে নিয়ে তা কার্যকর করার পথে সহজে এগোতে পারে। এক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হবে। দেশকে আরও বাণিজ্যসহায়ক করে তুলতে তা নিতান্ত জরুরি।

Synergies Dooray মামলায় পৌঁছনো সমাধান পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ করে NCLT ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয়েছে Edelweiss ARC। বিতর্কের একটি ইস্যু হল Synergies Castings হল Synergies Dooray-র 'Related Party of Promoters'। এই বিষয়টিতে অবশ্য উল্লিখিত অধ্যাদেশ মোতাবেক নিষ্পত্তি সম্ভব। বড়ো অভিযোগটি হল Synergies Dooray এবং Synergies Castings-এর মধ্যে হওয়া অস্বচ্ছ আদানপ্রদান। এই নিয়েই শুনানি চলছে।❑

ভারতমালা : মহাসড়ক উন্নয়নে নবদিগন্তের সূচনা

যুদ্ধবীর সিং মালিক

ভারতমালায় প্রথম দফার কর্মকাণ্ডের আওতায় সব মিলিয়ে প্রায় ২৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর বকেয়া থেকে যাওয়া ১০ হাজার কিলোমিটারের কাজও ভারতমালার প্রথম দফায় সারা হবে। পাঁচ বছরে প্রথম দফার কাজ শেষ করতে আনুমানিক ব্যয় ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা বলে ধরা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে পরিবহণ ক্ষেত্রের বাড়তি চাহিদা ও চলতি ব্যবস্থায় নানা খামতির দরুন ভারতে জাতীয় মহাসড়ক ক্ষেত্রটি এখনও সমস্যাসঙ্কুল পরিকাঠামোর তকমা ছেড়ে উঠতে পারেনি। তবে সেসব দিনকে পেছনে ফেলে দেশে এই মহাসড়ক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেই এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে ভারতমালার হাত ধরে।

গত ২৪ অক্টোবর, ২০১৭-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটির বৈঠকে ভারতমালা পরিযোজনার প্রথম পর্যায়ের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। দেশে মহাসড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক সার্বিক কর্মসূচির পোশাকি নাম, ভারতমালা। সময়ের সাথে সাথে পরিবহণ ক্ষেত্রের বাড়তি চাহিদা ও চলতি ব্যবস্থায় নানা খামতির দরুন ভারতে জাতীয় মহাসড়ক ক্ষেত্রটি এখনও সমস্যাসঙ্কুল পরিকাঠামোর তকমা ছেড়ে উঠতে পারেনি। তবে সেসব দিনকে পেছনে ফেলে দেশে এই মহাসড়ক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেই এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে ভারতমালার হাত ধরে।

১৯৯৮ সালে তৎকালীন NDA সরকার National Highways Development Project (NHDP) বা 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করে। দেশে মহাসড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি ছিল প্রথম ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম বা অগ্রণী কর্মসূচি। সেই প্রকল্পের রূপায়ণপর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই ভারতমালার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। গোটা দেশজুড়ে National Highways (NH) বা জাতীয় মহাসড়কগুলির উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ভারতমালার সূচনা। ভারতমালা পরিযোজনায় মহাসড়কগুলির বিস্তার ও মানোন্নয়নের পরিকল্পনা রূপরেখা তৈরি ও তার বাস্তবায়নের সময় 'করিডোর' বা নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নির্মাণের ধারণাকে ভিত্তি করা হয়েছে। ভারতমালার মূল লক্ষ্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র মহাসড়ক মারফৎ পণ্য পরিবহণ ও যাত্রী চলাচল ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও গতি সঞ্চার।

ভারতমালা পরিকল্পনার অভিমুখ

মালপত্র পরিবহণের সময় তা যেখান থেকে ট্রাক ইত্যাদিতে চড়ানো হচ্ছে এবং যেখানে সেই মাল খালাস করা হচ্ছে, ভিড়ভাট্টাপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকায় সেই Origin-Destination (O-D) বা 'উৎস-গন্তব্য'-এর মধ্যে পণ্য চলাচলের ওপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশদ সমীক্ষা চালানো হয়। অর্থনৈতিক অঞ্চলের পণ্য পরিবহণ কাঠামোকে যাতে চূড়ান্ত দক্ষ করে তোলা যায়, সেই অনুযায়ী নতুন অর্থনৈতিক করিডোর চিহ্নিত করে সড়ক উন্নয়নের রূপরেখা তৈরির সময় সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে এগোনো যায়। ফলস্বরূপ, অর্থনীতির ওপর জবরদস্ত ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর আওতায় চালু প্রকল্পগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক করিডোরের সমন্বয়ের ব্যাপারটিও এই সমীক্ষায় বিবেচ্য ছিল। সমীক্ষাটি থেকে এই তথ্যও উঠে এসেছে যে দেশের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক করিডোরের মধ্যে পরিকাঠামোগত সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। যেমন, ধরা যাক মুম্বাই-কলকাতা করিডোর। এই করিডোরের একটি বড়ো অংশ (যা কি না

[লেখক কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিষয়ক সচিব। ই-মেল : secy-road@nic.in]

ওড়িশার মধ্যে পড়ে) মাত্র দুই-লেনবিশিষ্ট, এবং তার উপর আবার সেই অংশে যাত্রাপথে বার বার লেন পরিবর্তন করতে হয়। গোটা রাস্তাটা আগাগোড়া অন্তত চার-লেনের না করলে যান চলাচলের সমস্যা থেকেই যাবে। এর জেরে পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়ে এবং আখেরে ইস্পাত ও বিদ্যুতের দামে তার প্রভাব পড়ে। এই জন্যই গোটা দেশজুড়ে করিডোরগুলির ক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্য দূর করা আশু জরুরি।

নতুন করিডোর ও ফিডার রুট গড়ে তোলার পাশাপাশি লেন সম্প্রসারণ তথা রিং-রোড (চক্রাকার রাস্তা), বাই-পাস, প্রভৃতি এবং চিহ্নিত জায়গায় Multimodal Logistics Parks নির্মাণ করে 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর আওতাভুক্ত চালু জাতীয় করিডোরগুলি যানজট মুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে করে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা আরও মসৃণভাবে ও সাবলীল গতিতে সম্ভবপর হয়।

ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বা Export-Import (EXIM) trade-এর উন্নতির জন্য সীমান্ত ও উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে পরিকাঠামোর উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি রণকৌশলগত গুরুত্বের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের জন্য সীমান্তবর্তী সড়কগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতমালা প্রকল্পের আওতাভুক্ত, উপকূলবর্তী অঞ্চলে সড়ক ও বন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটাতে জাহাজ মন্ত্রকের সাগরমালা প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সড়ক উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন করিডোর নির্মাণের পন্থা যে অনেক বেশি সুফলদায়ী তা অনুধাবন করেই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক 'ভারতমালা পরিযোজনা'-র রূপরেখা প্রস্তুত করেছে।

ভারতমালা পরিকল্পনা মূল ছয় বৈশিষ্ট্য

● **অর্থনৈতিক করিডোর উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক গুরুত্বের নিরিখে যেসব মহাসড়ক

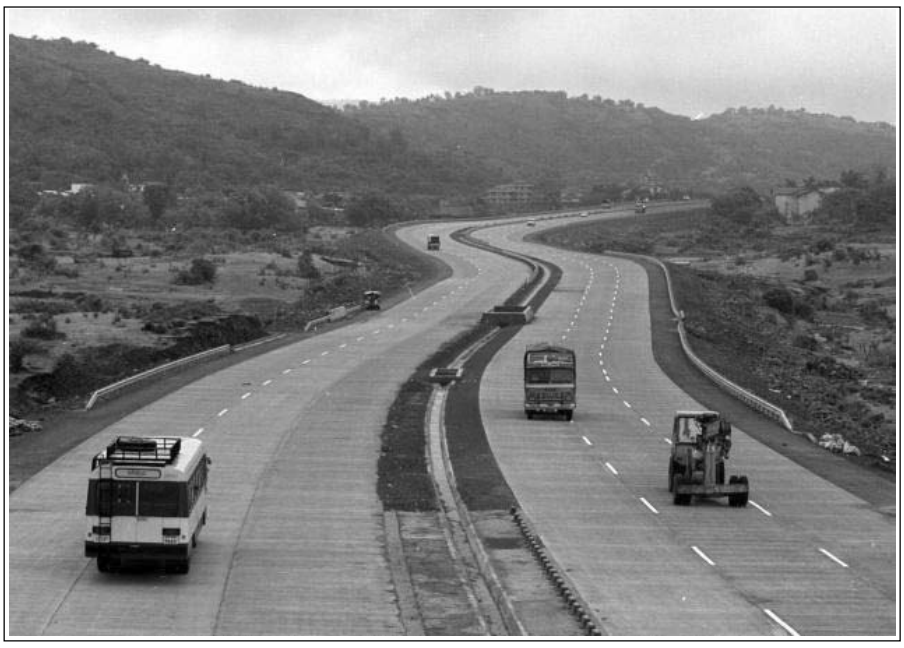

করিডোরগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, আগামী বছরগুলিতে সেগুলির মাধ্যমে আনুমানিক ২৫ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করা হবে। গোটা নির্মাণপর্ব শেষ হওয়ার পর আন্তঃকরিডোর ও ফিডার রুট-সহ জাতীয় ও অর্থনৈতিক করিডোরগুলির মাধ্যমে দেশের ৮০ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক করিডোর গড়ার জন্য প্রায় ২৬ হাজার ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯ হাজার কিলোমিটার প্রথম দফার অন্তর্ভুক্ত।

● **আন্তঃকরিডোর ও ফিডার রুট :** এই প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত ৮ হাজার কিলোমিটার আন্তঃকরিডোর ও প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কিলোমিটার ফিডার রুটের মধ্যে ৬ হাজার কিলোমিটার প্রথম দফার আওতাভুক্ত।

● **জাতীয় করিডোরের মানোন্নয়ন ও যানজট মুক্তি :** বর্তমানে 'সোনালি চতুর্ভুজ' বা Golden Quadrilateral (GQ) এবং 'উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম' বা North-South-East-West (NSEW) করিডোরগুলির মাধ্যমে দেশের মোট ৩৫ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করা হয়। এ দু'টিকে জাতীয় করিডোরে উন্নীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ছ'টি জাতীয় করিডোরে যাত্রীবাহী যানবাহনের সংখ্যা বা Passenger Car Unit (PCU) ৩০ হাজারেরও কম। প্রয়োজন বুঝে এই করিডোরগুলিকে ৬/৮ লেনে সম্প্রসারিত

করা হবে। সময়ের সাথে সাথে জাতীয় সড়কগুলিতে ভিড়ভাট্টা বেড়েছে এবং কিছু জায়গাকে ঘিরে প্রতিনিয়ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সাবলীল গতিতে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জাতীয় সড়কগুলিকে যানজট মুক্ত করতে লেন সম্প্রসারণের পাশাপাশি রিং-রোড (চক্রাকার রাস্তা), বাই-পাস ও এলিভেটেড করিডোর গড়ে তোলা জরুরি। এছাড়াও, পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সাবলীল গতি সুনিশ্চিত করতে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় Logistics Park গড়ে তোলার কথাও ভাবা হয়েছে। এই শ্রেণিভুক্ত ৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ প্রথম দফার আওতায় পড়ছে।

● **সীমান্তবর্তী ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সড়ক :** রণকৌশলগত গুরুত্বের নিরিখে আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার প্রায় ৩ হাজার ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা এই প্রকল্পের আওতায় মানোন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বা Export-Import (EXIM) Trade-এর স্বার্থে সীমান্ত ও উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো অত্যাবশ্যক শর্ত। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মতো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে ভারতের প্রধান প্রধান মহাসড়ক করিডোরগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিকে জুড়তে হবে; সেজন্য ২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এধরনের ২ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক উন্নয়নের কাজ প্রথম দফায় সারা হবে।

● **উপকূলবর্তী ও বন্দর যোগাযোগের সড়ক :** ভারতের উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে ২ হাজার ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পর্যটন ও শিল্পোন্নয়নে গতি সঞ্চার হবে বলে আশা করা যায়। ছোটো বন্দরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ওপর জোর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটাতে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের সাগরমালা প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করেই এইসব রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এধরনের ২ হাজার কিলোমিটার লম্বা রাস্তার কাজ প্রথম দফায় সারা হবে।

● **নতুন এক্সপ্রেসওয়ে :** জাতীয় ও অর্থনৈতিক করিডোরের নির্দিষ্ট কিছু কিছু অংশে চলাচলকারী যাত্রীবাহী যানবাহনের সংখ্যা (PCU) ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ফলত, সেখানে একাধিক স্থান যানজটের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এধরনের রাস্তায় প্রায় ১ হাজার ৯০০ কিলোমিটার লম্বা অংশ greenfield expressway বা নতুন এক্সপ্রেসওয়ে বানানোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ প্রথম দফার আওতাভুক্ত।

সারণি-১
ভারতমালার প্রথম দফার কর্মকাণ্ডের খতিয়ান ও আনুমানিক ব্যয়

কর্মকাণ্ড	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	আনুমানিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
অর্থনৈতিক করিডোর উন্নয়ন	৯,০০০	১,২০,০০০
আন্তঃকরিডোর ও ফিডার করিডোর	৬,০০০	৮০,০০০
জাতীয় করিডোরের উন্নয়ন ও যানজটমুক্তি	৫,০০০	১,০০,০০০
সীমান্তবর্তী ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সড়ক	২,০০০	২৫,০০০
উপকূলবর্তী ও বন্দর যোগাযোগের সড়ক	২,০০০	২০,০০০
এক্সপ্রেসওয়ে	৮০০	৪০,০০০
মোট	**২৪,৮০০**	**৩,৮৫,০০০**
'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর বকেয়া	**১০,০০০**	**১,৫০,০০০**
সর্বমোট	**৩৪,৮০০**	**৫,৩৫,০০০**

প্রথম দফার কাজের খতিয়ান ও আনুমানিক ব্যয়

ভারতমালায় প্রথম দফার কর্মকাণ্ডের আওতায় সব মিলিয়ে প্রায় ২৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর বকেয়া থেকে যাওয়া ১০ হাজার কিলোমিটারের কাজও ভারতমালার প্রথম দফায় সারা হবে। পাঁচ বছরে প্রথম দফার কাজ শেষ করতে আনুমানিক ব্যয় ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা বলে ধরা হয়েছে। আনুমানিক ব্যয়ের হিসেবনিকেশ-সহ প্রথম দফার কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান সারণি-১-এ পেশ করা হল।

উল্লিখিত ২৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বেশ নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ বা অন্যান্য কোনও কারণে যদি কোনও অঞ্চলে কাজ থমকে যায় তবে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের মন্ত্রীকে সেই সড়কপথের সর্বাধিক ১৫ শতাংশ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তে অন্য কোনও যথোপযুক্ত প্রকল্প হাতে নেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদন

জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন তথা অনুমোদন করার কার্যকরী বন্দোবস্ত এই পরিকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ফলে চিহ্নিত প্রকল্পগুলির সুষ্ঠুভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদন করার ক্ষমতা জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ বা National Highways Authority of India (NHAI)-র ওপর ন্যস্ত। প্রকল্প মূল্যায়ন-অনুমোদন প্রক্রিয়ার মান নিয়ে যাতে কোনও রকম আপোশ না করা হয়, সেদিকেও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক মিলে Project Appraisal & Technical Scrutiny Committee গঠন করবে। নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞরাও সেই কমিটিতে থাকবেন। প্রত্যেকটি প্রকল্পের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিক খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। বরাত দেওয়ার প্রক্রিয়ার দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি ইতোমধ্যে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের বোর্ডে নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বা CEO-কে আংশিক সময়ের সদস্য হিসেবে শামিল করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের ভূমিকা

'বিশাল চ্যালেঞ্জ প্রক্রিয়া' বা Grand Challenge Mechanism-এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারগুলিকে এই উন্নয়ন মহাযজ্ঞে অংশ নিতে উৎসাহ দেওয়া এই পরিকল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, বিশেষত প্রকল্পের জন্য দ্রুত জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে।

এর প্রতিদান হিসেবে প্রকল্প রূপায়ণের সময়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দ্বারা চিহ্নিত সড়কপথকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বৃদ্ধি

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে আরও মসৃণ তথা সুচারু করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে ঢেলে সাজানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। "Organization & Process Transformation of MoRTH and its implementation agencies" শীর্ষক প্রতিবেদনের কয়েকটি সুপারিশের ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্কার, প্রকল্পের বিস্তারিত প্রতিবেদন বা Detailed Project Report (DPR)-এর মানোন্নয়নের জন্য সংস্কার, অনলাইনে প্রকল্পের ওপর নজরদারি চালাতে Project Monitoring Information System (PMIS) উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন, ইত্যাদি এইসব পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম।

ভারতমালার প্রভাব

● করিডোরভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা দেশে সড়ক পরিবহণে উন্নতিসাধন। ৮০ শতাংশ পণ্য পরিবহণ হবে এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। দেশে যান চলাচলের গতি গড়ে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বাড়বে।

● আন্তঃকরিডোর ও ফিডার রুট-সহ অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণের ফলে সড়ক পরিকাঠামোর বিকাশ ঘটবে; বাইপাস, রিং-রোড নির্মাণ করে যানজট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট করিডোরভিত্তিক শুল্ক আরোপ ও এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মহাসড়কে যান চলাচলের গড় গতি বাড়ানো সম্ভব হবে। পণ্যবাহী যানবাহনের গড় গতি বৃদ্ধির ফলে তিনটি লাভ হবে। প্রথমত, টন পিছু প্রত্যেক কিলোমিটারে মালপত্র পরিবহণের খরচ কমবে (কারণ, পণ্যবাহী গাড়িটি আরও বেশি করে খাটানোর জন্য বাড়তি সময় পাওয়া যাবে); দ্বিতীয়ত, জ্বালানি সাশ্রয় হবে বলে পণ্য পরিবহণ খরচ কমবে; তৃতীয়ত, দ্রুতগামী ও নির্ভরযোগ্য পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই সড়ক ব্যবস্থা গড়ে উঠলে সরবরাহ শৃঙ্খলে সামগ্রিকভাবে খরচ কমবে। এর জেরে দেশের Logistic Performance Index (LPI)-এর ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

● ভারতমালা গোটা দেশে ৫৫০ জেলাকে জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে জুড়বে। বর্তমানে প্রায় ৩০০-টি জেলার সেই কৌলীন্য আছে।

● সড়ক নির্মাণকার্য, সড়ক সংলগ্ন এলাকায় সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি ও পরিষেবা প্রদানের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিনিয়োগের জন্য সুযোগ সৃষ্টি।

● ভারতমালার প্রথম দফায় ২৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ নির্মাণপর্বে ৩৪ কোটি কর্ম-দিবস (man-days) সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং পরবর্তীকালে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির দরুন আনুমানিক ২ কোটি ২০ লক্ষ স্থায়ী চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।❑

বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত ব্যাঙ্ক

যেকোনও দেশের অর্থ ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল সেদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশান)। কারণ, দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদে অর্থলগ্নি হয় এসব প্রতিষ্ঠানের দৌলতে। বিশেষ করে গ্রামীণ, আবাসন, ক্ষুদ্র শিল্প, আমদানি-রপ্তানির মতো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ক্রমবর্ধিত চাহিদা মেটাতে ভারতে এধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণের জোগানে এসব প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতে এমন বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত চারটি প্রধান 'স্পেশালাইজড্' ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতের আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক বা Export-Import Bank of India (EXIM Bank), জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক বা National Housing Bank (NHB) এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা Small Industries Development Bank of India (SIDBI)।

ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক

ভারতে 'বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি'-র মধ্যে একেবারে শীর্ষ স্তরে রয়েছে রপ্তানি-আমদানি ব্যাঙ্ক বা এক্সিম ব্যাঙ্ক। আন্তর্জাতিক স্তরের রপ্তানি ঋণদাতা সংস্থা বা Export Credit Agencies (ECAs)-এর আদলে, ১৯৮১ সালের ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক আইনের আওতায় এই সংস্থা গঠিত হয়। এক্সিম ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে ১৯৮২ সালে। বহু ধরনের সামগ্রী ও পরিষেবার মাধ্যমে এক্সিম ব্যাঙ্ক শিল্পক্ষেত্রে তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থার জন্য চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে পড়ে, প্রযুক্তি আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের বিকাশ, উৎপাদন রপ্তানি, বিপণন রপ্তানি, মালপত্র পাঠানোর আগে ও

পরে তথা বিদেশে বিনিয়োগ। ভারতীয় আর্থিক বাজারের সার্বিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে, আমদানিকারী তথা রপ্তানিকারীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে এক্সিম ব্যাঙ্ক। আধুনিকীকরণ, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, অধিগ্রহণ প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়। এক্সিম ব্যাঙ্ক রপ্তানিকারকদের মাল গুদামজাত করার খরচ বাবদ অর্থ জোগায়, রপ্তানি ব্যবসার বিভিন্ন খাতে অর্থলগ্নি করে রপ্তানি ব্যবসায়ীদের ঋণের সুযোগ করে দেয়। ব্যাঙ্কের funded capital scheme বা পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখবিহীন মূলধনী ঋণ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি চলতি পুঁজি (working capital) জোগানো, নগদের জোগান মেটাতে অর্থলগ্নি ইত্যাদি। এর পাশাপাশি মূলধনী ঋণ ব্যতীত পরিষেবার অঙ্গ হিসেবে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট সংস্থার জন্য হুন্ডি সীমা (letter of credit limits), জামানতের সীমা (guarantee limits) সংক্রান্ত দস্তাবেজ বা শংসাপত্রের ব্যবস্থা করে। ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এক্সিম ব্যাঙ্ক। ছবি প্রযোজনা থেকে শুরু করে বিদেশের বাজারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্য নগদ পুঁজির ব্যবস্থা করে ব্যাঙ্কটি। এক্সিম ব্যাঙ্ক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও পরিকল্পনা, অভ্যন্তরীণ অডিটের মতো বিশেষ ধরনের পরিষেবা প্রদানেও নিয়োজিত। এক্সিম ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় মুম্বইয়ে অবস্থিত। তবে ভারতের সর্বত্র তথা বিদেশেও এই ব্যাঙ্কের শাখা ছড়িয়ে আছে।

জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক

গ্রামীণ অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থার গুরুত্ব পরিকল্পনা একদম সূচনাপর্ব থেকেই ভারত সরকারের কাছে স্পষ্ট ছিল। কাজেই, কেন্দ্রীয় সরকারের মতানুযায়ী ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালের ৩০ মার্চ এক কমিটি গঠন করে, যার পোশাকি নাম Committee to Review the Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development

(CRAFICARD)। কমিটির রিপোর্টে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণপ্রদানকারী পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়, যে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য হবে গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলিতে ঋণ সংক্রান্ত ইস্যুগুলির উপর নজর দিয়ে গ্রামোন্নয়নের

দিশায় জোরকদমে এগিয়ে যাওয়া। তাদের এই সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯৮১ সালে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা নাবার্ড (NABARD) প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবে সংসদ অনুমোদন দেয়। নাবার্ড-এর পথ চলা শুরু হয় ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ সংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং তৎকালীন Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC)-এর কর্মকাণ্ড সবটাই নাবার্ডের এক্তিয়ারে নিয়ে আসা হয়। একশো কোটি টাকার মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে নাবার্ড। ২০১৬ সালের ৩১ মার্চের পরিসংখ্যান অনুযায়ী নাবার্ডের আদায়ীকৃত মূলধন পাঁচ হাজার কোটি টাকা। ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে শেয়ার মূলধনের অংশীদারিত্বে অদলবদল হওয়ার পর বর্তমানে কেন্দ্রের হাতে রয়েছে নাবার্ডের ৯৯.৬০ শতাংশ শেয়ার (যার মূল্য ৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা) আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বাকি ০.৪ শতাংশ (যার মূল্য ২০ কোটি টাকা)।

জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক

জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৮৭-এর নীতিনির্দেশিকা অনুসারে ১৯৮৮ সালে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক বা National Housing Bank (NHB) প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য, আবাসন ক্ষেত্রে ঋণদানকারী সংস্থাগুলিকে আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে তাদের বাড়বৃদ্ধিতে গতি আনা। আবাসন ক্ষেত্রে চালু অর্থলগ্নি কোম্পানিগুলির গোটা পরিকাঠামো সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে এই খাতে নতুন করে অর্থলগ্নির মতো পদক্ষেপও নিচ্ছে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক। বিকাশ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প খাতে অর্থলগ্নি, চালু কর্মকাণ্ডে নতুন করে অর্থলগ্নি, সম্পদ সংহতিকরণ ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিশেষ ধরনের পরিষেবা নিয়ে আলাদা আলাদা বিভাগ স্থাপন করেছে NHB। জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক পুরোপুরি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

মালিকানাধীন। কারণ এর মূলধনের পুরোটাই জোগান দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্কের উপর সাধারণ নজরদারি, যাবতীয় কাজকর্ম ও ব্যবসা সংক্রান্ত দিশা নির্দেশ এবং ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত এক নির্দেশকমণ্ডলী বা 'বোর্ড অব ডায়রেক্টার্স'-এর উপর।

ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

১৯৯০ সালের ২ এপ্রিল ভারতীয় সংসদের এক আইনবলে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা Small Industries Development Bank of India (SIDBI) গঠন করা হয়। অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের প্রসার, অর্থলগ্নি ও উন্নয়নের জন্য মুখ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই ব্যাঙ্ক গড়া হয়। পাশাপাশি এধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধনও এই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। সিডবি-র ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পরিধি অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রজুড়ে বিস্তৃত। উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানির নিরিখে জাতীয় অর্থনীতিতে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ৫.১ কোটি শিল্পোদ্যোগ, ১১.৭ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান; ছয় হাজারেরও বেশি ধরনের পণ্য-সহ ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে মোট উৎপাদিত পণ্যের ৪৫ শতাংশের উৎপাদন করে তথা মোট রপ্তানিতে মূল্যের হিসাবে ৪০ শতাংশ অংশভাক ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে প্রায় ৩৭ শতাংশ অবদান রেখে MSME ক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তথা তার বৃদ্ধিতে বিপুল অবদান রেখে চলেছে। আর সিডবি এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রটিরই বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের পরিবেশে আর্থিক ও অন্যান্য দিকের নিরিখে নানা দুর্বলতা বা ফাঁকফোকর আছে। ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক কৌশল, এই সব সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলির সমাধানসূত্র খোঁজা। MSME ক্ষেত্রকে সিডবি দু'ভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। (ক) অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে যেসব ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয়, তাদেরকে পুঁজি জোগানো অর্থাৎ পরোক্ষভাবে; (খ) ঝুঁকিপূর্ণ মূলধন, দীর্ঘমেয়াদি অর্থলগ্নি, পরিষেবা ক্ষেত্রে অর্থলগ্নি, ইত্যাদির মতো কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে। অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও

মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের প্রসার ও উন্নতিকল্পে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ শুধুমাত্র ঋণদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পাশাপাশি শিল্পোদ্যোগ বিকাশে সহয়তা জোগানো, দক্ষতা বিকাশ, বিপণনে সহায়তা, শিল্প তালুকের বিকাশ, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের মতো নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের এই সব কর্মকাণ্ডের দরুন দারুণভাবে উপকৃত হয়েছেন এই শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষ, সৃষ্টি হয়েছে দেড় লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং গড়ে উঠেছে ৮০ হাজারেরও বেশি উদ্যোগ, যার মধ্যে বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত।❑

সংকলন : যোজনা ব্যুরো

যোজনা ? কু্যইজ

এবারের বিষয় : জানুয়ারি মাস

১. ‘বিশ্ব কুষ্ঠ নির্মূলীকরণ দিবস’ কবে পালন করা হয়?
২. ‘বিশ্ব হাস্য দিবস’ সাধারণত প্রতি বছর মে মাসের প্রথম রবিবার আয়োজিত হয়। এর সূচনা কবে ও কোথায় হয়?
৩. ‘প্রবাসী ভারতীয় দিবস’ কবে ও কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে উদ্‌যাপিত হয়?
৪. ১১ জানুয়ারি কোন প্রাক্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণ দিবস?
৫. কোন দিনটিকে ‘জাতীয় যুব দিবস’ হিসাবে পালন করা হয়?
৬. প্রতিরক্ষার নিরিখে ১৫ জানুয়ারি দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ কেন?
৭. এবছর ২৩ জানুয়ারি আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করব?
৮. ‘জাতীয় পর্যটন দিবস’ কবে?
৯. ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটিকেই কেন বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে?
১০. ২০১৮ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠান বিশেষ অতিথি আমন্ত্রণের নিরিখে অভিনব কেন?
১১. লালা লাজপৎ রায়ের জন্ম কবে ও কোথায়?
১২. ‘তথ্যের গোপনীয়তা’ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কোন দিনটিকে বিশ্বজুড়ে চিহ্নিত করা হয়েছে?
১৩. কোন দিনটি ‘জাতীয় শিশুকন্যা দিবস’ হিসাবে পালিত হয়?
১৪. ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস’ কবে?
১৫. কেন ৩০ জানুয়ারি জাতীয় স্তরে ‘শহীদ দিবস’ হিসেবে স্বীকৃত?

উত্তর :

১. প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবার বিশ্ব কুষ্ঠ নির্মূলীকরণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবছর কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ২৮ জানুয়ারি এই দিনটি পালিত হবে। ১৯৫৪ সালে ফরাসি লেখক তথা লোকহিতৈষী রাউল ফলেরো এই দিনটি পালনের প্রচলন করেন। ২. ১৯৯৮ সালে ১০ জানুয়ারি, মুম্বইয়ে। ‘হাস্য যোগ’ বা Laughter Yoga Movement-এর জনক হিসেবে ভারতের ড. মদন কাটারিয়ার নাম স্বীকৃতি লাভ করেছে। ৩. ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বম্বে ফিরে আসেন। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করতে এবং দেশের উন্নয়নে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মানুষজনের অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে ২০০৩ সাল থেকে বিদেশমন্ত্রক ৯ জানুয়ারির দিনটিকে ‘প্রবাসী ভারতীয় দিবস’ হিসেবে চিহ্নিত করে। ৪. লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পরবর্তীকালে ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী। জন্ম ১৯০৪ সালের ২ অক্টোবর, মুঘলসরাইয়ে। ১৯৬৬ সালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে ‘তাশখন্দ চুক্তি’ সই করতে উজবেকিস্তানের তাশখন্দ যান। চুক্তিটি সই করার পর সেখানেই ১১ জানুয়ারি তাঁর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। ৫. ১২ জানুয়ারি। ১৮৬৩ সালে এই দিনটিতেই কলকাতায় জন্ম হয় নরেন্দ্রনাথ দত্তের। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। এই দার্শনিক সন্ন্যাসীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৮৫ সাল থেকে দিনটিকে ‘জাতীয় যুব দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। ৬. ১৯৪৯ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতের শেষ ব্রিটিশ কমান্ডর-ইন-চিফ জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস বুচারের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হন লেফটেন্টে জেনেরাল কে. এম. কারিয়াপ্পা। তিনিই ভারতীয় সেনার প্রথম ভারতীয় কমান্ডর-ইন-চিফ। সেজন্য এই দিনটিকে ভারতে ‘সেনা দিবস’ বা ‘আর্মি ডে’ হিসেবে পালন করা হয়। ২০১৮ সালের ১৫ জানুয়ারি ৭০-তম সেনা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। ৭. ১২১-তম। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসু কটকে জন্মগ্রহণ করেন। ৮. ২৫ জানুয়ারি। ৯. স্বাধীনতার সময় কোনও স্থায়ী সংবিধান ছিল না; সেজন্য ঔপনিবেশিক ভারত শাসন আইনেই কিছু রদবদল ঘটিয়ে দেশ শাসনের কাজ চালানো হয়। আর নতুন সংবিধান রচনার জন্য ভীমরাও আম্বেডকরের নেতৃত্বে কমিটি গঠিন করা হয়। সেবছরই ৪ নভেম্বর কমিটি একটি খসড়া সংবিধান গণপরিষদে জমা দেয়। অবশেষে ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সংবিধানের চূড়ান্ত নথিটি পাস হয় এবং তার দু’দিনের মধ্যেই, অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়। ধরে নেওয়া হয় যে এদিন থেকেই ভারতে প্রজাতন্ত্র কায়েম হল। তাই ২৬ জানুয়ারি আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করি। ১০. প্রত্যেক বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে অন্য কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাকে প্রধান অতিথির মর্যাদা দেওয়া হয়। এই বছর প্রথম বার একসঙ্গে দশজন প্রধান অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এরা হলেন আসিয়ানভুক্ত দশটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান (বা সরকারি প্রধান)। ১১. ১৮৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি, পাঞ্জাবের ধুদিকে-তে (বর্তমান ভারতের মোগা জেলায়)। লালা লাজপৎ রায় ‘পাঞ্জাব কেশরি’ নামে খ্যাত। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী লাল-বাল-পাল গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা (বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে)। স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী হিসেবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও একটি বিমা কোম্পানি স্থাপন করেন। ১২. ২৮ জানুয়ারি। Date Privacy & Protection Day। ভারত-সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের ৪৭-টি দেশে এই দিনটি পালিত হয়। ১৩. ২৪ জানুয়ারি। ১৪. ২৬ জানুয়ারি। ১৫. ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গডসে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। গান্ধীজীর পাশাপাশি অন্যান্য শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এই দিনটি ‘শহীদ দিবস’ হিসেবে পালিত হয়।❑

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর

উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো শাস্ত্রীয় সংগীত আসর, 'বেঙ্গল উচ্চাঙ্গ সংগীত উৎসব' এবছর আয়োজিত হয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডির আবাহনী মাঠে। বিশুদ্ধ সংগীতের সেরা শিল্পীদের অংশগ্রহণে ষষ্ঠ আসরের জন্য প্রস্তুতি ছিল বিশাল। ১৩০ বাই ৫০ ফুটের বিশাল মঞ্চ, সাত হাজার দর্শক বসার ছাউনি আর গ্যালারি মিলিয়ে গত পাঁচ বছরের ভেন্যু আর্মি স্টেডিয়ামের চেয়ে এবছর আয়োজনের বহর তাক লাগানো। পাঁচ রাতের এই আয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১৫০ জন শিল্পী অংশ নেন। ২৬ ডিসেম্বর রাত ১০-টায় বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন 'বেঙ্গল উচ্চাঙ্গ সংগীত উৎসব ২০১৭'। এই আয়েজন এবছর উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলা ভাষার বরেণ্য শিক্ষাবিদ এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সেদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, বাংলাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। পাশাপাশি উৎসবের মাঠে চলে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতসাধকদের জীবনী নিয়ে এক অনন্য প্রদর্শনী। এটি সবার জন্যই এক বাড়তি প্রাপ্তি।

প্রথম সন্ধ্যাতে বেহালার সম্রাট ড. এল. সুব্রামনিয়াম বেহালায় আভোগী রাগ পরিবেশন করেন। তার সঙ্গে মৃদঙ্গে সঙ্গত করেন শ্রীরামামূর্তি ধুলিপালা, তবলায় পণ্ডিত তন্ময় বোস এবং মোরসিং-এ ছিলেন সত্য সাঁই ঘণ্টশালা। ড. সুব্রামনিয়ামই একমাত্র শিল্পী, যিনি দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত, পশ্চিমা ধ্রুপদি সংগীত বাজিয়ে চলেছেন। রেকর্ডিং করেছেন ইয়েহুদি মেনুহিন, স্টেফান গ্রাপ্পেল্লি, স্টিভি ওয়ান্ডার, জঁ পিয়ের, রামপাল-সহ বিশ্ব সংগীতের তাবড় তারকার সঙ্গে।

ড. সুব্রামনিয়ামের পর অর্কেস্ট্রার আয়োজন নিয়ে আসে আস্তানা সিম্ফনি ফিলহারমোনিক। তারা সিলেস কাজগালিবের সিম্ফোনির কিছুটা পরিবেশনের পর বিশ্বখ্যাত চাইকভস্কির 'সোয়ান লেক' শুরু করে। অর্কেস্ট্রার পরিচালনায় ছিলেন বেরিক বাত্যরখান। প্রথম রাতে দর্শক আরও বিমোহিত হন রাজরূপা চৌধুরীর সরোদে, বিদুষী পদ্মা তালওয়াকারের খেয়াল, ফিরোজ খানের সেতার, সুপ্রিয়া দাস ও বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ের যুগল খেয়াল, রাকেশ চৌরাসিয়ার বাঁশি এবং পূর্বায়ন চট্টোপাধ্যায়ের সেতারের আবেশে।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে কথক পরিবেশন করে অদিতি মঙ্গলদাস ডান্স কোম্পানি এবং দৃষ্টিকোণ ডান্স ফাউন্ডেশন। মঞ্চে ছিলেন অদিতি মঙ্গলদাস, গৌরী দিবাকর, মিনহাজ, আম্রপালি ভাণ্ডারী, অঞ্জনা কুমারী, মনোজ কুমার, সানি শিশোদিয়া। এছাড়া, কণ্ঠ ও হারমোনিয়াম পরিবেশনে ছিলেন ফারাজ খান, তবলা ও পাঢ়ান্তে মোহিত গাঙ্গানি, পাখোয়াজ ও পাঢ়ান্তে আশিস গাঙ্গানি, বাঁশিতে রোহিত প্রসন্ন।

আয়োজন শেষে শিল্পীদের হাতে উৎসব স্মারক তুলে দেন নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। তার পর একে একে মঞ্চে ওঠেন সন্তুরবাদক পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, খেয়াল পরিবেশন করেন পণ্ডিত উল্লাস কশলকর, সেতারে উস্তাদ শাহিদ পারভেজ খান, ধ্রুপদে অভিজিত কুণ্ডু ও বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়। বাঁশি শোনান পণ্ডিত রনু মজুমদার এবং সরোদ বাজান পণ্ডিত দেবজ্যোতি বসু।

তৃতীয় রাতের অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যে ৭-টায়। শেষ হয় পর দিন, ভোর ৫-টা ২৫ মিনিটে। শুরুতেই দলবদ্ধ সেতারে বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ের শিক্ষার্থীরা। পণ্ডিত কুশল কুমার দাসের গ্রন্থনায় কিরওয়ানিতে সেতার অর্কেস্ট্রার রেশ না কাটতেই ঘাটম ও কাঞ্জিরা পরিবেশনা নিয়ে মঞ্চে আসেন গ্র্যামি বিজয়ী পদ্মভূষণ বিদ্বান ভিক্ষু বিনায়ক রাম। সঙ্গে ছেলে সেলভাগনেশ বিনায়ক রাম এবং নাতি স্বামীনাথন। একই মঞ্চে তিন প্রজন্মের পরিবেশনা। কাঞ্জিরা ও কোনাক্কলে স্বামীনাথন। মোরসিংয়ে ছিলেন এ গণেশন। পুরো সময়টা জুড়েই ছিল মুগ্ধতা। ঘাটমে শিব তাণ্ডব, সেভেন অ্যান্ড হাফ বিট কম্পোজিশনে ঢাকার শুদ্ধ সংগীতপ্রেমীদের মনে থাকবে অনেক দিন। এর পরে মালকোষ রাগে খেয়াল নিয়ে মঞ্চে আসেন সরকারি সংগীত কলেজের শিক্ষার্থীরা। আবির হোসেনের সরোদে রাগ আভোগী এবং সঙ্গে যোগেশ সামসির তবলার সঙ্গত ছিল এক অনন্য পরিবেশনা। গাজি আবদুল হাকিমের বাঁশির আমেজ না ফুরোতেই আসেন পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর। বিদুষী কালা রামনাথ বেহালা বাদন শেষ করলেন রাগ বসন্ত বাজিয়ে। রাত ৩-টে ৫১ মিনিটে মঞ্চে আসেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। শুরুতেই উস্তাদ বড়ে গোলাম আলির সেই বিখ্যাত রাগ গুনকেলী- গাও গুনকেলী গুনীয়ামমে- গুনকি বাত সামঝানমে। সঙ্গে তবলায় পণ্ডিত যোগেশ সামসী। এরপর হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে শুরু করেন—যামিনী হল যে ভোরে... বাঁশি বাজে। যোগিয়াতে মুগ্ধ দর্শক, সুর ছাড়া আর সব কিছুই তখন হারিয়ে গিয়েছে। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী তার অনুষ্ঠান শেষ করেন ভৈরবীতে মীরার ভজনে—নায়না বায়ন পারি। পরিবেশনার শেষে, মাঠে দাঁড়িয়ে প্রায় পাঁচ হাজার দর্শক সম্মিলিত করতালিতে তাকে সম্মান জানান। বেঙ্গল উচ্চাঙ্গ সংগীত উৎসবের চতুর্থ দিনে দর্শকদের সামনে ওস্তাদ রশীদ খান, পণ্ডিত যশরাজ। শুরুতেই বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের দলগত নৃত্য-নৃত্য চিরন্তন : মণিপুর, ভারতনাট্যম, কত্থক নৃত্যার্ঘ। পরিচালনায় ছিলেন গুরু বিপিন সিংহ, পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, শিবলী মোহাম্মদ। সমন্বয়কারীর ভূমিকায় শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরে সরোদে রাগ ভূপালি দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করেন বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ের শিক্ষার্থীরা। রাত ৯-টা ৩১ মিনিটে মঞ্চে ওঠেন উস্তাদ রশিদ খান। রামপুর সহসওয়ান ঘরানার প্রবাদপ্রতিম এই শিল্পী প্রথমে পুরিয়া রাগে গাইলেন—প্রীত লগন প্রিয়া। তিনি তার নিজের সৃষ্টি- প্রিয়ারঞ্জনী রাগে আরেকটি খেয়াল শোনান। পিতা রশিদ খানের সঙ্গে পরিবেশনায় তার সন্তানও ছিলেন। কণ্ঠ সহযোগিতায় ছিলেন নাগনাথ আদগাঁওকার, তবলায় পণ্ডিত শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হারমোনিয়ামে অজয় যোগলেকর ও সারেঙ্গিতে ছিলেন উস্তাদ সাবির খান। খেয়ালের শেষেই সরোদ ও বেহালার যুগবলন্দী। পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এবং মাইশুর মঞ্জুনাথ একসঙ্গে রাগ সিমেন্দ্রমধ্যম নিয়ে মঞ্চে। তাদের সঙ্গে তবলায় পণ্ডিত যোগেশ শামসি এবং মৃদঙ্গমে ছিলেন অর্জুন কুমার।

রাত ২-টো ৫ মিনিটে আসেন- সাসকিয়া রাও দ্য-হাস। পাশ্চাত্য ঘরানার হলেও ১৯৯৩ সালে একটি কনসার্টে যোগ দিতে ভারতে এসে সংগীতের নতুন পথে চলতে শুরু করেন তিনি। তার বানে চেলো পেয়েছে নতুন মাত্রা। তার হাতে শব্দযন্ত্রটির আকারেও অনেকটা বদল ঘটেছে। নেদারল্যান্ডসের এই কৃতি শিল্পী লাল পাড়ের সবুজ শাড়িতে যেন নিতান্তই বাঙালী। শেষে বাজালেন রবীন্দ্রনাথের- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। মাঠের অধিকাংশ দর্শক তখন উঠে দাঁড়িয়ে তালে তালে তালি দিয়ে চলেছে। রাত ৩-টে ৫০ মিনিটে আসেন পণ্ডিত বুদ্ধাদিত্য মুখোপাধ্যায়। সেতারের যাদুতে শুরু হয় মুগ্ধতা—সৌমেন নন্দীর তবলায় ললিত তখন ডেকে আনছে দিনের প্রথম প্রহর। তিনি শেষ করলেন প্রভাতের রাগ ভৈরবীতে, চেনা সুর- বাবুল মেরা- নৈহর ছুটওহি যায়.....। বাহাদুর শাহ জাফরের পদ্য তখন মাঠজুড়ে স্পর্শ করছে সবাইকে।❑

(তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা)

যোজনা ডায়েরি

(২১ নভেম্বর—২০ ডিসেম্বর, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

- মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে সার্বিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল ভারত। বিদেশ সচিব এস. জয়শঙ্কর গত ২০ ডিসেম্বর মায়ানমার সফরে গিয়ে একটি চুক্তিপত্র সই করেন। বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মায়ানমারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে এই চুক্তিপত্রে রাখাইন প্রদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই প্রদেশে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা এবং এখান থেকে চলে যাওয়া মানুষদের ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে মায়ানমার সরকারকে সাহায্য করতে চায় ভারত। শরণার্থীরা ফিরে এলে তাদের জন্য বাসস্থান তৈরি করে দেওয়ার প্রস্তাবও ভারত মায়ানমারকে দিয়েছে।
- পাকিস্তানের হাতে যে পরিমাণে ট্যাকটিক্যাল (ছোটোখাটো) পরমাণু অস্ত্র আছে, তা শুধুই ভারতীয় উপমহাদেশের পক্ষে বিপজ্জনক নয়, যেকোনও মুহূর্তে তা এই অঞ্চলের যেকোনও যুদ্ধকে (কনভেনশনাল ওয়ার) পরমাণু যুদ্ধের স্তরে নিয়ে যেতে পারে। ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মার্কিন থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক সংস্থা, 'অ্যাটলান্টিক কাউন্সিল'-এর একটি রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। রিপোর্টের শিরোনাম, 'এশিয়া ইন দ্য সেকেন্ড নিউক্লিয়ার এজ'। রিপোর্টে অবশ্য এও বলা হয়েছে, ট্যাকটিক্যাল পরমাণু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা থাকলেও ইসলামাবাদ এখনও পর্যন্ত তা নিয়ে তেমন পরীক্ষানিরীক্ষা করেনি। তবে প্রচুর ট্যাকটিক্যাল পরমাণু অস্ত্র মজুদ রয়েছে পাকিস্তানের হাতে।

● **সমকামী বিয়ে বৈধ অস্ট্রেলিয়ায় :**

সমকামী বিয়ে আইনি বৈধতা পেল অস্ট্রেলিয়ায়। গত ৭ ডিসেম্বর হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রস পার্টি বিল পাস করে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালের এক রায়ে সমকামী বিয়েকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল অস্ট্রেলিয়ার আদালত। এবার তার উলটো পথে হেঁটে বিশ্বের ২৫-তম দেশ হিসেবে সমকামী বিয়ে বৈধ ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বের যেসব দেশে এখনও পর্যন্ত সমকামী বিয়ে বৈধতা পেয়েছে তার মধ্যে আর্জেন্তিনা, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, কলম্বিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লাক্সেমবার্গ, মাল্টা, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং স্পেন অন্যতম।

উল্লিখিত ঘোষণার পর সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল বলেন, প্রতি অস্ট্রেলীয়বাসীর নিজস্ব মতামত রয়েছে এবং তার সব ক'টিই ঠিক। বিষয়টি নিয়ে হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ ভোটাভুটিকে টার্নবুল "সাম্যের পক্ষে ভোট" বলে আখ্যা দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল জর্জ ব্র্যান্ডিস জানিয়েছেন, ৯ ডিসেম্বর থেকে সমকামীরা বিয়ের জন্য আইনি নোটিস দেওয়া শুরু করতে পারবেন। নোটিস দেওয়ার ২৮ দিনের মাথায় তারা বিয়ে করতে পারবেন। অর্থাৎ, প্রথম দিন নোটিস দিলে ৬ জানুয়ারি, ২০১৮-তেই সংঘটিত হতে পারে সেদেশের মাটিতে প্রথম সমকামী বিয়ে। ইতোমধ্যেই যেসব সমকামী অস্ট্রেলীয় মানুষজন নিউজিল্যান্ড, ব্রিটেন বা কানাডার মতো দেশগুলিতে গিয়ে বিয়ে করেছেন, এই আইন পাসের পর তাদের বিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের দেশেও বৈধতা অর্জন করবে।

● **সবচেয়ে শক্তিশালী সাবমেরিন বানাল রাশিয়া :**

আরও বিধ্বংসী সাবমেরিন তৈরি করল রাশিয়া। 'বোরেই ২' শ্রেণির এই সাবমেরিনটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বলে দাবি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহলের। নাম 'দ্য নিয়াজ ভ্লাদিমির' বা 'প্রিন্স ভ্লাদিমির'। সেদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে মোট ৮-টি এই শ্রেণির সাবমেরিন তৈরি করবে রাশিয়া। প্রায় ছ'হাজার মাইল বা ৯ হাজার ৩০০ কিলোমিটার দূরের কোনও লক্ষ্যবস্তুকে এক নিমেষে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে প্রিন্স ভ্লাদিমিরের। শুধু তাই নয়, একসঙ্গে ২০-টি পরমাণু অস্ত্র ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তুকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে তা। সাবমেরিনগুলো এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, রাডারও সেগুলোকে চিহ্নিত করতে সক্ষম নয়। রাডার-এর চোখ এড়াতে সমুদ্রের ৪০০ মিটার গভীরেও অবাধে চলাচল করতে পারে। উত্তর রাশিয়ার সেভম্যাশ শিপইয়ার্ডে এই সাবমেরিন তৈরির কাজ শুরু হয় ২০১২ সালে। আগামী বছরই রুশ সেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে সেনা সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার সবচেয়ে অত্যাধুনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন এই প্রিন্স ভ্লাদিমির। রাশিয়ার এই বোরেই শ্রেণির সাবমেরিনগুলো বুলাভা আরএসএম-৫৬ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলে সজ্জিত।

● **ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞায় সায় সুপ্রিম কোর্টের :**

সিরিয়া, ইরান, ইয়েমেন, লিবিয়া, সোমালিয়া ও চাদ-এর মতো ছ'টি মুসলিম প্রধান দেশ থেকে আর কাউকেই আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তাতে সায় দিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্টও। অবশ্য কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তার কোনও

কারণ দর্শানো হয়নি। শুধু বিষয়টি নিয়ে নিম্ন আদালতে যেসব মামলা চলছে, তার তড়িঘড়ি নিষ্পত্তি চেয়েছে শীর্ষ আদালত। নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যাপারে শীর্ষ আদালতে ৯ জনের মধ্যে ৭ জন বিচারপতিই সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন। তবে রায়ে একটি শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের বৈধতা আদায় করাটা জরুরি। ট্রাম্পের সংশোধিত এবং তৃতীয় দফার এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এখনও মামলা চলছে একাধিক নিম্ন আদালতে। হোয়াইট হাউসের দাবি, এই সফর-নিষেধাজ্ঞা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই হোয়াইট হাউসে পা রাখার পর পরই ট্রাম্প প্রথম যে-নিষেধাজ্ঞায় সই করেছিলেন, তাতে ইরাক-সহ সাতটি দেশের নাম ছিল। সবগুলিই মুসলিমপ্রধান। তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল দুনিয়াজুড়ে। আদালতেও মুখথুবড়ে পড়েছিল ওই নির্দেশ। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়ে ট্রাম্প পরে বাধ্য হন ইরাককে ওই তালিকা থেকে বাদ দিতে। দ্বিতীয় দফার এই নিষেধাজ্ঞাও বানচাল হয়ে গেলে, গত সেপ্টেম্বরে 'আইন মেনে' নতুন তালিকা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। একাধিক নিম্ন আদালতে সেটিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। বলা হয়, ওই ছ'টি দেশের যেসব নাগরিকের আত্মীয়স্বজন আমেরিকায় আছেন, তাদের ঢুকতে দিতেই হবে।

আমেরিকায় 'ঢোকা নিষেধ'-এর তালিকায় সম্প্রতি ট্রাম্প উত্তর কোরিয়া এবং ভেনেজুয়েলার কিছু সরকারি কর্মকর্তার নাম জোড়েন। তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও নিম্ন আদালত স্থগিতাদেশ দেয়নি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়ার কাউকেই আর মার্কিন ভিসা দেওয়া হবে না। বাকিদের ক্ষেত্রেও তাই। তবে সোমালিয়া আর ইরানের ক্ষেত্রে এখনও কিছুটা ছাড় রাখতে চাইছে হোয়াইট হাউস। যেমন, ইরানি ছাত্ররা চাইলে আমেরিকায় আসতে পারেন। আসতে পারেন ভিসাধারী সোমালীয়রাও। সেক্ষেত্রে আরও আঁটসাঁট যাচাইয়ের বন্দোবস্ত করছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি।

● **জেরুসালেম প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে কোণঠাসা ট্রাম্প :**

গত ৭ ডিসেম্বর জেরুসালেমকে ইজরায়েলের রাজধানীর স্বীকৃতি দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বছরখানেক আগে তার নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট হলে জেরুসালেমকেই ইজরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন। তেল আভিভ থেকে সরিয়ে নেবেন মার্কিন দূতাবাসও। দূতাবাস স্থানান্তরের আগেই সেই ঘোষণা করে বসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জে এ নিয়ে জোর ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প। এই ঘোষণার জেরেই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে একঘরে হয়ে পড়ল আমেরিকা। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪-টি সদস্য রাষ্ট্রই ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত দেয়। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের শেষে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইজরায়েলি ও প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই জেরুসালেমের অবস্থান ঠিক করতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদে দাবি উঠেছিল, খারিজ করা হোক আমেরিকার এই অন্যায় স্বীকৃতি। গত ১৯ ডিসেম্বর মিশরের তৈরি সেই খসড়া প্রস্তাবে ভোট দিতে গিয়ে পরিষদের সদস্য ১৫-টি দেশের মধ্যে ১৪-টিই তাতে সায় দেয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওয়াশিংটন ভেটো দেওয়ায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, নিয়ম অনুযায়ী পরিষদের স্থায়ী ৫ সদস্য হিসেবে আমেরিকা, চিন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে যেকোনও একটি দেশ বেঁকে বসলেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। জেরুসালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী হিসেবে মার্কিন ঘোষণার পর ক্ষোভ উগড়ে দেয় প্যালেস্তাইন-সহ গোটা আরব দুনিয়া। ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। এক বিবৃতিতে ই.ইউ. জানিয়েছে, জেরুসালেম সমস্যা প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েল, এই দুই দেশের। জেরুসালেমকে দু'দেশের রাজধানী হিসেবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন জেরুসালেমের উপর নির্দিষ্ট কোনও দেশের দখলদারি বরদাস্ত করবে না। তারপরই জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডাকে প্রসঙ্গত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ। বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে চিন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন, বলিভিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, ইতালি, জাপান, কাজাখস্তান, সেনেগল, সুইডেন, ইউক্রেন এবং উরুগুয়ে সবাই ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে।

● **ছাবাহারে ভারতের তৈরি শাহিদ বেহেস্তি বন্দর উদ্বোধন :**

ভারতের আর্থিক সহায়তায় নির্মীয়মান ইরানের ছাবাহার সমুদ্রবন্দরের একটি অংশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল গত ৩ ডিসেম্বর। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে আর পাকিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহার না করে আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করে তুলতে ইরানের ছাবাহারে সমুদ্রবন্দর গড়ে তুলতে ৫০ কোটি ডলার দিয়েছে ভারত। প্রাথমিকভাবে ছাবাহার বন্দরের যে অংশটির কাজ ইতোমধ্যে শেষ তার নাম দেওয়া হয়েছে, শাহিদ বেহেস্তি বন্দর। এখন বন্দরের দু'টি বার্থ ব্যবহার করবে ভারত। বন্দরের এই নয়া অংশে রয়েছে পাঁচটি নয়া জেটি। বন্দরের উদ্বোধন করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি। হাজির ছিলেন ভারত, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির প্রতিনিধিরাও।

পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলে ইরানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের সিস্তান-বালুচিস্তান প্রদেশের ছাবাহারে বন্দর গড়ে ওঠায় এবার পাক ভূখণ্ড ব্যবহার না করেই পশ্চিম উপকূল থেকে ভারত ব্যবসাবাণিজ্য চালাতে পারবে আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্য এশিয়ার তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে। গত অক্টোবরেই ভারত জাহাজে চাপিয়ে আফগানিস্তানে গম পাঠিয়েছিল ছাবাহার বন্দর দিয়ে। বন্দর নির্মাণের জন্য ভারত ও ইরানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গত বছরের মে মাসে।

● **বিডিআর বিদ্রোহে ১৩৯ জনের ফাঁসি বহাল হাইকোর্টে :**

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙতে এবং দেশের সামরিক নিরাপত্তা ধ্বংস করতেই সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস)-এর জওয়ানেরা বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল বলে ২৭ নভেম্বর জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ হাইকোর্ট। স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রেই পিলখানা ব্যারাকে এই বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল বলে বিচারপতিরা মন্তব্য করেন। এই মামলার নিম্ন আদালতের ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানির রায়ে ১৩৯ জন আসামিকে এদিন ফাঁসির আদেশ দিল সেদেশের হাইকোর্ট। ১৮৫ জনের যাবজ্জীবন ও ২২৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে। প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়েছেন ২৮৮ জন। অভিযুক্ত ৮৪৬ জনের মধ্যে বাকি ছয় জনের ইতোমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর পরই বিডিআর ভেঙে দিয়ে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' (বিজিবি) নামে নতুন বাহিনী গড়ে সরকার। জওয়ানদের ক্ষোভের কথা মাথায় রেখে নতুন বাহিনীতে নিয়মকানুনের বেশ কিছু সংস্কারও করা হয়, হাইকোর্টের বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণে সেসব পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্রোহ বিষয়ে গোয়েন্দা ব্যর্থতার দিকটি তুলে ধরে সমালোচনা করেছে হাইকোর্ট। বাহিনীতে অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে পেশাদারি সম্পর্ক ও অধঃস্তনদের প্রতি নজরে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার কথাও বলেছেন বিচারপতিরা। আসামির সংখ্যার নিরিখে বাংলাদেশের বৃহত্তম এই ফৌজদারি মামলার মূল রায়টি

প্রায় ১০ হাজার পাতার। তার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও সাজার অংশের এক হাজার পাতার রায়টি বিচারপতিরা পড়া শুরু করেন ২৬ নভেম্বর। পরের দিন পড়া হয় সাজার অংশটি। কোনও সাজার রায় দু'দিন ধরে পড়াটা নজিরবিহীন ঘটনা, তেমনই একটি মামলায় এত লোকের একসঙ্গে প্রাণদণ্ডের ঘটনাও বাংলাদেশে এই প্রথম। এর আগে পিলখানার বাইরের বিডিআর বিদ্রোহের ৫৭-টি মামলায় বাহিনীর নিজস্ব আদালতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার জওয়ানকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পিলখানার মামলাটি বিচার করা হয় ঢাকার জজ আদালতে। ২০১৩ সালে এই মামলায় ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৬০ জনকে যাবজ্জীবন ও ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বেকসুর খালাস ২৭৮ জনের মধ্যে ৬৯ জনের বিষয়ে হাইকোর্টে আপিল করে রাষ্ট্রপক্ষ। তাদের ৩১ জনকে এদিন যাবজ্জীবন ও ৪ জনকে ৭ বছর করে কারাদণ্ড দেয় হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যেই ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানা বিডিআর ব্যারাকে এই বিদ্রোহ হয়। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্রও। পিলখানায় সাধারণ জওয়ানেরা ৭৪ জনকে হত্যা করে, যার মধ্যে ৫৭ জনই বিডিআর-এর দায়িত্ব পালন করা বরিষ্ঠ সেনা আধিকারিক। বিদ্রোহের নেতা হিসাবে উঠে আসে উপ-সহকারী পরিচালক তৌহিদুল আলমের নাম। তাকেও এদিন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দায়িত্বশীল সামরিক অফিসারেরা জওয়ানদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের কথা শুনতে পিলখানা বিডিআর ব্যারাকে সাধারণ সভা ডেকেছিলেন। কিন্তু সকাল ন'টায় সভা শুরুর পরেই জওয়ানেরা অফিসারদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। অফিসারদের হত্যা করে ব্যারাকের দখল নেয়। অফিসারদের খুঁজে খুঁজে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। তাদের মেসে ঢুকে পরিজনদেরও হত্যা করা হয়। পর দিন সরকারের পক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গির কবির নানক, হুইপ মির্জা আজম ও সাংসদ ফজলে নুর তাপস বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও বিদ্রোহীদের কথা হয়। পরে গভীর রাতে পিলখানা ব্যারাকের বাইরে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে বিদ্রোহের নেতাদের আলোচনায় বরফ গলে। গভীর রাতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন পিলখানায় পৌঁছলে, বিদ্রোহীরা তার কাছে অস্ত্রসমর্পণ করে।

● **আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে 'জয়' ভারতের :**

আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে বিচারক হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হলেন ভারতীয় বিচারপতি দলবীর ভাণ্ডারী। দ্য হেগের আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়। ন্যায় আদালতের বিচারপতির পঞ্চম আসনটির জন্য চলতি ভোটাভুটিতে সাধারণ সভায় এগিয়ে ছিলেন ভারতীয় প্রার্থী বিচারপতি দলবীর। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে দু'ভোটে পিছিয়ে ছিলেন তিনি। গত ২২ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের দুই কক্ষেই দ্বাদশ দফার ভোট হওয়ার কথা ছিল। তবে সেই ভোটাভুটির কিছুক্ষণ আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে চিঠি লেখেন ব্রিটিশ স্থায়ী প্রতিনিধি অ্যান্ড্রু রাইক্রফট। তাতে জানান, আর ভোটাভুটি করে রাষ্ট্রপুঞ্জের সময় নষ্ট করতে রাজি নয় ব্রিটেন। তাই বিচারপতি গ্রিনউড প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবেন। এর পরে দুই কক্ষের ভোটে সহজেই জিতে যান বিচারপতি ভাণ্ডারী। ১৯৪৫ সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে এই প্রথম আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের বেঞ্চে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ব্রিটেনের কোনও বিচারপতি থাকবেন না।

আন্তর্জাতিক আদালত সব মিলিয়ে ১৫ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত। তাদের প্রত্যেকের মেয়াদ ৯ বছর। প্রতি তিন বছর অন্তর তার এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ, ৫ জন বিচারপতি নতুন করে নিয়োগ হয়। সেই পাঁচ জনের মধ্যেই এবার ছিলেন বিচারপতি দলবীর এবং বিচারপতি ক্রিস্টোফার। পঞ্চম বিচারপতি পদে, নির্বাচনের ১১ রাউন্ড পর্যন্ত বিচারপতি দলবীর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে এবং বিচারপতি ক্রিস্টোফার নিরাপত্তা পরিষদে এগিয়ে ছিলেন। একজন প্রার্থীকে জিততে হলে, এই দুই সভাতেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু, শেষে ব্রিটেন প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদের ১৫-টি ভোটই বিচারপতি দলবীরের ঝুলিতে জমা হয়। পাশাপাশি তিনি জেনারেল অ্যাসেম্বলির ১৯৩-টি ভোটের মধ্যে ১৮৩-টি পেয়েছেন।

● **সিরিয়া নিয়ে শীর্ষ সম্মেলনে ইরান-তুরস্ক-রাশিয়া :**

সিরিয়ার ছ'বছর ধরে চলতে থাকা গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত করতে যে শান্তি চুক্তির কথা ভাবা হচ্ছে, তাতে আসাদ সরকার-সহ সব পক্ষকেই আপসের কথা ভাবতে হবে, মত রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের। গত ২৩ নভেম্বর ইরান ও তুরস্কের প্রেসিডেন্টদের নিয়ে রাশিয়ার সোচিতে শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এর্দোগান। গত কয়েক দশকে রুশ কূটনীতিতে এত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক কমই হয়েছে। যে তিন দেশ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই সিরিয়া সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তবে তিন দেশ মিলে যে চুক্তিতে যাওয়ার কথা ভাবছে, তাতে রাশিয়া এবং ইরান সমর্থিত সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের গদি থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা। সিরিয়ায় সেক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করার কথাও ভাবা হবে।

সম্মেলন শুরুর আগেই আসাদের সঙ্গে কথা হয় পুতিনের। তাছাড়া ফোনে সিরিয়া প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহুর সঙ্গেও কথা হয় পুতিনের। এবার পুতিন চান সিরিয়া পুনর্নির্মাণে তুরস্ক এবং ইরান আলোচনা শুরু করুক। ডিসেম্বরে রাশিয়াতেই সিরিয়া জাতীয় আলোচনা কংগ্রেস শুরু করার কথাও বলেছেন পুতিন। তখনই সিরিয়ার জন্য সংবিধান পুনর্গঠনের কথা ভাবা হবে। কথা হবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়েও। আসাদও সে ভোটে লড়তে পারেন বলে জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

● **হাফিজ সইদের মুক্তি :**

জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সইদকে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিল পাকিস্তানের এক বিচার বিভাগীয় বোর্ড। এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছে ভারত। মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজের বিরুদ্ধে বার বার সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করেছে ভারত। কিন্তু পাকিস্তান সেই মামলায় ওই জঙ্গি নেতার বিরুদ্ধে তেমন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং ভারতের দেওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট নয় বলেই ক্রমাগত দাবি জানিয়ে এসেছে পাকিস্তান। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে সইদ ও তার চার সহযোগীকে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে গৃহবন্দি করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপেই পাক সরকারের এই পদক্ষেপ, বলে ধারণা কূটনীতিকদের। গৃহবন্দির আদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল লস্কর নেতারা। সম্প্রতি সইদের চার সহযোগী মুক্তি পায়। ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার পরেও সইদকে

গৃহবন্দি করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু ২০০৯ সালে আদালতের নির্দেশে মুক্তি পায় সে। ভারতের দাবি, বিশ্বের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই সইদকে মাঝে মাঝে গৃহবন্দি করে পাকিস্তান। সেই পদক্ষেপে লস্করের কাজকর্ম কোনওভাবেই ব্যাহত হয় না।

এর পর ফের একবার রাষ্ট্রপুঞ্জের জঙ্গি তালিকা থেকে লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা, তথা ২৬/১১-র মূলচক্রী হাফিজ সইদের নাম প্রত্যাহার করার আবেদন করা হল। সম্প্রতি লাহোরের একটি ল' ফার্ম সইদের নাম রাষ্ট্রপুঞ্জের জঙ্গি তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন জমা দিয়েছে। সেকথার সত্যতা স্বীকার করে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রসিকিউটর জেনারেল নাভিদ রসুল মির্জা জানিয়েছেন, তার সংস্থাই এই আবেদন করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। প্রসঙ্গত, মুম্বই হামলার পর ২০০৮ সালের ডিসেম্বর থেকেই রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষিত জঙ্গির তালিকায় রয়েছে হাফিজের নাম।

জাতীয়

- হিমাচলপ্রদেশ ও গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে এসেছে বিজেপি। হিমাচলপ্রদেশে ভোটগ্রহণ পর্ব সারা হয় ৯ ডিসেম্বর। গুজরাতে ভোট হয় দু'দফায়—৯ ও ১৪ ডিসেম্বর। দু'রাজ্যেই ভোটগণনা হয় ১৮ ডিসেম্বর। হিমাচলপ্রদেশে ৬৮-টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে মোট ৪৪-টি আসন আর গুজরাতে ১৮২-টির মধ্যে ৯৯-টি।
- মধ্যপ্রদেশে ১২ বছর বা তার কমবয়সি নাবালিকা ধর্ষণের শাস্তি হতে চলেছে মৃত্যুদণ্ড। এ সংক্রান্ত বিলটিতে আগেই সিলমোহর দিয়েছিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। গত ৪ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ বিধানসভাতেও সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়ে যায় বিলটি। এবার বিলটিকে আইনে পরিণত করার জন্য দরকার রাষ্ট্রপতির অনুমোদন। সেজন্য বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর তোড়জোড় চলছে। পাশাপাশি, কোনও মহিলাকে বার বার উত্যক্ত করলে, তা নতুন আইনে জামিন-অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে বলেও জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

● **আধার যোগ করার সময়সীমা ৩১ মার্চ :**

মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার যোগের জন্য আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় মিলবে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি প্রকল্পে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্যও আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত আধার জমা করলেই চলবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার যোগের সময়সীমা বাড়িয়ে আগেই ৩১ মার্চ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টও তা মেনে নেয়। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ গত ১৬ ডিসেম্বর রায় দিয়েছে, মোবাইলের সঙ্গে আধার যোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক বা দপ্তর ও রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য আধার-যোগের সময়সীমা বেড়ে ৩১ মার্চ হবে। মোবাইল-আধার যোগের সময়সীমা এত দিন ছিল ৬ ফেব্রুয়ারি।

পাশাপাশি শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও আধার যোগের প্রক্রিয়া ২০১৮-র ৩১ মার্চের মধ্যে শেষ করলেই চলবে। যারা নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে যাবেন, তাদের কাছে আধার না থাকলে আধারের জন্য আবেদন করেছেন, তার প্রমাণ অবশ্যই দিতে হবে। আবেদনের ক্রমিক সংখ্যা জানাতে হবে ব্যাঙ্ককে। আধার কর্তৃপক্ষ এদিন জানিয়েছে, ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ১০ শতাংশ শাখায় আঙুলের ছাপ ও চোখের মণির স্ক্যানার বসানোর কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ওই শাখাগুলিতেই আধার তৈরি করা যায় এবং ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খুলতে কোনও অসুবিধা না হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার সবক্ষেত্রে আধারকে বাধ্যতামূলক করায় তার বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ মামলা হয়েছে। মূল অভিযোগ, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে মানুষের ব্যক্তি পরিসরে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট ইতোমধ্যেই ব্যক্তি পরিসরের অধিকারকে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ অবশ্য এদিন সেই বৃহত্তর প্রশ্নে যায়নি। জানিয়েছে, এবিষয়ে আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে সাংবিধানিক বেঞ্চে শুনানি হবে। সুপ্রিম কোর্ট ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্প বা পরিষেবার সঙ্গে আধার সংযুক্তির উপরে কোনও স্থগিতাদেশ জারি করতে রাজি হয়নি। তবে ৩১ মার্চের এই সময়সীমা যে সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের উপরে নির্ভর করছে, তাও এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে আদালত।

● **ভিন্ন ধর্মে বিয়ে করলেই স্ত্রীর ধর্ম বদলায় না মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের :**

পাত্র-পাত্রী ভিন্ন ধর্মের হলে বিয়ের পরে স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম হয়ে যাবে, একথা আইন বলে না। গত ৭ ডিসেম্বর এই মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ। গুলরুখ গুপ্ত নামে মহারাষ্ট্রের এক পার্সি মহিলা এক হিন্দু ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। পার্সি বিধান অনুযায়ী, ওই সম্প্রদায়ের কোনও মহিলা অন্য ধর্মে বিয়ে করলে তিনি আর পার্সি থাকেন না। ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অধিকারও হারিয়ে ফেলেন। সেই নিয়ম অনুযায়ী, ভালসার জোরোস্ট্রিয়ান ট্রাস্ট গুলরুখকে বাবার শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে চায়নি। তারই প্রতিবাদ করে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন গুলরুখ। কিন্তু হাইকোর্টও ট্রাস্টের সেই নিয়মের পক্ষেই মত দেয়। এর পরই গুলরুখ সুপ্রিম কোর্টে যান। সেই মামলার শুনানিতেই আদালত স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট-এর প্রসঙ্গ তুলে মন্তব্য করে, দুই ভিন্ন ধর্মের পুরুষ-নারী বিয়ের পর নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রাখতে পারেন। বিয়ের পর স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম হবে, একথা আইন কখনও বলেনি। পাশাপাশি, বাবা-মায়ের প্রতি তার সন্তানদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে এই নিয়ম শিথিল করার জন্যও পার্সি সমাজকে পরামর্শ দেয় আদালত।

● **বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের সম্মেলনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত :**

শহরে হোক বা গ্রামাঞ্চলে, সঙ্গত কারণ ছাড়া লোডশেডিং হলেই এবার দায়টা বর্তাবে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির উপর। সরকারি হোক বা বেসরকারি, বিদ্যুৎ সংস্থাগুলিকে জরিমানা দিতে হবে গ্রাহকদেরকে। তাছাড়াও বিদ্যুৎ চুরি রুখতে বাধ্যতামূলকভাবে স্মার্ট মিটার বসিয়ে দিতে হবে ডিস্ট্রিবিউটারদের। আগামী এপ্রিল থেকেই এই নিয়ম চালুর কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৮ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে সব সময়ের জন্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে গত সেপ্টেম্বরে একটি প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্র। ১৬ হাজার কোটি টাকার সেই 'সৌভাগ্য' প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এপ্রিল থেকে ওই নিয়ম চালুর কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত ৭ ডিসেম্বর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী আর. কে. সিং।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রস্তাবে সব রাজ্যেরই সম্মতি রয়েছে। স্মার্ট মিটারের পাশাপাশি অন্তত ৯০ শতাংশ গ্রাহকের বাড়িতে প্রি-পেড মিটার বসানোর প্রস্তাবেও রাজি হয়েছে সব ক'টি রাজ্য। রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ শুল্কের মধ্যে একটা আপাতসাম্য রক্ষার চেষ্টা হবে বলেও বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও রাজ্যে বিদ্যুৎ শুল্কে রয়েছে ১৯-টি স্তর। তার সরলীকরণ করার হবে।

● **অসবর্ণ দলিত বিয়ের আর্থিক প্রকল্পের নিয়ম বদল :**

দলিতদের অসবর্ণ বিয়ে হলেই মিলবে আড়াই লক্ষ টাকা। চালু থাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কিছুটা রদবদল এনে ৭ ডিসেম্বর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। বাবাসাহেব অম্বেডকরের নামে বর্তমানে চালু থাকা কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুযায়ী, কোনও দলিত মেয়ে কিংবা ছেলে যদি অন্য বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েকে বিয়ে করে, সেক্ষেত্রে সরকারের থেকে তারা এককালীন আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য পেতে পারেন। তবে দম্পতির বাৎসরিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম হলেই এই সুবিধা মিলত। দলিতদের অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দিতেই এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। ভাবা হয়েছিল, বছরে অন্তত পাঁচশো দম্পতিকে এই সুবিধা দেওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্রক এদিন এই প্রকল্পে দু'টি বদল এনেছে। এক, বাৎসরিক আয়ের পাঁচ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে আয় যাই হোক না কেন, দলিত পুরুষ বা মহিলাকে বিয়ে করলে ওই দম্পতি পেতে পারবেন এককালীন আড়াই লক্ষ টাকা। দুই, বর্তমান প্রকল্পে প্রথম বারের বিয়ের ক্ষেত্রেই আর্থিক সুবিধা পাওয়া যেত। হিন্দু বিবাহ আইনে তা নথিভুক্ত করার শর্ত রাখা ছিল। কিন্তু এই নিয়মও শিথিল করা হয়েছে। তবে এবার এই প্রকল্পে নয়া কিছু শর্তও চাপানো হয়েছে। তা হল, সুবিধাপ্রাপকদের আধার নম্বর জানাতে হবে। আধার যোগ-সহ দম্পতির যৌথ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও থাকতে হবে।

● **দু'বছরে রেলের বিদ্যুতের খরচ ৫ হাজার কোটি কমালো :**

বিদ্যুতের খরচ কমিয়েছে ভারতীয় রেল। ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৭-র অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিদ্যুতের বিলের হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে রেলের তরফে। তাতে বলা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে ৫,৬৩৬ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিলের সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। যা চলতি অর্থবর্ষের শেষে ৬,৯২৭ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে টার্গেটের চেয়েও এক হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত সাশ্রয় সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে রেল। পাশাপাশি, আগামী দশ বছরে ৪১ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়ের পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে রেলের তরফে।

বিদ্যুতের খরচ কমাতে এর আগেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। এবিষয়ে রেলের তরফে ওপেন অ্যাকসেস চুক্তি করা হয়। বর্তমানে সাতটি রাজ্য থেকে ওপেন অ্যাকসেস পলিসির মাধ্যমে বিদ্যুৎ আনার ক্ষেত্রে সফল রেলমন্ত্রক। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা এবং কর্ণাটক তথা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের আওতায় পড়া এলাকাগুলি রয়েছে এই তালিকায়। আরও পাঁচ রাজ্য—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও তেলঙ্গানা সম্মত হয়েছে আগামী বছরে ওপেন অ্যাকসেস প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দেওয়ার বিষয়ে। আগামী দিনে এই প্রকল্প সফল হলে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান হবে বলে মত রেলকর্তাদের।

● **সুখোই থেকে ব্রহ্মস ছুঁড়ল ভারত :**

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মস। এবার সুখোই-৩০এমকেআই যুদ্ধবিমান থেকে সফলভাবে নিক্ষিপ্ত হল ব্রহ্মস। গত ২২ নভেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফেই একথা জানানো হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে ভাসমান নির্ধারিত লক্ষ্যে নির্ভুল আঘাত হেনেছে ব্রহ্মস, জানিয়েছে মন্ত্রক। সুখোই-৩০এমকেআই এই মুহূর্তে ভারতের হাতে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধবিমানগুলির অন্যতম। আর ব্রহ্মস শুধু ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের মধ্যেই সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। ভারত-রাশিয়া যৌথ উদ্যোগে এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হয়। নামকরণ হয় ভারতের ব্রহ্মপুত্র ও রাশিয়ার মস্কোভা নদীর নাম সংযুক্ত করে। শব্দের গতির প্রায় তিন গুণ বেগে এই ক্ষেপণাস্ত্র ধেয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে। প্রথাগত বিস্ফোরক বা পরমাণু অস্ত্র নিয়ে আঘাত হানতে পারে ৪৫০ কিলোমিটার দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে।

স্থলভাগ থেকে এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে ব্রহ্মস ছোঁড়া হয়েছিল আগেই। যুদ্ধবিমান থেকেও যাতে ছোঁড়া যায় পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রটি, তার চেষ্টাও চলছিল বছরখানেক ধরে। সেই চেষ্টায় এবার সফল ভারত। সুখোই-৩০এমকেআই যুদ্ধবিমান থেকে ছোঁড়া ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রটি বঙ্গোপসাগরের বুকে নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানে। প্রসঙ্গত, আমেরিকার হাতে থাকা টোমাহক বিশ্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রগুলির অন্যতম। আফগানিস্তান, ইরাক এবং সিরিয়ায় ন্যাটোর বিমানবহর এই ক্ষেপণাস্ত্র সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। তালিবান বা আইএস-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠীর কাছে দুঃস্বপ্নের অন্য নাম হয়ে উঠেছিল ন্যাটোর ওই ক্ষেপণাস্ত্র। কিন্তু টোমাহক সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র নয়। শব্দের চেয়ে বেশি বেগে তা ছোটে না। ভারতের ব্রহ্মস শব্দের বেগের তিন গুণ গতিতে ছোটে। তাই এই ক্রুজ মিসাইল ইতোমধ্যেই গোটা বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিয়েছে। পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্রহ্মসকে স্থল-জল-অন্তরীক্ষ, তিন অবস্থান থেকেই ছুঁড়তে পারবে ভারত।

● **নেতাদের বিচারের জন্য আলাদা আদালত :**

সাংসদ, বিধায়কদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তোলা হবে ১২-টি পৃথক আদালত। সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলায় একথা জানিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। আইনসভাগুলির মোট ১৫৮১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা চলছে বিভিন্ন কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট আগেই কেন্দ্রকে বলেছিল, মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বিশেষ আদালত গড়া হোক এবং এজন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হোক। মামলাগুলি কোন পর্যায়ে রয়েছে, কতগুলি ক্ষেত্রে সাজা হয়েছে, কতগুলি ক্ষেত্রে রেহাই পেয়েছেন নেতারা, কেন্দ্রকে তাও জানাতে বলে শীর্ষ আদালত। সেই প্রেক্ষাপটেই শীর্ষ আদালতে কেন্দ্র ১৩ ডিসেম্বর জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে খোঁজ করেই তথ্য দেওয়া হবে। তবে এই ধরনের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে ১২-টি বিশেষ আদালত গড়া হবে। এজন্য ৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

আইন অনুযায়ী, কোনও মামলায় কমপক্ষে দু'বছরের সাজা হলে কোনও রাজনীতিক ছয় বছরের জন্য ভোটে লড়তে পারেন না। তবে বিজেপি নেতা অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায় জনস্বার্থ মামলা করে আর্জি জানিয়েছিলেন, ছয় বছরের জন্য নয়, সারা জীবনের জন্যই ভোটে দাঁড়ানো বন্ধ হোক দুর্নীতিগ্রস্তদের। কিন্তু সাধারণ আদালতে মামলার ফয়সালায় দেরি হলে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের সুবিধা হয়ে যায়। সেই সুযোগ না দিতেই এবার ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গড়ার সিদ্ধান্ত।

● **'ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন' বিলে সায় মন্ত্রিসভার :**

স্বচ্ছতা নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্নের মুখে পড়েছিল মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (এমসিআই)। ডাক্তারি শিক্ষার পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে

এমসিআই ভেঙে দিয়ে বিকল্প 'ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন' (এনএমসি) গঠনের প্রস্তাব স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জমা পড়েছিল আগেই। গত ১৫ ডিসেম্বর সেই সংক্রান্ত বিলটিতেই সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। চলতি অধিবেশনেই বিলটি সংসদে পেশ হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে এই বৈঠকের পরে রবিশঙ্কর জানান, বিলটি আইনে পরিণত হলে ২০ সদস্যের কমিশনই হবে মেডিকেল শিক্ষার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক। ডাক্তারির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা, মেডিকেল কলেজগুলির অনুমোদন, ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন—ইত্যাদির দায়িত্বে থাকবে চারটি স্বশাসিত বোর্ড। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নীতি আয়োগের সঙ্গে আলোচনা করে গত অক্টোবরে খসড়া বিলটি চূড়ান্ত করে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। মেডিকেল শিক্ষার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটিতে স্বচ্ছতায় জোর দেয় কেন্দ্র সরকার। নয়া মেডিকেল কমিশন আইনে সেই বন্দোবস্তও রাখা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজনে আপিল করা যাবে সরকারের দরজাতেও।

● **ক্যাশভ্যানে হামলা ঠেকাতে নতুন বিধি :**

ক্যাশবাক্স ছিনতাই এবং মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার নৈরাজ্যের কথা মাথায় রেখে এক নতুন বিধি আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। দেশের শহর এলাকায় রাত ৯-টা, গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যা ছ'টা এবং মাওবাদী এলাকায় বিকেল চারটের মধ্যে এটিএম-এর ক্যাশবাক্স ভর্তি করে ফেলার বিষয়ে একটি নির্দেশিকা আনতে চলেছে কেন্দ্র। এব্যাপারে একটি খসড়া প্রস্তাবও তৈরি করে ফেলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। প্রস্তাবটি আপাতত কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। স্থির হয়েছে আগামী জানুয়ারি মাসে এটিএম-এ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সমস্ত নথিভুক্ত বেসরকারি এজেন্সিকে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠানো হবে। খসড়া প্রস্তাবটির শিরোনাম, 'প্রাইভেট সিকিওরিটি এজেন্সিস রেগুলেশন অ্যাক্ট'।

শুধুমাত্র ক্যাশবাক্স ভরার সময় বেঁধে দেওয়াই নয়, আরও কিছু নিরাপত্তাবিধি আরোপ করা হচ্ছে। ক্যাশভ্যানগুলিতে লাইভ জিপিএস ট্র্যাকিং-এর ব্যবস্থা, অন্তত ৩০ দিনের পুরোনো ফুটেজ ধরে রাখা যায় এমন সিসিটিভি রাখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ভ্যানগুলিতে থাকবে হুটার, জরুরি প্রয়োজনের জন্য আলো ও আগুন নেভানোর ব্যবস্থা। গাড়ির চালক এবং ক্যাশবাক্সের দু'জন রক্ষক ছাড়াও থাকবেন অন্তত দু'জন প্রশিক্ষিত সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী। যারা গাড়িতে থাকবেন, তাদের পুরোনো রেকর্ড আগেই খতিয়ে দেখে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের বক্তব্য, গোটা দেশে ৮ হাজারের বেশি ক্যাশভ্যান রয়েছে, যেগুলি প্রতিদিন প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার নোট এটিএম-গুলিতে পৌঁছে দেয়।

● **'মুসলিম মহিলাদের বৈবাহিক অধিকার সুরক্ষা বিল'-এ সায় মন্ত্রিসভার :**

এক দফায় বা অন্য কোনও অবৈধ উপায়ে তিন তালাক দিলে এবার তিন বছরের জেল হবে। এমনই আইন করতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের তালাককে অবৈধ ও অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছে আগেই। কিন্তু এই কাজের জন্য শাস্তির বিধান নেই বর্তমান দণ্ডবিধিতে। এক্ষেত্রে অন্যান্য আইন ব্যবহার করতে হচ্ছিল। সেই ফাঁক পূরণে ফোন, চিঠি, ই-মেল বা মুখে—এক দফায় তিন বার তালাক দেওয়াকে ফৌজদারি অপরাধের তকমা দিয়ে এর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে চলেছে কেন্দ্র। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর দিনেই ১৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সংক্রান্ত 'মুসলিম মহিলাদের বৈবাহিক অধিকার সুরক্ষা বিল'-এ সিলমোহর বসিয়েছে।

বিলে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক তিন তালাক বা 'তালাক-এ-বিদ্দত'-এর ক্ষেত্রেই ফৌজদারি আইন প্রযোজ্য হবে। মৌখিক, লিখিত বা ই-মেল, এসএমএস-এ তিন তালাকও নিষিদ্ধ কাজ ও ফৌজদারি অপরাধের তালিকায় পড়বে। তিন বছরের জেল ও জরিমানার বিধান থাকবে। এমন তালাকের ফলে বিপদে পড়া মহিলারা নিজেদের ও সন্তানের ভরণপোষণের জন্য ভাতা পেতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও দরবার করতে পারবেন। জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া সর্বত্রই এই আইন প্রযোজ্য হবে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টেও তাৎক্ষণিক তিন তালাকের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছিল মোদী সরকার।

● **মুম্বাই-মস্কো করিডোর :**

সতেরো বছর ধরে চেষ্টা চালানোর পরে অবশেষে চালু হতে চলেছে মুম্বাই থেকে মস্কো পণ্য পরিবাহী মাল্টিমোডাল করিডোর। যার পোশাকি নাম 'ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোর'। আশা করা হচ্ছে ২০১৮-র জানুয়ারিতেই এই পথে মুম্বাই থেকে প্রথম বার পণ্য রওনা হবে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে। বিদেশ মন্ত্রকের দাবি, এর ফলে পাকিস্তানকে এড়িয়ে ইউরেশিয়া তথা মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক এবং কূটনৈতিক যোগাযোগ অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে পারবে ভারত। রাশিয়ায় পণ্য পাঠানোর জন্য নির্ধারিত সময় এবং খরচও অনেক কমবে। পাশাপাশি মধ্য এশিয়ায় চিনের প্রভাবকে মোকাবিলা করাও সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক দিকের পাশাপাশি কৌশলগত দিক থেকেও তাই এই করিডোরের গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট।

প্রাথমিকভাবে রাশিয়া, ইরান এবং ভারত, এই তিনটি দেশ মিলে এই পরিবহণ করিডোরের নীল নকশা তৈরি করেছিল। এর পর আরও এগারোটি দেশকেও সঙ্গে নেওয়া হয়, যাদের মধ্যে রয়েছে আর্মেনিয়া, বেলারুশ, আজারবাইজান, কাজাখস্তান। মুম্বাই থেকে আরবসাগর হয়ে জলপথে পণ্য পৌঁছবে ইরানের পারস্য উপসাগরীয় বন্দর আব্বাসে। বন্দর আব্বাস থেকে ইরানের মূল ভূখণ্ড সড়কপথে করিডোরটি যাবে সেদেশেরই বন্দর-ই-আব্বাস-এ। তার পর কাস্পিয়ান সাগর দিয়ে জলপথে ভলগার ধারে আস্ত্রাখানে। আস্ত্রাখান থেকে রেলপথ এবং সড়কপথে মস্কো হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গ।

এই মুহূর্তে ভারত থেকে রাশিয়ায় পণ্য পৌঁছতে সময় লাগে ৪০ দিনেরও বেশি। নতুন করিডোরটি চালু হয়ে গেলে সেই সময় কমে দাঁড়াবে ২৫ দিনে। পরিবহণ খরচও প্রায় ৩৫ শতাংশ কমে যাবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রতি বছরে ৩ কোটি টন পণ্য পরিবহণ করা সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ হাওড়া ও শিয়ালদহ শাখার যাত্রী পরিবহণ ও আয়ের নিরিখে পূর্ব রেল শীর্ষে বলে দাবি রেল কর্তাদের। ২০ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত রেল মন্ত্রকের এক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। রেল সূত্রের খবর, চলতি বছর পূর্ব রেল ২.০৬ কোটি অতিরিক্ত যাত্রী বহন করে আয় করেছে ১৫.৫২ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে যাত্রী পরিবহণ করে রেলের এত টাকা আয় এই প্রথম।

➢ দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়-সহ গঙ্গার সাতটি ঘাট সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এজন্য ৩৪ কোটি টাকা খরচ হবে। গত ১৯ ডিসেম্বর নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংস্কার করা হবে দক্ষিণেশ্বর ঘাট, চাঁদনিঘাট, পঞ্চবটীঘাট, বেলুড়মঠ, মায়েরঘাট-সহ সাতটি। নগরোন্নয়ন দপ্তর ও কেএমডিএ-র তত্ত্বাবধানে সংস্কারের কাজ হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে জানানো হয়, বেলুড়ের পালঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোরও পরিকল্পনা হচ্ছে। পাশাপাশি বাবুঘাট সংস্কারেরও পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। কলকাতা পুরসভাকে এজন্য রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

● **রাজ্য সড়কে টোল :**

জাতীয় সড়কে টোল আদায় চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এবার রাজ্য সড়ক থেকেও টোল তুলতে চাইছে সরকার। তাই টোল নীতি তৈরি করা হচ্ছে। গত ১৯ ডিসেম্বর নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় সড়কের মতো রাজ্য সড়ক থেকে টোল আদায়ের প্রস্তাব কার্যকর করতে টোল নীতির চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করবে পূর্ত দপ্তর। জাতীয় সড়কের টোল নীতি যাচাই করা হয়েছে ইতোমধ্যেই। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যের টোল নীতি তৈরি হবে।

রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ সড়ক উন্নয়ন নিগম নিগমের লক্ষ্য, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নতুন রাস্তা তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি চওড়া করা এবং সড়কে লেনের সংখ্যা বাড়ানো। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রাজ্য সড়ক চওড়া করার কাজও শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে ১৯-টি রাজ্য সড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ৪,৫০০ কিলোমিটার।

নিগমের পরিকল্পনায় ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রয়েছে। যার জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১,২৫০ কোটি টাকা। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর পর্যন্ত ২৭০ কিলোমিটার রাস্তা ধরে উত্তর-দক্ষিণ করিডোর তৈরির জন্য ডিপিআর বা সবিস্তার প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির পরিকল্পনা করেছে নিগম। কোন সড়কে কত দূর অন্তর টোল প্লাজা তৈরি করা হবে, দু'চাকার বাহন, তিন-চাকার গাড়ি, ছোটো-বড়ো বাস, ট্রাক—কার ক্ষেত্রে কত টোল নেওয়া হবে, সবই সবিস্তার জানানো হবে টোল নীতিতে।

● **চিকেন পক্সে মৃত্যুতে এক নম্বরে রাজ্য :**

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত তথ্য বলছে চিকেন পক্সে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে। স্মল পক্স যে ভয়াবহ মারণব্যাধি তা জানাই ছিল। চিকেন পক্সকে বরং নিরীহ ভাবা হ'ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে তথ্য ভুল। রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১৫ সালে দেশে ৪৭,০৯৪ জনের চিকেন পক্স হয়েছিল। মারা গিয়েছিলেন ৪৬ জন। তার মধ্যে ৪০ জনই পশ্চিমবঙ্গের। ২০১৬ সালে ৬১,১১৮ জনের চিকেন পক্স হয়েছিল। মারা যান ৬০ জন। তার মধ্যে ৩৫ জনই পশ্চিমবঙ্গের।

● **জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট-এ পশ্চিমবঙ্গ :**

সামনে এল ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা এনসিআরবি-র চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই রিপোর্ট বলছে, ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দেশে শিশুদের উপর নির্যাতনের হার বেড়েছে ১১ শতাংশ। ২০১৫ সালে শিশুদের উপর নির্যাতনের নথিভুক্ত অভিযোগের সংখ্যা যেখানে ছিল ৯৪ হাজার ১৭২, সেখানে ২০১৬ সালে এসংক্রান্ত ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৫৮-টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। আর এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে পঞ্চম স্থানে। এই বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গ। নথিভুক্ত অভিযোগের ৫০ শতাংশের বেশিই হয়েছে এই পাঁচ রাজ্যে। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ রয়েছে প্রথম স্থানে (১৫ শতাংশ), দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র (১৪ শতাংশ) ও তৃতীয় মধ্যপ্রদেশ (১৩ শতাংশ)।

গত এক দশকে দেশে শিশুদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের চিত্র উঠে এসেছে ক্রাই বা চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ-এর রিপোর্টেও। তথ্য জানাচ্ছে, ২০০৬ সাল থেকে ২০১৬-র মধ্যে শিশুদের উপর নির্যাতনের হার বেড়েছে ৫০০ শতাংশ। ২০০৬ সালে ১৮ হাজার ৯৬৭-টি অভিযোগের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। ২০১৬ সালে নথিভুক্ত অভিযোগের ৪৯ শতাংশই নথিভুক্ত হয়েছে অপহরণের আওতায়। ধর্ষণের অভিযোগের হার ১৮ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে মোট ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫৬৯ জন শিশুর নিরুদ্দেশ হওয়ার অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ৪১ হাজার ১৭৫ জন ছেলে ও ৭০ হাজার ৩৯৪ জন মেয়ে। নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় প্রথম স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৬ সালে এরাজ্য থেকে মোট ৫৫ হাজার ৯৪৪ জন শিশুর নিরুদ্দেশ হওয়ার অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে।

সার্বিক অপরাধের নিরিখে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ কিংবা দিল্লি এখনও এগিয়ে থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গ যে দেশের অন্য রাজ্যের নিরিখে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এক নম্বরে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর বাৎসরিক সমীক্ষা। গত বছর ছিল দ্বিতীয় স্থানে। এবার সবাইকে টপকে মানব ও শিশু পাচারে দেশের মধ্যে এক নম্বরে উঠে এল পশ্চিমবঙ্গ। রিপোর্ট অনুযায়ী, গোটা দেশের ৪৪ শতাংশ মানব পাচারের ঘটনা (৩৫৭৯-টি) ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। যাদের অধিকাংশই কিশোরী ও তরুণী। ওই তরুণীদের অধিকাংশকে নামানো হয়েছে যৌন ব্যবসায়। বাদ যাচ্ছে না শিশুরাও। গোটা দেশ গত এক বছরে যে ১,১১,৫৬৯-টি শিশু নিখোঁজ হয়েছে, তার ১৫ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গের।

এক দিকে পাচার আর অন্য দিকে স্বামী-শ্বশুরবাড়িতে নিগ্রহের প্রশ্নেও এক নম্বরে রাজ্য। গোটা দেশে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির হাতে অত্যাচারের যে ১.১০ লক্ষের সামান্য বেশি অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে ১৯,৩০২-টি অভিযোগ। যা গোটা দেশের প্রায় ১৮ শতাংশ। সার্বিকভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রশ্নে গোটা দেশে রাজ্য দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও, জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট (২০১৬) বলছে, গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গের গৃহবধূরাই সব থেকে বেশি ঘরোয়া হিংসার শিকার হয়েছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, গত এক বছরে গোটা দেশেই মহিলাদের উপরে অত্যাচারের ঘটনা প্রায় ২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ধর্ষণ বা মহিলাদের অপহরণের ঘটনায় যথাক্রমে এক নম্বরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, সার্বিক অপরাধের খতিয়ানে গত এক বছরে প্রথম স্থানে পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র। তবে, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট-এ পশ্চিমবঙ্গে অপরাধের সংখ্যা বেশি হলেও এর একটি ভালো দিকও রয়েছে বলেই মনে করছেন ব্যুরোর আধিকারিকেরা। তাদের মতে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে; বহু রাজ্যে তাও হয় না।

● **'স্মার্ট ফিশ' অ্যাপ :**

নতুন যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার বদলাচ্ছে রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমও। নিছকই রকমারি মাছ উৎপাদনে আটকে না-থেকে বছর তিনেক হল খুচরো বিপণনে ঢুকে পড়েছে তারা। নিগমের

নতুন উদ্যোগ এবার মোবাইল অ্যাপ। অ্যাপের সৌজন্যে ঘরে বসে অনলাইন বাজার করা এখন জলভাত। রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমের কর্তাদের দাবি, তাদের খুচরো কারবারের ২০ শতাংশই অনলাইনে চলে। বাজার করার দু'তিনটি অ্যাপের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় পসার আরও বেড়েছে। নতুন অ্যাপটির নাম 'স্মার্ট ফিশ'। তার লোগো ও কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছে। ৫ জানুয়ারি রাজ্য মৎস্য উৎসবে এই প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা।

মৎস্য দপ্তর সূত্রের খবর, ২৭ রকমের তাজা মাছ, ১৫ রকমের হিমায়িত প্যাকেট-বন্দি মাছের তালিকায় রয়েছে কিছু বিদেশি মাছও। রুই-কাতলা-মৃগেল-ভেটকি-চিংড়ি-শিঙি-ফ্যাসা-শোল-আড়-বোয়াল-গুগলি থেকে এরাজ্যে চাষ করা ভিন্‌দেশি কোবিয়া, প্যামপিনো, চ্যানোজও থাকবে। জোগাড় করা হবে ইলিশও। আর থাকবে নিগমের শুঁটকি, 'রেডি টু ফ্রাই' মাছের পদ। নিগম-কর্তৃপক্ষের দাবি, নলবন ফুড পার্ক, বিকাশ ভবন, রাজারহাটের নবদিগন্ত মার্কেট, নবান্ন, বিধানশিশু উদ্যান, সন্তোষপুরের আউটলেট, এন্টালি মার্কেট-ফুলবাগানের পুরসভার বিপণি থেকে বেলগাছিয়া-রাজবল্লভ পাড়া-সহ শহরের সাতটি জায়গায় নিগমের গাড়ি থেকে অ্যাপ-এর অর্ডারে মাছ সরবরাহ করা হবে। কেউ অর্ডার করার ছ'ঘণ্টার মধ্যে আউটলেট থেকে মাছ নিয়ে যেতে পারবেন। কেউ অনলাইনে টাকা মিটিয়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে মাছ তুলতেও পারবেন। প্রথম তিন মাস, হোম ডেলিভারির সুবিধে মিলবে, সল্ট লেক টাউন-রাজারহাট-নিউ টাউনে। সকাল ১০-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত মিলবে পরিষেবা।

নিগমের দাবি, গত পাঁচ বছরে পরিকাঠামোর উন্নয়নের ফলে তাদের হেক্টরপিছু মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে ৬০ শতাংশ। নিজস্ব মাছের ভাঁড়ারের জন্যই অন্যান্য অ্যাপের থেকে সস্তায় মাছ দিতে পারবে তারা। তিন বছরে নিগমের খুচরো ব্যবসা ৭৪ লক্ষ থেকে এখন সওয়া দু'কোটি টাকা।

● **কলকাতা বিমানবন্দরে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন :**

গত ৫ ডিসেম্বর কলকাতা বিমানবন্দরে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রী অশোক গজপতি রাজু। মন্ত্রী জানান, এখন দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরের মোট ১৩৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে কলকাতায় সব থেকে বেশি। আগামী এক বছরের মধ্যে সারা দেশে ২০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ তৈরির লক্ষ্য রয়েছে।

কলকাতা বিমানবন্দরের প্রধান রানওয়ের পূর্বে অব্যবহৃত ৬৭ একর জমিতে ১৫ মেগাওয়াটের এই সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পটি তৈরি হয়েছে। প্রতিটি বিমানবন্দরের এয়ারসাইডে (যেখানে বিমান ওঠানামা করে এবং দাঁড়ায়) বিভিন্ন ধরনের গাড়ি নিয়মিত যাতায়াত করে। এথেকেও ছড়ায় দূষণ। আগামী দিনে এয়ারসাইডের সমস্ত গাড়ি ব্যাটারিচালিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এক মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ তৈরি করতে এক হাজার টন কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। ফলে ১৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ সেই দূষণ অনেকটাই কমাতে সক্ষম হবে। কলকাতার নতুন টার্মিনালের ছাদে ইতোমধ্যেই দু'মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই ১৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কলকাতা বিমানবন্দরের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সিইএসসি-কে সরাসরি বিক্রি করবে কর্তৃপক্ষ। সেই খাত থেকে বছরে ১৫ কোটি টাকা রোজগারও হবে কলকাতা বিমানবন্দরের। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে ৯০ কোটি টাকা খরচ করে শুরু এই প্রকল্পের রূপায়ণ নিয়ে প্রথমে ধন্দ ছিল। মনে করা হয়েছিল, সৌর বিদ্যুৎ করার জন্য যে চকচকে প্যানেল বসাতে হয়, তার উপরে সূর্যের আলো পড়ে বিচ্ছুরণের কারণে বিমান ওঠা-নামার সময়ে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু সবদিক পরীক্ষা করে সারা দেশে ৪৫ হাজারটি সৌর প্যানেল বসানোর অনুমতি দেন ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশনের কর্তারা।

● **স্কুল পড়ুয়াদের যৌন হেনস্থা রুখতে কমিটি গড়ার নির্দেশ :**

ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং যৌন হেনস্থা রুখতে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে কমিটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। একই সঙ্গে সব স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশিকাও জারি করে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'স্টুডেন্টস সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি কমিটি' নামে প্রস্তাবিত ওই কমিটির শীর্ষে থাকবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা। সদস্য হিসেবে থাকবেন স্কুলের সবথেকে সিনিয়র শিক্ষিকা, দু'জন অভিভাবক প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক। যদি কোনও স্কুলে সিনিয়র শিক্ষিকা না থাকেন, সেক্ষেত্রে সিনিয়র শিক্ষককে রাখা যাবে। অভিভাবক প্রতিনিধিরা মহিলা হলে ভালো। না হলে অন্তত একজন মহিলা রাখতেই হবে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি' যেরকম কাজ করে, অনেকটা সেভাবেই কাজ করবে ওই কমিটি। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনওভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছে কি না, তারা নিয়মিত ভিটামিন ট্যাবলেট খাচ্ছে কি না, শিক্ষক-শিক্ষিকারা কোনও পড়ুয়ার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন কি না, মিড-ডে-মিল কেমন চলছে—এসব তদারক করাই হবে ওই কমিটির মূল কাজ। অভিভাবকেরা তাদের বক্তব্য লিখিতভাবে ওই কমিটির কাছে জানাতে পারবেন। সরকারি নির্দেশে জানানো হয়েছে, কমিটি প্রতি দু'মাস অন্তর বৈঠক করে সংশ্লিষ্ট জেলার স্কুল পরিদর্শকের কাছে রিপোর্ট পাঠাবে।

● **স্কুলশিক্ষা দপ্তরের নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি :**

সম্প্রতি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কনফার্মেশন, কনডাক্ট অ্যান্ড ডিসিপ্লিন অব টিচার্স অ্যান্ড নন-টিচিং স্টাফ) রুলস ২০১৭' নামে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। তাতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগপত্র দেওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অধিকারই স্কুল পরিচালন সমিতির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হাতে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ২৪ দফা আচরণবিধিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের ব্যাখ্যা, এবার থেকে কোনও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ সরাসরি পৌঁছবে পর্ষদে। চাকরির দু'বছরের মধ্যে পুলিশের থেকে শংসাপত্র ও শারীরিক সক্ষমতার প্রমাণপত্র নিয়ে পর্ষদে জমা দিতে হবে। প্রতিবছর সম্পত্তির হিসেবও দিতে হবে পর্ষদে। সেই সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের শাস্তিবিধানের অধিকারও দেওয়া হয়েছে পর্ষদের হাতে।

● **বিদ্যুৎ লোকসান কমাতে পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় রাজ্য :**

বিদ্যুৎ পরিবহণ ও চুরির ফলে ক্ষতি আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে। ওই লোকসান কম হওয়ার নিরিখে রাজ্যের স্থান পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয়। ঝাড়খণ্ডের ঠিক পরেই। কিন্তু কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুর মতো দক্ষিণী রাজ্যগুলির তুলনায় এবিষয়ে এখনও অনেক পিছনে পশ্চিমবঙ্গ। সম্প্রতি সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (সিইএ) ২০১৩-'১৪ থেকে ২০১৫-'১৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ মন্ত্রককে এই সংক্রান্ত যে

তথ্য পেশ করেছে, তা থেকে এমন ছবিই উঠে আসছে। দেখা যাচ্ছে, ক্ষতির নিরিখে পূর্বাঞ্চলে সব রাজ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে বিহার। সেখানে বিদ্যুৎ পর্ষদের অর্ধেক টাকাও আদায় হচ্ছে না গ্রাহকদের কাছ থেকে। ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে 'ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন লস', অর্থাৎ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার পরে ঝাড়খণ্ডের আর্থিক লোকসান প্রায় ১৭ শতাংশ। সেখানে বিহার এবং ওড়িশা যথাক্রমে ৪৯ ও ৩৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে তা ২২ শতাংশের বেশি। যা আগের দু'বছরের থেকে সামান্য কম হলেও, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির ক্ষতির বহরের থেকে অনেক বেশি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, পরের আর্থিক বছরগুলিতেও এই ছবি একেবারে আমূল বদলায়নি। দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে ক্ষতির হার নেমে এসেছে ১০ শতাংশের আশেপাশে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, পুদুচেরিও সেই পথে হাঁটছে। যেখানে সারা দেশে গড় ক্ষতি ২২ শতাংশের কাছাকাছি।

তবে বিহার, ওড়িশার মতো ১২-টি রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে গিয়ে সরকারি সংস্থাগুলি নাজেহাল। বিপুল ক্ষতি মাথায় নিয়ে এবং ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে তাদের বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে হচ্ছে। নির্ভর করতে হচ্ছে সরকারি ভরতুকির উপরে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তার তুলনায় কিছুটা ভালো হলেও, এখানেও রাজস্ব ক্ষতি এখনও তুলনামূলকভাবে বেশি। সাধারণত বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির দু'ভাবে ক্ষতি হয়। একটি হচ্ছে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে গিয়ে তা চুরি, পরিবহণজনিত ক্ষতি ইত্যাদি। অন্যটি ভুল মিটার রিডিং-সহ বিল আদায় না হওয়া। এই সমস্ত কিছুই আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, পুরোনো যন্ত্রাংশ ব্যবহার, দীর্ঘ তার, পুরোনো সাবস্টেশন, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি কারণে এধরনের ক্ষতি বাড়ে।

● **রাজ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন এজেন্সি :**

পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে আগ্রহী দক্ষিণ কোরিয়া। বিশেষত ছোটো-মাঝারি শিল্পে। গত ১১ ডিসেম্বর কলকাতায় দক্ষিণ কোরিয়া ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন এজেন্সি-র নতুন অফিস উদ্বোধনে এসে একথা জানান দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সংস্থার সভাপতি হানসু পার্ক। একই সঙ্গে তার দাবি, বড়ো শিল্পে লগ্নির সুযোগ এলে, তাও তারা খতিয়ে দেখবেন। রাজ্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব-ভারতে লগ্নির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চায় দক্ষিণ কোরিয়া। সেই লক্ষ্যেই এই দপ্তর। ভারতে পঞ্চম। বাকিগুলি দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরুতে। পার্ক জানান, কলকাতা অফিসের আওতায় পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১৬-টি রাজ্য থাকবে। যেসব ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া শিল্প গড়তে আগ্রহী, তার মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খনি, জাহাজ তৈরি এবং মেরামত ইত্যাদি। ইতোমধ্যেই কোরিয়ার বিভিন্ন সংস্থা ভারতে গাড়ি এবং বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬০০ কোটি ডলার ঢেলেছে।

● **কেন্দ্রের চিকিৎসা-ব্যয় সংক্রান্ত রিপোর্টে ভালো ফল রাজ্যের :**

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যত খরচ হয়, অন্য রাজ্যের গ্রামের সেই খরচটা তুলনায় অনেক বেশি। গোটা দেশের মধ্যে গুজরাতের গ্রামবাসীদেরই চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ করতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে ওই রিপোর্ট। কেন্দ্রের 'সেন্ট্রাল ব্যুরো অব হেলথ ইন্টেলিজেন্স'-এর ওই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গুজরাত ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, অসম, মধ্যপ্রদেশের মতো বেশ কিছু রাজ্যের চেয়েই পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতালে ভর্তির খরচ কম। অর্থনীতিবিদেরা বলেন, রাতারাতি কোনও মানুষকে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত স্তরে নামিয়ে আনার অন্যতম কারণ হতে পারে চিকিৎসার খরচ।

রিপোর্ট বলছে, সারা দেশের নিরিখে একজন রোগীর হাসপাতালে ভর্তির গড় খরচ গ্রামাঞ্চলে গড়ে ১৭ হাজার টাকা এবং শহরাঞ্চলে মোটামুটি ২৬ হাজার টাকা। সরাসরি চিকিৎসার খরচ এবং তার আনুষঙ্গিক খরচ—দু'টিই এর অন্তর্ভুক্ত। গুজরাতে এই খরচ রোগীপিছু ৩২ হাজার টাকারও বেশি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা হলে সাড়ে ১০ হাজার টাকার মতো গড়ে খরচ হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের একটি কেন্দ্রীয় রিপোর্ট জানিয়েছিল, গ্রামীণ গুজরাতে প্রয়োজনের তুলনায় সার্জেনের ঘাটতি ৯০ শতাংশ, স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের ঘাটতি ৯৫ শতাংশ।

তবে শহরাঞ্চলে চিকিৎসা-খরচ পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে একটু হলেও কম গুজরাতে। সেরাজ্যে রোগীপিছু তা প্রায় সাড়ে ২৬ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার টাকা। এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি খরচসাপেক্ষ অসম। শহরাঞ্চলে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ পশ্চিমবঙ্গ বা গুজরাতের থেকে বেশ অনেকটাই কম কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ বা দিল্লিতে।

● **রাজ্য হেরিটেজ তালিকায় রামকৃষ্ণপুর ঘাট :**

শিকাগো থেকে ফেরার প্রায় এক বছর পরে নৌকায় হাওড়ার একটি গঙ্গার ঘাটে নেমেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত সেই 'রামকৃষ্ণপুর ঘাট' (অধুনা চিন্তামণি দে ঘাট) এবার স্থান পেল রাজ্যের হেরিটেজের তালিকায়। হাওড়ার স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশতবর্ষ জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করে ওই ঘাটকে হেরিটেজ ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন। কয়েক মাস আগে কমিটি প্রস্তাবটি দেয়। কমিশন সব দিক বিচার-বিবেচনা করে রামকৃষ্ণপুর ঘাটটি হেরিটেজ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য ছিলেন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর লেনের নবগোপাল ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি স্বামীজীকে অনুরোধ করেন, তার বাড়িতে গুরুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। সেজন্যই ১৮৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, মাঘী পূর্ণিমায় ১৫ জন সন্ন্যাসীকে নিয়ে বেলুড় মঠ থেকে নৌকায় রামকৃষ্ণপুর ঘাটে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি নবগোপালবাবুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ফেরার সময়ে স্বামীজী তার ব্যবহৃত সিল্কের পাগড়ি ও কিছু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য দিয়ে আসেন সেখানে। এখনও প্রতি বছর ওই দিনে বেলুড় মঠ থেকে সন্ন্যাসীরা একইভাবে নবগোপালবাবুর বাড়িতে যান।

● **নামছে নতুন ১৬০-টি সরকারি বাস :**

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে উত্তরবঙ্গ—সর্বত্রই বাড়তি বাস দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সরকারি সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলিতে আপাতত ১৬০-টি নতুন সরকারি বাস দেওয়া হচ্ছে। ৫০ আসনের প্রতিটি নন-এসি বাসের দাম পড়ছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। এর জন্য টাকা বরাদ্দ করেছে সরকার।

রাজ্য পরিবহণ নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের অধীনে থাকা তিনটি সরকারি সংস্থা পাচ্ছে ১০০-টি বাস। বাকি ৬০-টি বাসের মধ্যে কিছু পাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ আর কিছু যাবে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণে। পরিবহণ নিগমের বাসগুলি চলবে হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, দুই ২৪ পরগণার মধ্যে। কলকাতাতেও কিছু দেওয়া হবে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসগুলি চলাচল করবে পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া এলাকায়।

অর্থনীতি

- রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চিহ্নিত করা বিপুল পরিমাণ ঋণখেলাপি অ্যাকাউন্টকে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি) পাঠাবে ব্যাঙ্কগুলি। যাতে তাদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আগস্টে এরকম ২৮-টি সংস্থার অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বকেয়া ঋণের প্রায় ১.৪ লক্ষ কোটি টাকার খাতক এরা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ ছিল, হয় ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্থাগুলির অনুৎপাদক সম্পদের সমস্যা মেটাতে হবে, না হলে তাদের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এনসিএলটি-তে পাঠাতে হবে। নিয়ম অনুসারে, এনসিএলটি-তে গেলেও অ্যাকাউন্টগুলির ঋণের ৫০ শতাংশ ব্যাঙ্কগুলিকে তুলে রাখতে হবে।
- কালো টাকা লেনদেন প্রতিরোধ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে 'অসাংবিধানিক' বলে খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি রোহিংটন ফলি নরিম্যান ও বিচারপতি সঞ্জয় কিশন ক'লের বেঞ্চের রায়, ওই আইনের ৪৫ নম্বর ধারায় জামিন পাওয়ার জন্য জোড়া শর্ত চাপানো রয়েছে। আর তাতে জামিন পাওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নোট বাতিলের পর থেকে এই 'প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট'-কেই প্রধান হাতিয়ার করেছিল কেন্দ্র সরকার। যেসব ভুয়ো সংস্থার বিরুদ্ধে কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ বা যাদের হেফাজত থেকে পুরোনো নোট উদ্ধার হয়েছে, তাদের জেলে পুরতেও এই আইনই প্রধান অস্ত্র।

● **'ফিনান্সিয়াল রিজলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনশিয়োরেন্স'-এর খসড়া বিল :**

ব্যাঙ্কে জমানো টাকা আরও সুরক্ষিত রাখতে নতুন আইন আনার তোড়জোড় করছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। বড়ো মাপের কোনও ব্যাঙ্ক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হওয়ায় যাতে দেশের অর্থনীতি নড়বড়ে না হয়, তা নিশ্চিত করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। ২০০৮ সালে আমেরিকায় নামী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় যেভাবে বিশ্বজোড়া মন্দা শুরু হয়েছিল, তেমন ঘটনা ভারতে হওয়া রুখতে চায় কেন্দ্র। নতুন আইনে জোর দেওয়া হচ্ছে দেউলিয়া হওয়া আটকানোর উপরেই। অর্থাৎ, ব্যাঙ্ক যাতে দেউলিয়া না হয়, সেদিকেই গোড়ায় নজর দেওয়া হবে। ফিনান্সিয়াল রিজলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনশিয়োরেন্স (২০১৭)-এর খসড়া বিলে ফিনান্সিয়াল রিজলিউশন কর্পোরেশন (এফআরসি) তৈরির কথা বলা হয়েছে। আর্থিক স্বাস্থ্য বিচার করে তারাই বলবে ব্যাঙ্ক বিপদসীমার কাছে কি না। সেক্ষেত্রে প্রথমে সরকার হস্তক্ষেপ করবে। তার পরেও দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে গেলে, তবেই 'বেইল-ইন' করার প্রশ্ন উঠবে।

● **বাজেটের বাইরে অতিরিক্ত দ্বিতীয় দফার ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাব :**

একশো দিনের কাজে আরও বরাদ্দ বাড়াল কেন্দ্র সরকার। গত ১৯ ডিসেম্বর সংসদে বাজেটের বাইরে অতিরিক্ত দ্বিতীয় দফার ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাব পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। অর্থমন্ত্রী মোট ৬৬,১১৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ করছেন, যার মধ্যে ৪,৮০০ কোটি একশো দিনের কাজের প্রকল্পে। গরিবদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে নতুন সাজে চালু হওয়া 'প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা'-র জন্যও প্রায় ১,০৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বাড়তি খরচের প্রায় অর্ধেকটাই আসবে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের সঞ্চয় থেকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে পুঁজি জোগাতে অবশ্য এই দফায় অর্থবরাদ্দ হচ্ছে না। বদলে চাষি ও গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের জন্য বাড়তি ঋণের বন্দোবস্ত করতে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ২১২ কোটি ঢালছে কেন্দ্র। তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানার ঋণ, সুদ মকুব ও সার পরিবহণে ভরতুকির জন্যও বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২০,৫০০ কোটি।

● **ঊর্ধ্বমুখী বৃদ্ধির হার :**

পর পর ৫-টি কোয়ার্টারে ধস নামার পর কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হল দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার। সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া কোয়ার্টারে সেই হার দাঁড়িয়েছে ৬.৩ শতাংশ। এপ্রিল থেকে জুনে, তার আগের কোয়ার্টারে এই হার ছিল ৫.৭ শতাংশ। যা গত তিন বছরে সবচেয়ে কম। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের ৪-টি কোয়ার্টারেই GDP-র হার পড়ে। গত ৫ বছরের গড় বৃদ্ধির হারের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১২-'১৩ সালে তা ছিল ৫.৬ শতাংশ, ২০১৩-'১৪-এ ৬.৬ শতাংশ, ২০১৪-'১৫-এ ৭.২ শতাংশ, ২০১৫-'১৬-এ ৭.৯ শতাংশ আর গত অর্থবর্ষে (২০১৬-'১৭) তা ছিল ৭.১ শতাংশ। যদিও মুডি'জ রেটিং-এর পূর্বাভাস, আগামী অর্থবর্ষে গড় বৃদ্ধি হার ৭.৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। আর গোল্ডম্যান স্যাক্সের অনুমান, তা হবে ৮ শতাংশ।

● **ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ইতিবাচক, বলছে রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট :**

রাষ্ট্রপুঞ্জের এক রিপোর্টে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার (GDP) ইতিবাচক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন প্রসপেক্টস' শীর্ষক ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৮-এ ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার হবে ৭.২ শতাংশ ও ২০১৯-এ তা হবে ৭.৪ শতাংশ। পাশাপাশি, নোট বাতিল এবং জিএসটি-র প্রভাব নিয়েও ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে রিপোর্টটিতে। গোটা বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার যে পরিকাঠামোগত সংস্কার কেন্দ্র সরকার করেছে, তাতে বিনিয়োগ তো বেড়েছেই, সাধারণ মানুষও নিজের জন্য মুক্তহস্তে খরচ করতে পারছেন। এর ফলেই আগামী বছর বৃদ্ধির হার বাড়তে পারে। পাশাপাশি, আগামী বছর ভারতের রাজস্ব ঘাটতি ৩.২ শতাংশে থাকবে বলে রাষ্ট্রপুঞ্জের ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

● **মিনারেল ওয়াটার বিক্রি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় :**

সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (এমআরপি)-র বেশি দামে মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করতে পারবে হোটেল, রেস্তোরাঁ বা মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। গত ১২ ডিসেম্বর এমনই রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে একটি হলফনামায় কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, এমআরপি-র বেশি দামে মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করলে আইনভঙ্গকারীর জরিমানা বা জেল বা দুটোই হতে পারে। তবে সেই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি রোহিংটন এফ. নরিমানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা মাল্টিপ্লেক্সগুলি এমআরপি-র বেশি দামে মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে না কেন্দ্রীয় সরকার। সেক্ষেত্রে পরিমাপ আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও কোনও মামলা রুজু করতে পারবে না সরকার।

ফেডারেশন অব হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (এফএইচআরএআই)-র আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টে ওই হলফনামা দাখিল করে কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক। ওই হলফনামায়

মন্ত্রক জানিয়েছিল, প্যাকেটজাত দ্রব্যের মুদ্রিত দামের অতিরিক্ত দাম নেওয়া আইনত দণ্ডনীয়। পরিমাপ আইনের ৩৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, প্রথম বার এধরনের অপরাধে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। দ্বিতীয় বার একই অপরাধে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৫০ হাজার টাকা। এবং তৃতীয় বা তার বেশি বার এই আইন ভাঙলে তাতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা এক বছরের জেল অথবা এক সঙ্গে দুই শাস্তিই হতে পারে। ২০১৫-র আগস্টে দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, ২০০৯-এর আইনের আওতায় প্যাকেটজাত মিনারেল ওয়াটারের দামের এমআরপি-এর অতিরিক্ত নিলে হোটেল রেস্তোরাঁগুলির বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে সরকার। সেই রায়ের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে আবেদন করে এফএইচআরএআই। যদিও তা নাকচ করে দেয় আদালত। এর পরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় এফএইচআরএআই। সেই মামলাতেই ওই হলফনামা দাখিল করে কেন্দ্র।

● **সুদের হার অপরিবর্তিত :**

দু'দিনব্যাপী ঋণ নীতি পর্যালোচনার শেষে ৬ ডিসেম্বর মূল্যবৃদ্ধিকে মাত্রা ছাড়া হতে না দেওয়ার উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তা করতে গিয়ে এদফায় ফের একই জায়গায় ধরে রাখল সুদের হার। এদিন রেপো রেট (যে হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে ধার নেয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক) ৬ শতাংশেই ধরে রেখেছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। গভর্নর উর্জিত প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের ঋণ নীতি কমিটি এনিয়ে টানা দু'বারের পর্যালোচনায় সুদ একই রাখার সিদ্ধান্ত নিল। রিভার্স রেপো রেট (আরবিআই যে হারে ধার নেয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের থেকে) বেঁধে রাখা হয়েছে ৫.৭৫ শতাংশে। সম্প্রতি যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ফের মাথা তুলছে এবং রাজকোষ ঘাটতি লাগামছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দানা বেঁধেছে, তাতে শীর্ষ ব্যাঙ্কের সুদ অপরিবর্তিত রাখার নীতিই বাস্তবসম্মত। শীর্ষ ব্যাঙ্ক নতুন করে চলতি অর্থবর্ষের বৃদ্ধির পূর্বাভাসে রদবদল করেনি। এবারও তা ৬.৭ শতাংশেই রেখেছে। অর্থনীতির অবস্থা তেমন সঙ্গিন নয় জানিয়ে, আগামী দিনে সুদ কমানোর দরজা খুলে রাখার ইঙ্গিতও দিয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক।

● **জেএনপিটি সেজ পাচ্ছে ৬০ হাজার কোটি লগ্নি :**

দেশের বৃহত্তম পণ্য পরিবহণ বন্দর জেএনটিপি-র লাগোয়া বিশেষ আর্থিক অঞ্চলে (এসইজেড বা সেজ) ৬০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে বলে জানান কেন্দ্রীয় জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রী নিতিন গডকড়ী। গত ৯ ডিসেম্বর এক আলোচনা সভার মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, রপ্তানির লক্ষ্যে ২৪-টি সংস্থা ইতোমধ্যেই জেএনপিটি সেজ-এ পা রাখতে চেয়েছে। যার হাত ধরে তৈরি হবে ১.২৫ থেকে ১.৫০ লক্ষ কর্মসংস্থান।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলটির শিলান্যাস করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তখনই এই সূত্রে দেড় লক্ষ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের কথাও বলে সরকার। মুম্বই ও তার শহরতলি দিয়ে পণ্য পরিবহণের ভিড় হাল্কা করতেই নিকটবর্তী ভাসাইয়ে এই সেজ তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল বন্দরমন্ত্রক। যেখান থেকে পণ্য সরাসরি জেএনপিটি-র বার্জে পাঠানো যাবে। সেজটি ছড়ানো প্রায় ২৭৭ হেক্টর জুড়ে। এখন সেখানে ৪,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করছে জেএনপিটি।

● **নেট নিরপেক্ষতার পক্ষে ভারত, উলটো পথে আমেরিকা :**

বছর দেড়েক সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত শোনার পরে শেষ পর্যন্ত নেট নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষেই সুপারিশ করল এদেশের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ট্রাই। ইন্টারনেট পরিষেবা একটি মুক্ত মঞ্চ। সেখানে সকল গ্রাহকের সমান অধিকার। সেই সম অধিকার বা নেট নিরপেক্ষতা (নেট নিউট্রালিটি) বজায় রাখার পক্ষেই সওয়াল করল তারা। জানাল, ইন্টারনেট পরিষেবা সংস্থাগুলি এ নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে কোনও বৈষম্য করতে পারবে না। বছর কয়েক আগে অভিযোগ ওঠে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো ভারতেও গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি করছে কিছু ইন্টারনেট পরিষেবা সংস্থা। এ নিয়ে তখন সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় ২০১৬ সালে ফেসবুক, এয়ারটেলের মতো সংস্থাগুলিকে (যারা বিশেষ সুবিধা চালু করেছিল) ভিন্ন মাসুল হার স্থির করতে নিষেধ করে ট্রাই। শুরু হয় সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত জানতে আলোচনা। গত ২৯ নভেম্বরের সুপারিশ তার পরেই।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতে যে দিন ট্রাই নেট নিরপেক্ষতার পক্ষে মত দিল, তার আগের দিনই আমেরিকায় নেট নিরপক্ষেতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনেছেন সেদেশের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কমিশনের চেয়ারম্যান অজিত পাই। বেশ কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে নেট নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ২০১৫ সালে নতুন নিয়ম জারি হয় মার্কিন মুলুকে। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মনোনীত পাই সেই নিয়ম বাতিলের প্রস্তাব দিয়েছেন। ১৪ ডিসেম্বর কমিশনের বৈঠকে ওই প্রস্তাব নিয়ে ভোট হয়। এর পর ওই নিয়ম প্রত্যাহারের কথা জানায় এফসিসি। ২০১৫ সালে বারাক ওবামার প্রশাসন নেট নিরপেক্ষতার নীতি চালু করে। তা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেন এফসিসি চেয়ারম্যান অজিত পাই। যা ৩-২ ভোটে জিতে যায়। মার্কিন আইনসভার স্পিকার পল রায়ানের দাবি, এতে নাকি টেলি-মেডিসিন, দূর শিক্ষা ইত্যাদি নতুন দিশা পাবে।

গ্রাহকদের অধিকার নিয়ে এখন দু'ভাগ দুনিয়া। এক পক্ষের মতে, এখানে সব গ্রাহকের অধিকার সমান, বৈষম্য তাই অনৈতিক। অন্য পক্ষের দাবি, বাড়তি সুবিধায় গ্রাহকের নেট পরিষেবা বিঘ্নিত হয় না। বরং টেলিকম শিল্পের আয় বাড়ে। যা দিয়ে নতুন পরিকাঠামো গড়ে আরও বেশি গ্রাহকের কাছে নেট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। নিয়ন্ত্রণের রাশ আলগা হলে উদ্ভাবনও সহজ হয়। ভারতে এখনও প্রথম পক্ষের পাল্লা ভারী, এফসিসি অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের পাশে দাঁড়াল।

নেট নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা : ইন্টারনেট অনেকটা সেই রাস্তার মতো যা দিয়ে জোড়া যায় দুনিয়ার সমস্ত কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কিংবা মোবাইল। ওই রাস্তার উপর সমস্ত গ্রাহকের অধিকারও সমান। কাউকে তার কোনও অংশ ব্যবহারে সাধারণত বাধা দেওয়া চলে না। কিছুটা এই কারণেই আমরা নেট বেয়ে যাতায়াত করা তথ্য (ডেটা) ব্যবহারের জন্য টাকা গুনি। কিন্তু রাস্তার 'টোল' গুনি না। সহজ কথায় এটিই নেট নিরপেক্ষতা।

বিতর্ক যা নিয়ে : ধরা যাক, একটি নেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা নির্দিষ্ট কিছু পরিষেবা তার গ্রাহকদের জন্য চিহ্নিত করল। এবং হয়তো বলল, শুধু ওই 'ক', 'খ', 'গ' এবং 'ঘ' পরিষেবার গোছা তাদের কাছে নিলে মিলবে বাড়তি সুবিধা। তা সে দ্রুতগতির নেট হতে পারে কিংবা কম মাসুলের (এমনকী নিখরচার) সুবিধা। অর্থাৎ, ওই নেটের রাস্তায় অন্যদের তুলনায় বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন তারা। অন্য দিক থেকে দেখলে, বাকিরা কিছুটা বঞ্চিত। বিতর্কের শিকড় এখানেই।

● **পঞ্চদশ অর্থ কমিশন :**

পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি চালুর পরে কেন্দ্র ও রাজ্যের আয়ের ধারাটাই বদলে গিয়েছে। জিএসটি থেকে রাজ্যের আয় কম হলে কেন্দ্রের আয়ও একইভাবে কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারও যাতে নিজের নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী খরচ করতে পারে,

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনকে তা দেখার দায়িত্ব দেবে কেন্দ্র। গত ২৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তৈরিতে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। এখন চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে কেন্দ্রের রাজস্ব আয়ের ৪২ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা চলবে ২০২০-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এর পর থেকে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজস্ব বণ্টন করা হবে। সাধারণত সুপারিশ কার্যকর করার দু'বছর আগেই অর্থ কমিশন তৈরি হয়। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ চালু হয়েছে ২০১৫ থেকে। এর আগে ২০১২-র অক্টোবরেই কমিশন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। ২০১৩-র জানুয়ারিতে ওয়াই. ভি. রেড্ডিকে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়।

গত ২৯ নভেম্বরই ওই কমিশন গড়ার কাজ সেরে ফেলে সরকার। অর্থ কমিশনের মাথায় চেয়ারম্যান হিসেবে রাখা হয়েছে পূর্বতন যোজনা কমিশনের সদস্য এন. কে. সিং-কে। বাকি সদস্যরা হলেন, প্রাক্তন আর্থিক বিষয়ক সচিব শক্তিকান্ত দাস, প্রাক্তন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা অশোক লাহিড়ি, নীতি আয়োগের সদস্য রমেশ চন্দ এবং জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অনুপ সিং। নতুন কমিশনকে কী কী বিষয় দেখতে বলা হবে, সেকথাও বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক অবস্থা, রাজকোষ ঘাটতি, ধারের বহর, হাতে থাকা নগদ ইত্যাদি খতিয়ে দেখবে কমিশন। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল করার পথনির্দেশও দেবে। কেন্দ্র-রাজ্যে জিএসটি-র প্রভাব দেখার ক্ষেত্রে অর্থ কমিশনের অন্যতম কাজ হবে নতুন কর ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে রাজস্ব খাতে রাজ্যগুলির ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ঠিক করা। আগামী ৫ বছর ধরে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সেস বাতিলের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবেন সদস্যরা। সহজে ব্যবসা করার শর্ত কতটা মেনে চলা হচ্ছে, সেব্যাপারেও নজর রাখবেন তারা।

● **বিমুদ্রীকরণে ২৫ লক্ষ জমা, নোটিস আয়কর দপ্তরের :**

কালো টাকার খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরুর কথা আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্র। এবার তার অঙ্গ হিসেবে জানাল আয়করের নোটিস পাঠানোর কথা। কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের চেয়ারম্যান সুশীল চন্দ্র জানান, নোট বাতিলের পরে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ২৫ লক্ষের বেশি টাকা জমা করেছেন, কিন্তু সময়ে আয়কর রিটার্ন দেননি, এমন ১ লক্ষ ১৬ হাজার ব্যক্তি ও সংস্থাকে নোটিস পাঠাচ্ছেন তারা। নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৩০ দিনের মধ্যে আয়কর রিটার্ন জমা করার জন্য। বিমুদ্রীকরণের পরে পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট ব্যাঙ্কে যারা আড়াই লক্ষ টাকা বা তার বেশি জমা দিয়েছেন, এমন ১৮ লক্ষ ব্যক্তি ও সংস্থাকে চিহ্নিত করার বিষয়টি আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্র। এখন তাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। যেমন, এদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার বেশি জমা করা ১ লক্ষ ১৬ ব্যক্তি ও সংস্থাকে ইতোমধ্যেই নোটিস পাঠানো হয়েছে ধাপে ধাপে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বাকিদের হিসেবও।

একই সময়ে ১০-২৫ লক্ষ টাকা জমা করেছেন কিন্তু রিটার্ন দেননি, এমন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছেও এর পরে নোটিস যাবে। যার সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার। শুধু তাই নয়, নগদে মোটা টাকা জমা দিয়ে থাকলেই পড়তে হবে তদন্তের মুখে। তা সে যতই আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া থাকুক। কেন্দ্রের হিসেবে, নোট বাতিলে পরে এখনও পর্যন্ত ১৭.৭৩ লক্ষ লেনদেনকে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। ২৩.২২ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এণন ৩.৬৮ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেনকে খতিয়ে দেখার জন্য বেছেছেন কর কর্তারা। ইতোমধ্যে ১৬.৯২ লক্ষ অ্যাকাউন্টের জন্য ১১.৮ লক্ষ জনের কাছ থেকে তথ্য তলব করে তা পাওয়াও গিয়েছে।

● **ব্যাপকভাবে সংশোধিত আয়কর রিটার্নে চিরুনি তল্লাশি :**

আগেই এ নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল পর্ষদ। বলেছিল, সংশোধনের সুযোগ নিয়ে রিটার্নে দাখিল করা হিসেব পুরোপুরি বদলালে তা পরীক্ষা করা হবে ও মামলা রুজু করে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ, আয়কর আইনের আওতায় রিটার্ন নতুন করে জমার নিয়ম রয়েছে কোনও তথ্য বাদ পড়লে তা জানানো বা সাধারণ ভুল সংশোধনের জন্য। বিমুদ্রীকরণের পরে জমা পড়া সংশোধিত আয়কর রিটার্নে এবার 'চিরুনি তল্লাশি' শুরুর নির্দেশ দিল প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ। বিশেষ করে ওই পরিবর্তিত রিটার্নে আয়ের হিসেব-নিকেশ আমূল বদলে ফেললে আয়কর দপ্তরের তদন্তের জাল এড়াতে পারবেন না সংশ্লিষ্ট আয়করদাতা। হিসেবে গরমিল পেলে ও কালো টাকা ধরা পড়লে 'বাড়তি হারে কর' আদায়ের নির্দেশও দিয়েছে পর্ষদ।

প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ জানিয়েছে, আয়কর আইনের ১১৫ বিবিই ধারায় উঁচু হারে কর বসানো যাবে; ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে লোকসান বা বাড়তি খরচ দেখালেও সুরাহা মিলবে না। আরও বলা হয়েছে, ব্যবসায়ী তার ওই বাড়তি আয় বিক্রি খাতে ঘরে এসেছে বলে দাবি করলে আয়কর দপ্তর দেখবে, পরোক্ষ কর জমা বাবদ দাখিল করা রিটার্নের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রয়েছে কি না। তাই পরীক্ষা করা হবে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক/ভ্যাট সংক্রান্ত রিটার্ন।

● **নতুন দেউলিয়া বিধিতে রাষ্ট্রপতির সায় :**

স্বেচ্ছায় ঋণখেলাপি যাতে নিলামে ওঠা নিজের সংস্থা ফের ঘুরপথে হাতে নিতে না পারেন, সেজন্য অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) জারির কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। গত ২৩ নভেম্বর ওই অধ্যাদেশে সায় পেতে তা পাঠানো হয়েছিল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে। তার কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরেই সরকারিভাবে ওই ঘোষণা করেছে কেন্দ্র সরকার। এদিন বিবৃতিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, স্বেচ্ছায় ঋণখেলাপের ইতিহাস রয়েছে কিংবা ঋণ (এমনকী তার সুদও) অন্তত এক বছরের জন্য শোধ না করায় তা বদলে গিয়েছে অনুৎপাদক সম্পদে, এমন সংস্থাকে নিজের সম্পদ ফেরানোর নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। একই কথা প্রযোজ্য আগে ব্যাঙ্কের তাড়া সত্ত্বেও ঋণশোধে আগ্রহ না দেখানো সংস্থার ক্ষেত্রে।

গত বছর দেউলিয়া বিধি চালুর পরে ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করতে না পারা ১২-টি সংস্থাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে তাদের সম্পত্তি নিলামে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু অর্থমন্ত্রকের কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে নিজেদের সংস্থার সম্পত্তি কিনতে নিলামে আগ্রহ দেখায় ওই তালিকায় থাকা জনৈক কোম্পানির মালিকরা। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এতে তো অনেক কম টাকায় (যেহেতু দেউলিয়া সংস্থা হিসেবে আসল দরের তুলনায় কমে তা বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা) নিজেদের সম্পদ ফিরে পাবে তারা। উপরন্তু বইতে হবে না ধারের বোঝাও। ফলে আশঙ্কা তৈরি হয় এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জালিয়াতির রাস্তা খোলার।

● **আয়কর আইন বদলাতে টাস্ক ফোর্স :**

গত ২২ নভেম্বর পঞ্চাশ বছর পুরোনো আয়কর আইন ঢেলে সাজাতে কমিটি গড়ল কেন্দ্র। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এই সংক্রান্ত ছ'সদস্যের টাস্ক ফোর্সের কাজ হবে আর্থিক প্রয়োজন মেনে ওই আইনে রদবদল আনা। টাস্ক ফোর্সের আহ্বায়ক হবেন প্রত্যক্ষ কর

পর্ষদের সদস্য (আইন সংক্রান্ত) অরবিন্দ মোদী। বাকিরা গিরীশ আহুজা (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও স্টেট ব্যাঙ্কের নন-অফিশিয়াল ডিরেক্টর), রাজীব মেমানি (আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর চেয়ারম্যান ও রিজিওনাল ম্যানেজিং পার্টনার), মুকেশ প্যাটেল (কর সংক্রান্ত আইনজীবী), মানসী কেডিয়া (গবেষণা সংস্থা ইকরিয়ারের উপদেষ্টা) এবং জি. সি. শ্রীবাস্তব (অবসরপ্রাপ্ত আইআরএস ও আইনজীবী)। কেন্দ্রের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যন থাকবেন বিশেষ আমন্ত্রিত স্থায়ী সদস্য হিসেবে। টাস্ক ফোর্সের নজরে থাকবে, বিভিন্ন দেশের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা, ভারতের নিজস্ব আর্থিক প্রয়োজন ইত্যাদি। ছ'মাসে সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে তারা।

● **সৌর বিদ্যুতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণ :**

সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোয় ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। ৯.৮ কোটি ডলার (৬৩৭ কোটি টাকা) ঋণ দিতে এদেশের সঙ্গে চুক্তি করল তারা। অনুদানও দেবে ২০ লক্ষ ডলার (১৩ কোটি টাকা)। বিভিন্ন রাজ্যকে সৌর পার্ক তৈরির প্রকল্পে তহবিল জোগানো হবে এই ঋণ থেকে। কেন্দ্রীয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিমন্ত্রকের আওতায় বেশিরভাগ সৌর পার্ক গড়ে উঠবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। প্রথম দু'টি প্রকল্প হবে মধ্যপ্রদেশের রিওয়া ও মন্দসৌরে। পরবর্তী ধাপে ওড়িশা, ছত্তীসগঢ় ও হরিয়ানায়। দেশে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে কেন্দ্র দায়বদ্ধ। এই প্রকল্পের আওতায় বড়ো মাপের সৌর পার্ক গড়ে তোলা হবে, যা থেকে তৈরি হবে ১০০ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ। সরকারের লক্ষ্য, ২০২২ সালের মধ্যে ১৭৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

ইন্ডিয়ান রিনিউয়েব্‌ল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি বিশ্ব ব্যাঙ্কের তহবিল কাজে লাগিয়ে প্রকল্পগুলির পরিকাঠামো তৈরি করবে বিভিন্ন রাজ্যে। যেমন, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে সাব-স্টেশন গড়া, একটি পার্ক থেকে অন্যটিতে বিদ্যুৎ পরিবহণ এবং সব প্রকল্পে রাস্তা, জল সরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি। ৩৩১ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম সারিতে ভারত। কিন্তু মাথাপিছু ব্যবহার বিশ্বের গড়ের মাত্র ৩৩ শতাংশ। সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়িয়ে এই ফাঁকই ভরতে চায় কেন্দ্র।

● **জিএসটি-র বৈদ্যুতিন ওয়ে-বিল ফেব্রুয়ারি থেকেই :**

জিএসটি জমানায় বৈদ্যুতিন ওয়ে-বিল (ই ওয়ে-বিল) চালু করার সময় এগিয়ে আনল কেন্দ্রীয় সরকার। গত ১৬ ডিসেম্বর জিএসটি পরিষদের ২৪-তম বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৮ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য লেনদেনে বাধ্যতামূলক হচ্ছে ই ওয়ে-বিল। আগে তা ছিল পয়লা এপ্রিল। রাজ্যের মধ্যে পণ্য চলাচলে তা চালু করতে হবে পয়লা জুনের মধ্যে। পরিষদের চেয়ারম্যান বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী পরে জানান, নতুন ব্যবস্থার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংক্রান্ত কাঠামো তৈরি হয়ে যাবে ১৬ জানুয়ারির মধ্যে। বাধ্যতামূলকভাবে তা চালু করার বিজ্ঞপ্তি জারি হবে পয়লা ফেব্রুয়ারি। জিএসটি নেটওয়ার্কের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরিকাঠামো তৈরি করছে ন্যাশনাল ইনফর্ম্যাটিক্স সেন্টার (এনআইসি)। গত পয়লা জুলাই জিএসটি চালু হলেও ই ওয়ে-বিল ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, বিহার, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে ই ওয়ে-বিল ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো বলে তাদের আপাতত নিজেদের নিয়মই বহাল রাখতে বলেছে পরিষদ।

কর ফাঁকি ঠেকানোই নতুন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য বলে দাবি সরকারের। সেজন্য তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামো কতটা তৈরি, ওই সময়ের মধ্যেই তা খতিয়ে দেখা হবে বলে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পৌরোহিত্যে আয়োজিত বৈঠকের পরে এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এখনও ই ওয়ে-বিল চালু না হওয়ার কারণেই কর ফাঁকির জেরে জিএসটি খাতে সরকারের রাজস্ব কমছে বলে অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহলে। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে রাজস্ব ছিল ৯৫,১৩১ কোটি টাকা। অক্টোবরে তা কমে হয় ৮৩,৩৪৬ কোটি টাকা। নতুন ব্যবস্থায় ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের পণ্য ১০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দূরত্বে জোগানের জন্য পরিবহণের আগে তা অনলাইন ব্যবস্থায় নথিভুক্ত করতে হবে। তার ভিত্তিতেই তৈরি হবে বৈদ্যুতিন বা ই ওয়ে-বিল। এর আগে যুক্তমূল্য কর বা ভ্যাটের আওতায়ও চালু ছিল ওয়ে-বিল। পণ্য লেনদেনের তথ্য উল্লেখ করা থাকত কাগুজে বিলে। তার জায়গা নেবে বৈদ্যুতিন ওয়ে-বিল, যা মিলবে জিএসটি পোর্টালে। বিল তৈরি হলেই মিলবে নিজস্ব ই ওয়ে-বিল নম্বর বা ইবিএন। সরবরাহকারী, বিক্রেতা ও পরিবহণকারী, সবাই এটি পাবেন।

● **দোকানের চার্জ মকুব দু'হাজার পর্যন্ত ডিজিটাল লেনদেনে :**

কার্ড-সহ কিছু ডিজিটাল লেনদেনে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া-নেওয়ার চার্জ (মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেটস বা এমডিআর) ব্যাঙ্কগুলিকে মিটিয়ে দেবে কেন্দ্রই। ফলে ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্কের উপর এই বোঝা আর থাকবে না। পয়েন্ট অব সেল যন্ত্রে কার্ড ঘষে কেনাকাটার জন্য দোকানগুলিকে এই টাকা ব্যাঙ্কের কাছে জমা দিতে হয়। আপাতত কেন্দ্রই তা বহন করবে বলে ১৫ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দিতেই এই উদ্যোগ। বৈঠকের পরে তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদ জানান, আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে দু'বছরের জন্য ওই সুবিধা পাওয়া যাবে। যা প্রযোজ্য হবে ডেবিট কার্ড, ভীম ইউপিআই অ্যাপ এবং আধারের মাধ্যমে করা লেনদেনগুলির ক্ষেত্রে। এজন্য কেন্দ্রের ঘর থেকে যাবে প্রায় ২,৫১২ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঋণ নীতিতে ব্যাঙ্কগুলিকে এমডিআর-এর হার ছোটো ও বড়ো ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা করার নিদান দেয় শীর্ষ ব্যাঙ্ক। তার পরেই তাদের খরচ দ্বিগুণ হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে খুচরো ব্যবসায়ীরা। ডেবিট কার্ড থাকলেও, বহু ক্ষেত্রে কম অঙ্কের লেনদেনে মানুষ নগদে টাকা মেটানো পছন্দ করেন। অথচ দেখা যায় ওই ছোটো লেনদেনই মোট লেনদেনের অনেকটা জুড়ে থাকে। তাই সেই সব মানুষকে ডিজিটাল পরিষেবার আওতায় আনতেই এই উদ্যোগ।

খেলা

ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনোর উপস্থিতিতে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বকাপের গ্রুপ ভাগাভাগি নিয়ে ড্র। ২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপের কোন দল কোন গ্রুপে, কে খেলবে কার বিরুদ্ধে, ফয়সালা হল তার। গ্রুপ এ : রাশিয়া, সৌদি আরব, ইজিপ্ট, উরুগুয়ে। গ্রুপ বি : পর্তুগাল, স্পেন, মরোক্কো, ইরান। গ্রুপ সি : ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, পেরু, ডেনমার্ক। গ্রুপ ডি : আর্জেন্তিনা, আইসল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, নাইজিরিয়া। গ্রুপ ই : ব্রাজিল, সুইৎজারল্যান্ড, কোস্টা রিকা, সার্বিয়া। গ্রুপ এফ : জার্মানি, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া। গ্রুপ জি : বেলজিয়াম, পানামা, তিউনেশিয়া, ইংল্যান্ড। গ্রুপ এইচ : পোল্যান্ড, সেনেগাল, কলোম্বিয়া, জাপান।

- বিশ্ব হকি লিগ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হল অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে আর্জেন্তিনাকে ২-১ গোলে হারাল তারা। সেমিফাইনালে ভারতকে হারালেও ফাইনালে শেষরক্ষা হল না আর্জেন্তিনার। ম্যাচের তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত ফলাফল ছিল ১-১। ম্যাচ শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে ব্লেক গভার্সের গোলে জেতে অস্ট্রেলিয়া। অন্য দিকে, সোনার জন্য লড়াইয়ে নামা হয়নি, কিন্তু তৃতীয়-চতুর্থ স্থানের লড়াইয়ে জার্মানিকে হারিয়ে মুখরক্ষা হল ভারতীয় হকি দলের। জার্মানিকে ২-১-এ হারিয়ে ব্রোঞ্জ ধরে রাখতে সক্ষম ভারতীয় হকি দল।
- লিওনেল মেসি-কে হারিয়ে পঞ্চম ব্যালঁ ডি'ওর জিতে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এই মরসুমে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন রোনাল্ডো। মাস কয়েক আগেই ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কার পেয়েছেন সি আর সেভেন। এবার ব্যালঁ ডি'ওর-ও তার দখলে। এর আগে পর্যন্ত ব্যালঁ ডি'ওর লড়াইয়ে মেসি বনাম রোনাল্ডো স্কোর ছিল ৫-৪। গত ৭ ডিসেম্বর বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারে সামনে ব্যালঁ ডি'ওর মঞ্চে মেসিকে ছুঁয়ে ৫-৫ করে ফেললেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা।
- বধিরদের জাতীয় প্রতিযোগিতায় সফল হলেন গোয়ালতোড়ের শ্রীকৃষ্ণ মাহাতো। 'অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল অব ডেফ'-এর উদ্যোগে গত ১-৬ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডের রাঁচি মেগা স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ আয়োজিত হয় ২২-তম 'ন্যাশনাল গেমস অব দ্য ডেফ'। প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। জন্ম থেকেই শ্রীকৃষ্ণ মূক ও বধির। হলদিয়ার সুতাহাটায় মূক এ বধিরদের বিদ্যালয় 'শ্রুতি'-তে পড়াশোনা শুরু করেন। ছোটো থেকেই খেলাধুলায় পারদর্শী। রাজ্য, জাতীয় স্তর ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরেও সফল। ২০১২ সালে কানাডায় আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ড ডেফ অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ' যোগ দিয়ে সফল হন। ২০১৫ সালে তাইওয়ানে আয়োজিত বধিরদের এশিয়া কাপে ও ২০১৭ সালের ২৩-তম 'সামার ডেফ অলিম্পিকস'-এও সফল হন জঙ্গলমহলের ২৩ বছরের এই যুবক। চলতি বছর ঝাড়খণ্ডে আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতাতেও ভালো ফল করেন শ্রীকৃষ্ণ।
- ২৮ বছর বয়সি ভরত খাণ্ডারের। গত ২৫ নভেম্বর সাংহাইয়ে অভিষেক ঘটে মহারাষ্ট্রে এই তরুণের। এই ম্যাচে হেরে যাওয়া সত্ত্বেও রিং-এ নাম মাত্রই এক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে যায় ভারতের নাম। তিনিই হলেন প্রথম কোনও ভারতীয় মিক্সড মার্শাল আর্টস ফাইটার, যিনি লড়লেন বিশ্ববিখ্যাত ইউএফসি-তে। নভেম্বর মাসে অর্জন সিং ভুল্লার প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে ইউএফসি-তে যোগ দেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কানাডার প্রতিনিধি। এবারই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে কোনও ভারতীয় নাগরিককে।

● **হংকং ও দুবাই সুপার সিরিজের ফাইনালে সিন্ধু :**

গত ২৬ নভেম্বর হংকং ওপেন সুপার সিরিজের ফাইনালে হেরে গেলেন ভারতের পিভি সিন্ধু। বিশ্বের এক নম্বর শাটলার তাই জু ইংয়-এর কাছে সিন্ধু হারেন ১৮-২১, ১৮-২১-এ। হংকং কোলিসিয়ামে বিশ্বের এক নম্বর ও বিশ্বের দু'নম্বর, দুই সেরার যুদ্ধে বাজিমাত এক নম্বরেরই। এই নিয়ে দু'বার পর পর এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে তাই জু ইংয়-এর কাছে হারতে হল সিন্ধুকে।

এর পর আবার গত ১৭ ডিসেম্বর দুবাইয়ে সুপার সিরিজ টুর্নামেন্টের ফাইনালে সিন্ধু ২১-১৫, ১২-২১, ১৯-২১ হারেন আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে। জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীকে গ্রুপের শেষ ম্যাচেই হারিয়েছিলেন সিন্ধু। তাছাড়া মুখোমুখি লড়াইয়ে ৫-২ এগিয়ে থেকেই এই ম্যাচে নামেন তিনি। কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও ইয়ামাগুচিকে রুখতে পারেননি রিও অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী।

● **আন্তর্জাতিক টেনিসে ২০১৭-র বিশ্বসেরা :**

মরসুম শেষের ট্যুর ফাইনালস থেকে দ্রুত ছিটকে গেলেও স্পেনের রাফায়েল নাদালই এবছরের বিশ্বসেরা। ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থা। পাশাপাশি মেয়েদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নাদালের দেশের গারবিনে মুগুরুজা। ১৯ বছর পরে প্রথম বার একই দেশের পুরুষ ও মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়লেন নাদাল এবং মুগুরুজা। এর আগে শেষ বার একই দেশের দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ১৯৯৮ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তি পিট স্যাম্প্রাস এবং মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন লিন্ডসে ড্যাভেনপোর্ট। এছাড়া এবার ডাবলসে পোল্যান্ডের লুকাস কুবো এবং ব্রাজিলের মার্সেলো মেলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। মেয়েদের ডাবলসে বিশ্বসেরা সদ্য অবসর নেওয়া সুইস তারকা মার্টিনা হিঙ্গিস এবং চিনা তাইপের চ্যান ইয়ুন জ্যান।

এই নিয়ে তৃতীয় বার এই সম্মান পেলেন নাদাল। গত মরসুমে চোট-আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার পরে চলতি মরসুমে দুরন্তভাবে ফিরে আসেন তিনি। দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতেন। রেকর্ড ১০ নম্বর ফরাসি ওপেন জেতার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে নিজের ট্রফি ক্যাবিনেটে ১৬ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম নিশ্চিত করে ফেলেন। মুগুরুজা আবার প্রথম বার এই ট্রফি জিতলেন। চলতি মরসুমে উইম্বলডন জেতার পাশাপাশি কেরিয়ারে প্রথম বার এক নম্বরের সিংহাসনে বসার কৃতিত্ব অর্জন করেন। যদিও চলতি মরসুম শেষ করেন দু'নম্বরে। শীর্ষে রোমানিয়ার সিমোনা হালেপ।

● **আন্তর্জাতিক যোগে সফল খড়্গপুরের স্কুল পড়ুয়া :**

প্রথম বার আন্তর্জাতিক স্তরের যোগ প্রতিযোগিতায় গিয়েই সাফল্য পেল খড়্গপুরের ছেলে সোয়েল আহমেদ গাজি। গত ২১ থেকে ২৪ নভেম্বর কর্ণাটকের শ্রীক্ষেত্র ধর্মস্থলে 'কর্ণাটক স্টেট অ্যামেচার যোগ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন' ও 'শান্তিভবন ট্রাস্ট'-এর আয়োজনে এবং 'এশিয়ান যোগ ফেডারেশন' ও 'যোগ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া'-র সহযোগিতায় 'ইন্টারন্যাশনাল যোগ স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭'-এ চতুর্থ স্থান দখল করে খড়্গপুরের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সোয়েল। এছাড়াও ২০ থেকে ২৪ নভেম্বর, সেই একই জায়গায় আয়োজিত হয় দ্বিতীয় ফেডারেশন যোগ স্পোর্টস কাপ ২০১৭-'১৮। সেখানে ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের বিভাগে প্রথম হয়েছে সোয়েল। গত ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর 'উত্তরপ্রদেশ যোগ অ্যাসোসিয়েশন'-এর আয়োজনে ৪২-তম ন্যাশনাল যোগ স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭-'১৮ হয় গাজিয়াবাদে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় দু'টি বিভাগে প্রথম হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে যাওয়ার সুযোগ পায় সোয়েল। কর্ণাটকের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সোমালিয়া, ইরাক-সহ মোট ১১-টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। ১৪ বছরের সোয়েল ছেলেদের ৮ থেকে ১৭ বছর বয়সের জুনিয়র বিভাগে 'আর্টিস্টিক যোগ'-এ যোগ দেয়। এই বিভাগে ছিল ৫২ জন প্রতিযোগী। মোট ১০-টি আসনের মধ্যে ৭-টি আসন করে দেখাতে হয়। সেখানে বিচারকদের বিচারে চতুর্থ স্থান পায় সোয়েল। ফেডারেশন যোগ স্পোর্টস কাপ

২০১৭-'১৮ প্রতিযোগিতাতেও ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের জুনিয়র বিভাগে 'আর্টিস্টিক যোগ'-এ যোগ দেয় সোয়েল। নির্ধারিত ১০-টি আসন করে দেখাতে হয়। বিচারকদের বিচারে এই বিভাগে প্রথম হয় সোয়েল।

● **ভারোত্তোলনে নজির গড়ে চানুর সোনা :**

দু'দশক পরে ভারোত্তোলনের বিশ্ব মঞ্চে আবার ভারতের পতাকা উড়ল। ২২ বছর পরে আবার এক ভারতীয় মেয়ে ভারোত্তোলনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সোনা আনলেন দেশের জন্য। শেষবার এনেছিলেন কর্ণম মালেশ্বরী। ১৯৯৫ সালে। এবার আনলেন সাইখম মীরাবাই চানু। গত ২৯ ডিসেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনাহেইমে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ৪৮ কেজি বিভাগে ২৩ বছরের মণিপুরের মেয়ে চানু স্ন্যাচে ৮৫ কেজি ও ক্লিন-অ্যান্ড-জার্কে ১০৯ কেজি তুলে চ্যাম্পিয়ন হন। মোট ওজন তোলেন ১৯৪ কেজি। যা জাতীয় রেকর্ড। প্রসঙ্গত, ১৯৯৪, ১৯৯৫ সালে পর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সোনা জিতেছিলেন মালেশ্বরী। ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিক্সে জেতেন ব্রোঞ্জ পদক।

● **যুব বিশ্ব বক্সিং-এ ভারতের মেয়েদের ৫ সোনা :**

গত ২৬ নভেম্বর গুয়াহাটির নবীন চন্দ্র বরদলৈ ইন্ডোর স্টেডিয়ামের রিং-এ বিশ্ব যুব মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে ওঠে ভারতের পাঁচ বক্সার—অঙ্কুশিতা বোরো (৬৪ কেজি), জ্যোতি গুলিয়া (৫১ কেজি), শশী চোপড়া (৫৭ কেজি), নীতু ঘাঙ্গাস (৪৮ কেজি) ও সাক্ষী চৌধুরী (৫৪ কেজি)। ইতিহাস তৈরি করে ওই দিন ফাইনালে সোনা জেতেন ভারতের পাঁচ কন্যাই। এদিন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে ভারতের সেরা সাফল্য ছিল দু'টো সোনা। দু'টো রুপো। ২০১১ সালে যে নজির গড়েছিল ভারতীয় বক্সাররা। এদিন তৈরি হল ভারতীয় মহিলা বক্সিং-এর নতুন রেকর্ড। পাঁচটি সোনা এবং দু'টি ব্রোঞ্জ জিতে প্রথম হল ভারত। দ্বিতীয় রাশিয়া (২-টি সোনা, ৪-টি রুপো), তৃতীয় কাখাখস্তান (১-টি সোনা, ২-টি রুপো, ২-টি ব্রোঞ্জ)। টুর্নামেন্টে ভারতের দশ জন বক্সারের মধ্যে সাত জনই পদক-সহ বাড়ি ফিরলেন। অসমের অঙ্কুশিতা সঙ্গে নিয়ে গেলেন টুর্নামেন্টের সেরা বক্সারের পুরস্কার। আগামী বছর আর্জেন্তিনায় যুব অলিম্পিক্সে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন জ্যোতি গুলিয়া।

● **শচীনকে টপকে গেলেন স্টিভ স্মিথ :**

অ্যাশেজে দুরন্ত ছন্দে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পর ফের এক বার তৃতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি করেন স্মিথ। আর এই সেঞ্চুরি করেই ক্রিকেট আইকন শচীন তেন্ডুলকরকে ছাপিয়ে গেলেন অজি অধিনায়ক। তৃতীয় দ্রুততম ক্রিকেটার হিসেবে ২২-টি টেস্ট শতরান করে ফেললেন স্টিভ স্মিথ। ২২-টি শতরান করতে শচীনের লেগেছিল ১১৪-টি ইনিংস। সেখানে ২২-টি শতরান করতে স্মিথ খেললেন ১০৮-টি ইনিংস। তবে, স্মিথের থেকেও কম ইনিংসে এই মাইলস্টোন স্পর্শ করার নজির আছে ডন ব্র্যাডম্যান এবং সুনীল গাভাস্করের। ২২-টি শতরান করতে কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যান নিয়েছিলেন ৫৮-টি ইনিংস এবং সুনীল গাভাস্করের লেগেছিল ১০১-টি ইনিংস। ২২-টি সেঞ্চুরির মধ্যে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক হিসেবে ১৪-টি শতরান করলেন স্মিথ। চলতি বছরে টেস্ট ক্রিকেটে ১০০০ রানের গণ্ডিও পেরলেন স্টিভ। এই নিয়ে পর পর চার বছরে ১০০০ রানের নজির গড়লেন তিনি। ম্যাথু হেডেনের পর প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই নজির গড়লেন স্মিথ।

● **শ্রীলঙ্কাকে টেস্ট ও একদিনের সিরিজে ভারত :**

ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কাকে টেস্ট ও একদিনের সিরিজে যথাক্রমে ১-০ (প্রথম ও তৃতীয় টেস্ট ড্র হয়) ও ২-১-এ হারাল ভারত। সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক এই দুই সিরিজের উল্লেখযোগ্য খুঁটিনাটি।

❖ **প্রথম টেস্ট—কলকাতা—১৬-২০ নভেম্বর** ■ টেস্ট ম্যাচের সব ক'টি দিনে ব্যাট করে ভারতের তৃতীয় ও বিশ্বের নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে নজির গড়লেন চেতেশ্বর পূজারা। ■ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিজের ৫০-তম শতরান করেন ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি; প্রথমত, সবচেয়ে কম সংখ্যক ইনিংসে ৫০-টি সেঞ্চুরি করার ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্রুততম হিসেবে ছুঁয়ে ফেললেন দক্ষিণ আফ্রিকার হাশিম আমলাকে; দ্বিতীয়ত, ভারতের অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে সেঞ্চুরির নিরিখে ছুঁয়ে ফেললেন সুনীল গাভাস্করকে।

❖ **দ্বিতীয় টেস্ট—নাগপুর—২৪-২৮ নভেম্বর** ■ একটি ক্যালেন্ডার বছরে ১০-টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি করে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে নতুন নজির গড়লেন কোহলি। ■ ভারতের অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে সেঞ্চুরির নিরিখে (১২-টি সেঞ্চুরি) এখন তিনিই শীর্ষে। ■ অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে ডবল সেঞ্চুরির সংখ্যার নিরিখে ছুঁয়ে ফেললেন ব্রায়ান লারার সর্বোচ্চ (৫-টি) দ্বি-শতরানের রেকর্ড। ■ সবচেয়ে কম সংখ্যক ম্যাচে (৫৪-টি ম্যাচ) টেস্টে ৩০০ উইকেট নিয়ে নজির গড়লেন ভারতের রবিচন্দ্রণ অশ্বিন।

❖ **তৃতীয় টেস্ট—দিল্লি—২-৬ ডিসেম্বর** ■ কোহলি ২০-তম সেঞ্চুরি করে ভারতের অধিনায়ক হিসেবে ৩০০০ রান আর টেস্টে ৫০০০ রানের গণ্ডি পার করলেন। ■ নিজের জীবনের ষষ্ঠ এবং ২০১৭-র তৃতীয় ডবল সেঞ্চুরি করলেন কোহলি—টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি দ্বি-শতরান এখন তার দখলে। ■ এই নিয়ে ২০১৭ সালে ১০-টি আন্তর্জাতিক শতরান করে ফেললেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে—একটি ক্যালেন্ডার বছরে একজন ক্রিকেটারের কোনও একটি দেশের বিরুদ্ধে করা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সেঞ্চুরি। ■ কোহলি বিশ্বের প্রথম টেস্ট ক্যাপ্টেন যিনি ৩-ম্যাচের কোনও টেস্ট সিরিজের প্রত্যেকটি ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন। ■ বিশ্বের দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরে ১৬ হাজার রান করেন।

❖ **প্রথম একদিনের ম্যাচ—১০ ডিসেম্বর—ধর্মশালা** ■ ভারতের শ্রেয়াস আইয়ারের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেক। ■ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে একই সঙ্গে ভারতের রোহিত শর্মা ও শ্রীলঙ্কার থিসারা পেরেরার অভিষেক।

❖ **দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ—মোহালি—১৩ ডিসেম্বর** ■ ভারতের ওয়াশিংটন সুন্দরের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেক। ■ এই নিয়ে একশো বার একদিনের আন্তর্জাতিক ৩০০ রানের গণ্ডি টপকাল ভারত। ■ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনটি ডবল সেঞ্চুরি এবং একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দু'-দু'টি ডবল সেঞ্চুরি করে নজির সৃষ্টি করলেন রোহিত শর্মা।

❖ **তৃতীয় একদিনের ম্যাচ—বিশাখাপত্তনম—১৭ ডিসেম্বর** ■ ভারতের শিখর ধাওয়ান একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চার হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন।

● **আইসিসি র‍্যাঙ্কিং :**

ব্যাট হাতে ডবল সেঞ্চুরি। অধিনায়কের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই সিরিজ জয়। আর তার পরের দিনই আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে আসা। গত ১৭ ডিসেম্বর সিরিজ ২-১-এ বিরাট কোহালিকে

ছাড়াই জিতে নিয়েছে ভারতীয় দল। রোহিত দু'ধাপ উঠে পাঁচে জায়গা করে নিলেন। এই প্রথম তিনি ৮০০ পয়েন্টের গণ্ডি পেরলেন। রয়েছেন ৮১৬ পয়েন্টে। ওডিআই ব্যাটিংয়ের শীর্ষেই রয়ে গেলেন বিরাট কোহলি। দ্বিতীয় স্থানে এবি ডে ভিলিয়ার্স। তিনে ডেভিড ওয়ার্নার ও চারে বাবর আজম। রোহিতের পাশাপাশি র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠলেন তারই ওপেনিং পার্টনার শিখর ধবন। একধাপ উঠে তিনি জায়গা করে নিলেন ১৪ নম্বরে। টুর্নামেন্টের সেরাও হয়েছেন তিনি। শেষ ওডিআই-তে সেঞ্চুরিও এসেছে তার ব্যাট থেকে। বোলারদের মধ্যে ২৩ ধাপ উঠে ২৮ নম্বরে জায়গা করে নিলেন যুজবেন্দ্র চাহাল। এই সিরিজে ছ' উইকেট নেন তিনি। কুলদীপ যাদব ১৬ ধাপ উঠে কেরিয়ারের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং ৫৬-তে পৌঁছলেন কুলদীপ। হার্দিক পাণ্ড্য ১০ ধাপ উঠে জায়গা করে নিলেন ৪৫ নম্বরে। ওডিআই বোলিংয়ের সেরা পাঁচে রয়েছেন ভারতের একজনই। শীর্ষে পাকিস্তানের হাসান আলি। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার ইমরান তাহির। তিনে রয়েছেন ভারতের জসপ্রীত বুমরাহ। চারে জশ হেজেলউড ও পাঁচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাডা। সেরা পাঁচে জায়গা হয়নি কোনও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটারেরই।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন কোহলি। ডেভিড ওয়ার্নার-কেন উইলিয়ামসনদের চ্যালেঞ্জ টপকে নিজের দু'নম্বর স্থান সুরক্ষিত রাখলেন। সদ্য প্রকাশিত টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮৯৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখলেন ভারত অধিনায়ক। র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে চেতেশ্বর পূজারারও। ৮৭৩ পয়েন্ট নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে তিন নম্বর স্থানে উঠে এসেছেন। র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনেরও। ৮৫৫ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বর থেকে এক ধাপ উঠে চার নম্বরে উইলিয়ামসন। প্রত্যাশা মতোই টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন স্টিভ স্মিথ। অ্যাশেজে মারকাটারি পারফরমেন্সের সুবাদে ৯৪৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে স্মিথ। অন্য দিকে বোলারদের মধ্যে ৮৯২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছেন জেমস অ্যান্ডারসন, অ্যান্ডারসনের পরেই ৮৭৬ পয়েন্ট নিয়ে কাগিসো রাবাডা। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম দশে জায়গা পেয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ৮৭০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে জাডেজা। ৮২৯ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে অশ্বিন।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **অমরনাথ গুহার আশেপাশে 'শব্দ নিষিদ্ধ' :**

গত ১৩ ডিসেম্বর ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি) ঘোষণা করে তুষারধস এড়াতে অমরনাথ গুহার আশেপাশে 'শব্দ নিষিদ্ধ'। এর দু'দিন পর এনজিটি ব্যাখ্যা দেয়, ধর্মীয় আচারে তারা নিষেধাজ্ঞা চাপায়নি। পুরো মন্দির চত্বরকে 'শব্দ নিষিদ্ধ' এলাকা হিসেবে ঘোষণাও করা হয়নি। শুধু গুহার ভিতরে প্রকৃতির নিয়মে তৈরি শিবলিঙ্গের সামনে ভক্তরা যাতে নীরবতা রক্ষা করেন, সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। 'শব্দ নিষিদ্ধ' এলাকা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে এদিন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে এনজিটি। সেই অনুযায়ী, মন্দিরের প্রবেশদ্বারে সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে শিবলিঙ্গ পর্যন্ত এলাকায় জারি হচ্ছে শব্দ নিষেধাজ্ঞা। কোনও জিনিসপত্র বা মোবাইল নিয়েও ভক্তরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না। মন্দির বোর্ড আগেই এই নির্দেশ দিলেও তা মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ আসছিল। নয়া নির্দেশ অনুযায়ী, মন্দিরে ঢোকার আগে মোবাইল ও মালপত্র বাইরে জমা রেখে আসতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **আমাদের মতোই আরও একটা সৌরমণ্ডল হদিশ :**

জানা গেল, চেহারায় অবিকল আমাদের সৌরমণ্ডলের মতোই আরও একটি সৌরমণ্ডল আছে ব্রহ্মাণ্ডে। আমাদের সৌরমণ্ডলে যেমন বুধ থেকে নেপচুনকে নিয়ে রয়েছে আটটি গ্রহ (প্লুটো হালে 'গ্রহ'-এর শিরোপা খুইয়েছে), সেই সৌরমণ্ডলেও গ্রহের সংখ্যা আট। আমাদের সৌরমণ্ডলে গ্রহগুলি ঠিক যেভাবে একের পর এক সাজানো রয়েছে, ২ হাজার ৪৪৫ আলোকবর্ষ দূরে, 'ড্রাকো' নক্ষত্রপুঞ্জে থাকা সেই সৌরমণ্ডলের আটটি গ্রহ রয়েছে একইভাবে। বুধ, মঙ্গল, শুক্র, পৃথিবীর মতো ছোটো চেহারার পাথুরে গ্রহগুলি যেমন আমাদের সৌরমণ্ডলে রয়েছে সূর্যের কাছাকাছি আর বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের মতো বড়ো চেহারার গ্যাস ও বরফে ভরা গ্রহগুলি রয়েছে সূর্যের থেকে দূরে, সদ্য আবিষ্কৃত সৌরমণ্ডলের আটটি গ্রহ ঠিক সেইভাবেই রয়েছে। এর আগে অবিকল আমাদের সৌরমণ্ডলের মতো চেহারার আর কোনও নক্ষত্রমণ্ডলের হদিশ মেলেনি। গত ১৫ ডিসেম্বর নাসার সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানানো হয়।

নাসার অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ডিভিশনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী পল হার্ৎজ বলেছেন, এই সৌরমণ্ডলে সাতটি গ্রহের হদিশ আগেই মিলেছিল; এবার খোঁজ মিলল অষ্টম গ্রহের, নাম 'কেপলার-৯০-আই'। গ্রহটিকে দেখতে আবার অবিকল পৃথিবীর মতো। সেটি তার নক্ষত্রকে পাক মারে ১৪.৪ পার্থিব দিনে। তবে নক্ষত্রের (কেপলার-৯০) বেশি কাছে আছে বলে তার তাপমাত্রা অন্তত ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। নাসার তরফে জানানো হয়েছে, যেহেতু এই সৌরমণ্ডলের চেহারা অবিকল আমাদের মতোই, তাই প্রাণের হদিশ পাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো। সৌরমণ্ডলটির আরেকটি গ্রহ, 'কেপলার-৯০-এইচ' তার নক্ষত্রের থেকে ঠিক সেই দূরত্বেই রয়েছে, আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে রয়েছে যতটা দূরে। গ্রহটিতে জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে বা পৃথিবীর মতো পুরু বায়ুমণ্ডলও থাকতে পারে। ফলে, প্রাণের সৃষ্টি বা তার টিকে থাকার পক্ষে সহায়ক গ্রহটির পরিবেশ।

নাসার তরফে আরও জানানো হয়, সম্প্রতি আরেকটি ভিনগ্রহেরও হদিশ মিলেছে প্রায় আমাদের সৌরমণ্ডলের চেহারারই অন্য এক নক্ষত্রমণ্ডলে। নক্ষত্রটির নাম 'কেপলার-৮০' আর যে ভিনগ্রহটির হদিশ মিলেছে, তার নাম 'কেপলার-৮০-জি'। গ্রহটি ওই সৌরমণ্ডলের ষষ্ঠ গ্রহ। এবছরের গোড়ার দিকে 'ট্রাপিস্ট' নক্ষত্রমণ্ডলের হদিশ মিলেছিল, যেখানে গ্রহের সংখ্যা সাত। এবং তাতে পৃথিবীর মতোই জল বা বায়ুমণ্ডল আছে, এমন অন্তত তিনটি গ্রহের হদিশ মিলেছে। ভিনগ্রহ খুঁজতে এবং ভিনগ্রহে প্রাণের সন্ধান পেতে ২০০৯ সালে নাসা মহাকাশে পাঠিয়েছিল কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ। সেই টেলিস্কোপ ২০১৩ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মতো 'বাসযোগ্য' প্রায় আড়াই হাজার ভিনগ্রহ আবিষ্কার করেছে। তার আগেও প্রচুর ভিনগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের জ্ঞাত ভিনগ্রহের সংখ্যা প্রায় হাজার চারেক। কিন্তু, এতদিন কোনও ভিনগ্রহের নক্ষত্রমণ্ডলেই আমাদের সৌরমণ্ডলের

মতো আটটি গ্রহের সন্ধান মেলেনি। এই আবিষ্কারটি সম্ভব হয়েছে গুগলের মেশিন লার্নিং পদ্ধতির সাহায্যে।

● **কেঁচো জন্মাল মঙ্গলের মাটিতে :**

এই প্রথম কেঁচো জন্মাল 'লাল গ্রহ' মঙ্গলের মাটিতে। মাটি মঙ্গলের হলেও ভূপৃষ্ঠেই জন্মাল সেই কেঁচো। যা যা দিয়ে তৈরি 'লাল গ্রহ'-এর মাটি, পৃথিবীতে আদ্যোপান্ত সেইভাবেই বানানো মঙ্গলের কৃত্রিম মাটিতে জন্ম নিয়েছে দু'টি কেঁচো। যা আগামী দিনে 'লাল গ্রহ'-এ মানবসভ্যতার 'দ্বিতীয় উপনিবেশ' গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আরও জোরালো করে তুলল। এখনও যে প্রাণ থাকতে পারে মঙ্গলে, সেই সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দিল। নেদারল্যান্ডসের ভাগেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের দৌলতে এটা সম্ভব হয়েছে। গবেষকরা বলেছেন, মঙ্গলে গিয়ে মানুষে পক্ষে দীর্ঘ দিন টিকে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে কি না, ফসল ফলানো সম্ভব হবে কি না মঙ্গল মুলুকে, এই ঘটনার ফলে সেব্যাপারে কিছুটা দিশা মিলল। তবে এব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

অন্যতম প্রধান গবেষক, নেদারল্যান্ডসের ভাগেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক ভিগার ওয়েমলিঙ্কের মতে কোনও প্রাণহীন জৈব বস্তুকে ভেঙে দিতে পারে কেঁচো। তার ফলে জন্মানো অন্য জৈব বস্তুকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে আগের জৈব বস্তুতে আর তাতে প্রাণও দিতে পারে। এর ফলে কেঁচো একটা চক্র তৈরি করে জৈব বস্তুর মধ্যে। মাটিকে উর্বর, তরতাজা রাখতেও বড়ো ভূমিকা নেয় কেঁচো। সাহায্য করে মাটিকে ফলনশীল হতে। তাই কৃত্রিমভাবে বানানো মঙ্গলের মাটিতে কেঁচো জন্মানোয় আগামী দিনে চাঁদ ও 'লাল গ্রহ'-এ কোনও ঢাকা-চাপা দেওয়া জায়গাতেও ফসল ফলানো যেতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। ওয়েমলিঙ্ক জানিয়েছেন, কৃত্রিমভাবে বানানো মঙ্গলের মাটিতে রুকোলা উদ্ভিদ জন্মানোও সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষার শেষ পর্বে পৌঁছে গবেষকরা অবাক হয়ে দেখেছেন, কৃত্রিমভাবে বানানো মঙ্গলের মাটিতে দু'টি কেঁচোও জন্মেছে।

● **৪২-টি চিনা অ্যাপ নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হুঁশিয়ারি :**

প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা চিনা অ্যাপ থেকে বিপদ আসতে পারে যে কোনও সময়—চিনা অ্যাপগুলি মোটেই সুরক্ষিত নয় বলে হুঁশিয়ারি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই চিনা অ্যাপগুলির মাধ্যমে সাইবার হানাদারি হতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সতর্কবার্তা পৌঁছে গিয়েছে সেনাবাহিনী ও আধা-সেনার দপ্তরেও। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, অফিসার, জওয়ান, কর্মীদের মোবাইল ফোন থেকে ওই সব চিনা অ্যাপ ও লিঙ্ক অবিলম্বে ডিলিট করে দেওয়া হবে। ওই চিনা অ্যাপগুলির মধ্যে রয়েছে, ট্রুকলার, উইবো, উইচ্যাট, ইউসি নিউজ, ইউসি ব্রাউজার, ক্লিন মাস্টার, শেয়ার ইট, বাইদু ম্যাপ-সহ ৪২-টি অ্যাপ।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এবং ন্যাশনাল টেকনিকাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন (এনটিআরও)-এর তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সম্প্রতি এব্যাপারে সতর্ক করা হয়। বলা হয়, যদিও কোনও ব্যক্তির মোবাইল ফোনে ওই সব চিনা অ্যাপ ও লিঙ্ক থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। ফলে সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা ওই সব চিনা অ্যাপ ও লিঙ্ক ব্যবহার করলে তা দেশের নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। নিখরচায় হয়ে যায় বলে আমরা প্লে স্টোর থেকে দেদার ডাউনলোড করি ওই সব চিনা অ্যাপ।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদন

● **৩৫ বছর পরে সৌদি আরবে সিনেমা :**

৩৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা তুলে শীঘ্রই সিনেমাকে বৈধ ঘোষণা করা হবে বলে জানান তরুণ সৌদি রাজা, মহম্মদ বিন সলমন। সৌদি আরবের সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে ১২ ডিসেম্বর জানানো হয়, ২০১৮ সালের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে যাবে বাণিজ্যিক ছবি তৈরির কাজ। শুরু হবে সিনেমা হলগুলোকে লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়াও। পুরোনোকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন সলমন। ইতোমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, সেদেশে মহিলাদের গাড়ি চালানোর উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, আগামী জুন মাস থেকে তা তুলে দেওয়া হবে।

সৌদি আরবে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে ২০১৫ থেকেই। সেবছরে দেশের শাসনভার ওঠে রাজা সলমন বিন আবদুলাজিজ আল সৌদের হাতে। দেশের রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা হয়। জুন মাসে মসনদ হয় মহম্মদ বিন সলমনের। এই দু'জনেই 'ধর্ম-পুলিশ'-দের ক্ষমতা নাশ করতে উঠে-পড়ে লাগেন। একটা সময়ে চাইলেন কাউকে গ্রেপ্তারও করতে পারতেন ধর্মগুরুরা। প্রথমেই সেক্ষমতা কেড়ে নেন রাজারা। অতীতের রেকর্ড ভেঙে প্রথম সঙ্গীত সম্মেলন হয়। ট্যুইটারে কট্টর মতাদর্শ ছড়াচ্ছে যারা, তাদেরও নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন সলমন। নারী অধিকারের দিকেও নজর দেওয়া হয়। ৩২ বছরের তরুণ রাজা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১৯৭৯ সালের আগে সৌদি আরব এমনটা ছিল না। তার পরেই দেশটা মৌলবাদীদের হাতে পড়ে আমূল বদলে যায়। সৌদির সেই পুরোনো মূলগত ভিত্তিতেই ফিরতে চান সলমন। এখনও সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট। কর্মস্থলে মহিলারা কোণঠাসা। বাড়ির বাইরে যেতে হলে পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে যেতে হয় মেয়েদের।

● **ভ্যাটিকানে আরও দু'টি রাফায়েলের হদিশ :**

কিংবদন্তি রেনেসাঁস শিল্পী রাফায়েলের আঁকা আরও দু'টি ছবির সন্ধান মিলল ভ্যাটিকানের দেওয়ালে। দু'টি স্ত্রীমূর্তি। একজন ন্যায়, অন্য জন বন্ধুত্বের প্রতীক। ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের যে বিশাল ঘরটি এখন 'হল অব কনস্ট্যান্টিন' নামে পরিচিত, সেটিরই দেওয়ালে বহু শতক ধরে ছবি দু'টি রয়েছে। কিন্তু কেউই বোঝেননি, এগুলো রাফায়েলের আঁকা।

শিল্প অনুরাগী ও বিশেষজ্ঞেরা বহুদিন ধরেই রাফায়েলের মৃত্যুর ঠিক আগে আঁকা কয়েকটি ছবির খোঁজ করে চলেছেন। ১৫০৮ সালে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস তরুণ রাফায়েলকে পোপের বাসভবন ভ্যাটিকানের তিনটি ঘরে আঁকার বরাত দিয়েছিলেন। এখন 'রাফায়েল রুম' নামে পরিচিত সেই ঘর তিনটির দেওয়াল ও ছাদ বেশ কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফ্রেস্কোতে ভরিয়ে দেন শিল্পী। তারপর ভ্যাটিকানের সব থেকে বড়ো ঘরটিতেও আঁকার পরিকল্পনা নেন। কিন্তু তার অল্প কিছুদিন পরেই, ১৫২০ সালে, মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মারা যান রাফায়েল। ১৫৫০ সালে আর এক রেনেসাঁস শিল্পী, স্থপতি ও শিল্প বিশেষজ্ঞ জর্জিও ভাসারি তাঁর লেখা একটি বইয়ে রাফায়েলের 'নতুন দু'টি ছবি'-র উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, ছবি দু'টি ফ্রেস্কো নয়, তেল রঙে এঁকেছিলেন রাফায়েল। এই 'তেল রং'-ই ধাঁধা খোলার 'ক্লু' হিসেবে কাজ করেছে।

কিছুদিন আগে 'হল অব কনস্ট্যান্টিন' সংস্কার শুরু হয়। তখনই ঘরের প্রতিটি ছবি ফের খুঁটিয়ে দেখা শুরু করেন বিশেষজ্ঞেরা। ব্যবহার করেন অত্যাধিনিক আল্ট্রা ভায়োলেট ও ইনফ্রা রেড ফোটোগ্রাফি পদ্ধতি। তখনই ধরা পড়ে, দু'টি ছবি ঘরের অন্য সব ছবির থেকে আলাদা। কারণ, সেগুলির মাধ্যম তেল রং। আরও বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ছবিতে তুলির টান ঠিক রাফায়েলেরই ধাঁচের। সর্বোপরি, ছবির তলায় কোনও খসড়া স্কেচ নেই। রাফায়েলের যেসব ছাত্র ঘরের বাকি সব ছবি এঁকেছেন, তাঁরা সব সময়ে প্রথমে খসড়া রেখাচিত্র এঁকে নিয়ে তার উপরে রং চাপিয়েছেন। কিন্তু রাফায়েল বা মাইকেল্যাঞ্জেলোর মতো অত্যন্ত দক্ষ ও বড়ো মাপের শিল্পীদের রং চাপানোর আগে খসড়া রেখাচিত্র করার কোনও দরকার হ'ত না।

ভ্যাটিকেনের প্রধান শিল্প সংস্কারক ফাবিও পিয়াচেন্তিনিও মনে করেন, ভ্যাটিকানের দেওয়ালে হয়তো এরকম আরও অনেক না-জানা সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু গবেষণা ও সংস্কারের জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থ ও বিশাল সময়। রাফায়েলের ছবি দু'টি-সহ 'হল অব কনস্ট্যান্টিন'-এর সংস্কার শেষ করতে লেগে যাবে আরও পাঁচ বছর। খরচ পড়বে ৩০ লক্ষ ডলার।

● **'মিসেস এশিয়া' পুরুলিয়ার রিঙ্কু ভকত :**

পুরুলিয়া টাউনের হুচুকপাড়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে রিঙ্কু ভকত এখন 'মিসেস এশিয়া'-র মুকুটধারী। ৪১ বছর বয়সে জীবনের প্রথম সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নামা অবশ্য মোটে কয়েক মাস আগে। সেনাবাহিনীর ডাক্তার, স্বামী নরেন্দ্রকুমার মধুকরের চাকরির সূত্রে হিমাচলের মান্ডিতে গিয়েই মোড় ঘুরল জীবনের। হঠাৎ খেয়ালে, 'মিসেস হিমাচলপ্রদেশ' প্রতিযোগিতায় ঢুকে ঢের কমবয়সি তন্বীদের ছাপিয়ে যান পুরুলিয়ার মেয়ে। এর পরে চল্লিশোর্ধ্ব মহিলাদের 'ক্লাসিক মিসেস ইন্ডিয়া' প্রতিযেগিতায় সামিল হন। নভেম্বরের শেষেই সাংহাইয়ে 'মিসেস এশিয়া'-র দৌড়। মালয়েশিয়ার একটি সংস্থার উদ্যোগে গত এক দশকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই প্রতিযোগিতা। সেখানে গিয়ে রিঙ্কু লড়েন 'মিসেস এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল পপুলারিটি'-র মুকুটের জন্যই।

প্রয়াণ

● **শ্রীরূপা বসু মুখোপাধ্যায় :**

জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন কোচ ও ক্যাপ্টেন শ্রীরূপা বসু মুখোপাধ্যায় প্রয়াত। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। গত ৩০ নভেম্বর কলকাতার বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোশিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার মেয়ে অমৃতা মুখোপাধ্যায় টেনিসে প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন।

ভারতের ক্রীড়া প্রশাসকের ভূমিকাতেও তাকে পাওয়া গিয়েছে। তিনি ছিলেন বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক। বাস্কেটবল ও হকিতেও জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে খেলেছেন। তার আমলে বাস্কেটবলে বাংলা জাতীয় চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। হকিতে ডাক পেয়েছিলেন জাতীয় শিবিরেও। মহিলা ক্রিকেটে ১৯৭৪ থেকে শুরু করে প্রথম ৬-টি জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলাকে নেতৃত্বে দিয়ে টানা ৫ বার চ্যাম্পিয়ন করার মূল কারিগর ছিলেন শ্রীরূপা বসুই। খেলা ছাড়ার পরও নানা ভূমিকায় মাঠের সঙ্গেই জড়িয়ে থেকেছেন শ্রীরূপা। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ ছিলেন। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান থাকাকালীন একসময় নানা খেলার ধারাভাষ্য দিয়েছেন। সাংবাদিকতায় পিএইচডি শ্রীরূপা বসু মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপকও ছিলেন।

● **আলি আবদুল্লা সালেহ :**

ইয়েমেনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লা সালেহ নিহত। হত্যার দায় নিয়েছে হুথি গোষ্ঠী। গত ৪ ডিসেম্বর সকালে ৭৫ বছর বয়সি প্রবীণ নেতার বাড়িতে বোমা ছুঁড়েছিল হুথি জঙ্গিরা, তাতেই নিহত হন সালেহ। ১৯৭৮-এ, ৩৬ বছর বয়সে প্রথমে উত্তর ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সালেহ। পরে ১৯৯০-এ দক্ষিণ ইয়েমেনের সঙ্গে উত্তর ইয়েমেন মিলে গেলে নতুন ইয়েমেনের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। গৃহযুদ্ধে দীর্ণ দেশটিতে দীর্ঘ ২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। ২০১২-তে গদিচ্যুত হওয়ার পরে এই হুথির সঙ্গেই হাত মিলিয়ে বিক্ষুব্ধদের দলে নাম লিখিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সম্প্রতি তার অবস্থানে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। এক বিবৃতি দিয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদ্রাব্বু মনসুর হাদিকে সমর্থন জানান তিনি।

● **কালাচাঁদ দরবেশ :**

বাংলার দরবেশি গানের কিংবদন্তি শিল্পী এবং সাধক কালাচাঁদ দরবেশ আর নেই। বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন অনেক দিন থেকেই। শেষ কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিলেন জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির বাড়িতেই। গত ৩ ডিসেম্বর, ৮৫ বছর বয়সে চলে গেলেন। অনেকের মতে, বাংলার দরবেশি গান তার শেষ শিল্পীকে হারাল।

১৯৩৪ সালে জন্ম। ধূপগুড়িরই এক স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন এক সময়। তার মধ্যেই চলেছে নিজস্ব সাধনা। সারা বাংলা তো বটেই, কালাচাঁদের গানে মোহিত হয়েছে দেশের নানা প্রান্ত। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স থেকে শুরু করে মরক্কো—অনেক দেশে আপ্যায়িত হয়েছেন, গান শুনিয়েছেন, শুনিয়েছেন দরবেশি দর্শনের কথা। ১৯৯০ সালে লন্ডনের ভারত মেলায় কালাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন জাকির হোসেন। সেঅনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অমিতাভ বচ্চন। ওই বছরই ব্রিটেনের গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে দরবেশি গান, দরবেশি জীবনযাপন এবং দর্শন নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ করেন তিনি। বক্তৃতাও দেন। এর কিছু দিন আগে কালাচাঁদ কাজ করেছেন রবিশঙ্করের সঙ্গেও।

পেয়েছেন বহু সম্মান। ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী তাকে নজরুল পুরস্কারে ভূষিত করেন। সহজিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২০১৩-তেই পান সহজিয়া সম্মান। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের 'গুরু শিষ্য পরম্পরা' প্রকল্পের অধীনে তিনি দরবেশি গানের গুরু হিসেবে মনোনীত হন। সহজিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০১০ সাল থেকে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্টিস্ট পেনশন স্কিমের অধীনে শিল্পী ভাতা পেয়েছেন। লোকসংস্কৃতি-আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ও কসমিক হারমোনি-র নিবেদনে তার দরবেশি গানের দু'টি অ্যালবাম বেরিয়েছিল।

বিবিধ

● **এয়ার পিউরিফায়ার বানিয়ে 'টাইম'-এর সেরার তালিকায় যোগী গোস্বামী :**

সাউথ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যোগী গোস্বামীর বানানো এয়ার পিউরিফায়ার যন্ত্রটি এবছর 'টাইম' ম্যাগাজিনের সেরা ২৫-টি

উদ্ভাবনের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। নয়ের দশকের মাঝামাঝি সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণার জন্য দিল্লি থেকে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেন যোগী। যোগ দেন সাউথ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমেরিকাতেই জন্ম হয় তার ছেলে দিলীপ আর মেয়ে জয়ার। বাতাসে ভেসে ও মিশে থাকা ক্ষুদ্রতম জীবাণুদেরও নির্মূল করার এয়ার পিউরিফায়ার উদ্ভাবনের উৎসাহটা যোগী পেয়েছিলেন তার ছেলে দিলীপের শারীরিক অবস্থা দেখে। দিলীপ জন্ম থেকেই অ্যাজমার রোগী। ছোটোবেলা থেকেই শ্বাসকষ্ট দিলীপের নিত্যসঙ্গী। তাই বাতাসের বিষ নাশের চেষ্টায় মরিয়া চেষ্টা শুরু হয় দিল্লি কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (অধুনা দিল্লি টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটি) স্নাতক যোগী গোস্বামীর। টানা ২০ বছরের গবেষণার পর অত্যাধুনিক এয়ার পিউরিফায়ার বানিয়ে ফেলেছেন যোগী। যার নাম , 'মলিকিউল'। তা বাতাসে ভেসে ও মিশে থাকা ক্ষুদ্রতম জীবাণুদের শরীর ভেঙেচুরে দিয়ে তাদের নির্মূল করতে পারে। 'টাইম' ম্যাগাজিন জানাচ্ছে, এটাই বিশ্বের প্রথম কোনও এয়ার পিউরিফায়ার যা বাতাসকে পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করতে পারে।

বাজারে চালু এয়ার পিউরিফায়ারগুলিতে যে 'হাই এফিশিয়েন্সি পার্টিকুলেট অ্যাবজর্ভার' (এইচইপিএ বা 'হেপা') ফিল্টার রয়েছে, তা বাতাসে মিশে থাকা ক্ষুদ্রতম ও অত্যন্ত ক্ষতিকর জীবাণুগুলিকে টেনে নিতে পারে না। আর প্রশ্বাসের সঙ্গে সেগুলি আমাদের শরীরে ঢুকে বিপদ ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া বা বড়ো চেহারার জীবাণুগুলিকে ওই এয়ার পিউরিফায়ার বাতাস থেকে টেনে নিতে পারলেও তারা ওই ফিল্টারের ওপরের তলেই লেগে থাকে। পরে সেখান থেকে তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি বা মিউটেশন হয়। তারপর আবার তারা বাতাসে মিশে যায়, ছড়িয়ে পড়ে।

● **অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে জনসমাগমে বিশ্ব রেকর্ড :**

বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ রোজ কোন জায়গায় যান? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গত কয়েক মাস ধরে সমীক্ষা চালায় 'ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস'। সমীক্ষা শেষে তথ্য উঠে এল, প্রতিদিন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের পা পড়ে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ মানুষ আসেন এখানে। এই কারণেই 'ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস'-এ নাম উঠে গেল স্বর্ণমন্দিরের।

গত ২৪ নভেম্বর অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের মুখ্য সচিব রূপ সিং-এর হাতে এর স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার তুলে দেন লন্ডনভিত্তিক ওই সংস্থাটির ভারতীয় শাখার প্রেসিডেন্ট সুরভি ক'ল। তিনি জানান, তাদের সংস্থা প্রতি তিন মাস অন্তর এই সমীক্ষা চালায়। গত সেপ্টেম্বরের সমীক্ষায় অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের নাম উঠে এসেছে। স্বর্ণমন্দির ছাড়াও ভারত থেকে বৈষ্ণোদেবী আগেই এই পুরস্কার পেয়েছে। ইতোমধ্যেই স্বর্ণমন্দির ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেয়েছে।

ওয়াঘা সীমান্ত ঘেঁষা শিখদের তীর্থভূমি অমৃতসর। পঞ্চম গুরু অর্জুন ১৬০১ সালে গড়ে তোলেন আয়তাকার সরোবরের মাঝে এই মন্দির। জনশ্রুতি, এই সরোবরের জল অমৃতের মতোই শুদ্ধ, তাই শহরের নাম চক রামদাসপুর থেকে বদলে হয় অমৃতসর। ১৬৬১ সালে আহম্মদ শাহ দুরানি শিখদের পবিত্র এই মন্দিরটি ধ্বংস করেন। ১৭৬৪ সালে মন্দিরটি ফের নতুন করে গড়ে তোলা হয়। ঊনবিংশ শতকে রণজিৎ সিং-এর উদ্যোগে মন্দিরটি পুনরায় সংস্কার করা হয়। এই সময়েই মন্দিরের উপরিভাগ সোনায় মুড়ে দেন রণজিৎ সিং। তাই নাম বদলে হয় স্বর্ণমন্দির।

● **হায়দ্রাবাদে মেট্রো উদ্বোধন :**

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মেট্রো রেল পেল হায়দ্রাবাদ। গত ২৮ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শহরের প্রথম মেট্রো সফরে ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাও। প্রথম দফায় প্রায় ৩০ কিলোমিটার জুড়ে চলবে মেট্রো। শহরের মিয়াপুর থেকে নাগোল পর্যন্ত মোট ২৪-টি স্টেশন থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৭ লক্ষ যাত্রী এই পরিষেবার নাগাল পাবেন। আপাতত সকাল ৬-টা থেকে রাত ১০-টা পর্যন্ত চললেও ভবিষ্যতে যাত্রী চাহিদা অনুযায়ী এর সময় বাড়ানো হবে। প্রাথমিকভাবে মেট্রোর টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ১০-৬০ টাকা। ২০১২ সালের জুলাইয়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। চলতি বছরের জুনে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও জমি-জটে তা আটকে প্রকল্পের কাজ শেষ হতে দেরি হয়। পিপিপি মডেলে তৈরি এই প্রকল্পের প্রথম দফায় মোট খরচ হয়েছে ১৪ হাজার ১৩২ কোটি টাকা।

● **শীতলপাটিকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' ঘোষণা ইউনেস্কোর :**

বাংলাদেশের শীতলপাটি বয়ন পদ্ধতিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান দিল ইউনেস্কো। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই সংস্থা তাদের ওয়েবসাইটে এই ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শন এই শীতলপাটি। সবচেয়ে সূক্ষ্ম নকশাদার পাটি বোনা হয় বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে। দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের শীতলপাটিকে 'ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ'-এর স্বীকৃতি দেওয়ার পরে সিলেটের দুই প্রসিদ্ধ পাটিয়াল গীতেশচন্দ্র দাস ও হরেন্দ্রকুমার দাস তাদের হাতে বোনা কয়েকটি পাটি নানাদেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদের দেখান। এর আগে বাংলাদেশের বাউল গান, নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা ও জামদানি শাড়িকেও এই স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো।

প্লাস্টিকের সস্তা মাদুর ঐতিহ্যশালী এই শীতলপাটির বাজার অনেকটা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু বেত থেকে তৈরি হওয়ায় এই শীতলপাটি অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। বরিশাল ও চট্টগ্রামের নানা জায়গায় এই বেত জন্মালেও নকশাদার পাটি বোনা হয় মূলত সিলেটের শ'খানেক গ্রামে। নোয়াখালি, পাবনা ও সিরাজগঞ্জেও বেশ কিছু পাটিয়াল রয়েছেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নুর আনুষ্ঠানিকভাবে শীতলপাটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি ঘোষণা করেন।

● **রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখতে ইন্দোর পুরসভার অভিনব পন্থা :**

যেখানে-সেখানে পানের পিক, থুতু ফেলা বন্ধ করতে অভিনব পন্থা নিয়েছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর পুরসভা। ধরা পড়লে আর্থিক জরিমানা তো হবেই, সেই সঙ্গে ছবি ছাপা হবে খবরের কাগজে। রেডিওতেও নাম ঘোষণা করা হবে। দোষীদের ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর ইন্দোর। 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে গত কয়েক বছর ধরেই কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ' সমীক্ষা চালায় দেশের ৪৩৪-টি শহরে। পরিচ্ছন্নতার নিরিখে শহরগুলির র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়। চলতি বছর দেশের সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ইন্দোর।

সেই স্বীকৃতি ভবিষ্যতেও ধরে রাখতে অভিনব এই পন্থা ভেবেছে ইন্দোর পুরসভা। শহর পরিচ্ছন্নতায় এগিয়ে থাকলেও, নাগরিকদের এক অংশের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতার অভ্যাস এখনও রয়ে গিয়েছে রাস্তাঘাটে থুতু ফেলাটা একটা বড়ো সমস্যা। ২৫ ডিসেম্বর থেকে এই অভিযান চালাচ্ছে ইন্দোর পুরসভা।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

৪৮-তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

গত ২০ থেকে ৩০ নভেম্বর ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (International Film Festival of India বা IFFI)-এর ৪৮-তম আসর বসে গোয়ায়। এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় দেশি-বিদেশি সিনেমার এই মহাযজ্ঞের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তথা বস্ত্র মন্ত্রকের মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি বলেন, ভারত উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রগতিশীল যুবসমাজ ও গল্পকাহিনীর দেশ, এমন এক দেশ যেখানে ১৬০০ উপভাষায় এই সব গল্পকাহিনী শোনা যায়। তিনি বলেন, এই মঞ্চ চলচ্চিত্রপ্রেমীদের ভারতীয় চলচ্চিত্র দুনিয়ার উজ্জ্বলতম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ করে দেয়। প্রসঙ্গত, এবারই প্রথম আমজনতার জন্য খুলে দেওয়া হয় গোয়ার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দরজা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মিলিয়ে মোট ১৯৫-টি ছবি হয় প্রদর্শিত হয় ২০১৭ সালের এই চলচ্চিত্র উৎসবে। এর মধ্যে ছিল ১০-টির 'ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার', ১০-টির এশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার, এবং ৬৪-টিরও বেশি ভারতীয় ছবির প্রিমিয়ার হল এবারের উৎসবে। বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবছরের 'ইন্ডিয়ান ফিল্ম পার্সোনালিটি অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার। ২০১৭ সালে প্রয়াত অভিনেতা ওম পুরি, বিনোদ খান্না, টম অল্টার, রিমা লাগু, জয়ললিতা; নির্দেশক আব্দুল মাজিদ, কুন্দন শাহ্, দসরি নারায়ণ রাও এবং সিনেমাটোগ্রাফার রামানন্দ সেনগুপ্তের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

এদেশে প্রথম বার IFFI ২০১৭-র মঞ্চে জেমস বন্ডের বাছাই করা কয়েকটি ছবি প্রদর্শনের জন্য আলাদা একটি বিশেষ বিভাগ তৈরি করা হয়। টোরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সহযোগিতায় এবারের IFFI-তে কানাডার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপরও বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

IFFI, ২০১৭-র বিদেশি ছবির প্রতিযোগিতা বিভাগে Golden Peacok (সোনালি ময়ূর) ও Silver Peacock (রুপোলি ময়ূর) সম্মানের জন্য ১৫-টি ছবির নাম নথিভুক্ত হয়। ফরাসি পরিচালক রবিন ক্যাম্পিলো (জন্ম মরোক্কোতে) নির্দেশিত '120 Beats Per Minute' (সংক্ষেপে '120BPM') ছবিটি Golden Peacock শিরোপায় ভূষিত হয়। এছবির বিষয়বস্তু গত শতকের নব্বইয়ের

দশকে ফ্রান্সে সমকামিতার বাড়াবাড়ি ও এইড্স মহামারী। চিনা সিনেমার নির্দেশক ভিভিয়ান ক্যু তার 'Angels Wear White' ছবিটির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার জিতে নেন। চিনের কোনও উপকূলবর্তী শহরে এক মাঝবয়সি পুরুষের হাতে দুই কিশোরীর লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের গল্পকে ঘিরেই এগিয়েছে এই সিনেমা।

'120BPM' ছবিটিতে এইড্স মহামারীর ভয়াবহতার সমস্ত দিক রুপোলি পর্দায় জীবন্তভাবে তুলে ধরে ACT UP-এর সক্রিয় সদস্য তথা এইড্স অ্যাক্টিভিস্ট শ'ন ডাল্মাজোর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়ের দৌলতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার শিরোপা জিতে নেন নায়ুল পেরেজ বিস্কারিয়াৎ। মহেশ নারায়ণের মালায়ালাম ছবি 'Take Off'। এতে পার্বতী টি.কে. একজন নার্সের চরিত্রে অভিনয় করেন, যে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর কবল থেকে নিজের স্বামীকে মুক্ত করানোর জন্য সংঘর্ষ চালায়। এই ছবিতে অভিনয়ের জন্যই তাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত করা হয়। উল্লেখ্য, এই ছবিতেই পরিচালক হিসেবে হাতেখড়ি হয় মহশে নারায়ণের। তিকরিটে আটক ভারতীয়দের নাটকীয় উদ্ধার অভিযান নিয়ে তৈরি এই ছবির জন্য উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কারে ভূষিত হন নবীন এই পরিচালক। শ্রেষ্ঠ ফিচার ফিল্মের নির্দেশক হিসাবে Silver Peacock পুরস্কার জিতে নেন বলভিয়ার পরিচালক কিরো রুসো। রুসো তার নির্দেশিত প্রথম ছবি 'Dark Skull'-এর জন্য এই সম্মান পান। ICFT-UNESCO Gandhi Medal পায় মনোজ কদমের মারাঠি ছবি 'ক্ষিতিজ'। 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' পান কানাডার অন্যতম নামী শিল্প নির্দেশক অ্যাটম ইগোয়ান।❑

WBCS - 2018 মেনস্

হার্ড ওয়ার্ক নয়, দরকার স্মার্ট ওয়ার্ক

জানুয়ারীর শেষে সম্ভবত চুকে যাচ্ছে প্রিলির পালা। তার কয়েকমাস পর মেনস্। প্রিলির মতো ২০০ নয়, এখানে প্রস্তুতি নিতে হবে ১২০০ বা ১৬০০ নম্বরের জন্য। সুতরাং অগোছালোভাবে পড়াশুনা করলে চলবে না। প্রস্তুতি নিতে হবে স্ট্র্যাটেজীক্যালি। কঠোর পরিশ্রম বা হার্ড ওয়ার্কের সঠিক বিকল্প হতে পারে স্মার্ট ওয়ার্ক। কিভাবে তা সম্ভব – সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সামিম সরকার।

প্রিলি আদতে ছাটাই পর্ব। লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে থেকে কেটে ছেঁটে হাজার চারেক প্রার্থী ছাড়পত্র পায় মেনসে বসার। প্রিলিতে প্রাপ্ত নম্বর ক্যারি ফরোয়ার্ড হয় না, তাই প্রিলিতে শুধুমাত্র পাশ মার্ক পেলেই চলে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আসল লড়াই হয় মেনসে। মেনস হল প্রকৃত পক্ষে বাছাই পর্ব। এখানে এক নম্বরের ভগ্নাংশে নির্ধারিত হয় প্রার্থীর সাফল্য-ব্যর্থতা। WBCS অফিসার হওয়ার বাসনা থাকলে মেনস পরীক্ষাতেই নিশ্চিত করে নিতে হবে চাকরিটিকে। কেননা, ইন্টারভিউয়ের জন্য কিছু ফেলে রাখা উচিত হবে না। ইন্টারভিউ বড়ই আনপ্রেডিক্টেবল, সামান্য দশ পনের মিনিটে কিছু ভুলচুকের মূল্য দিতে হতে পারে সারা জীবন ধরে।

ডব্লুবিসিএস মেনস্-এর ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে

মেনস ১৬০০ (C এবং D এর ক্ষেত্রে ১২০০) নম্বরের ম্যারাথনপরীক্ষা। কোন একটি পেপার খারাপ হয়ে গেলে শুধরে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় পাওয়া যায়, ইন্টারভিউয়ে যার স্কোপ একেবারেই নেই।

WBCS - এ নিজের প্রথম পছন্দের চাকরিটি পাওয়ার পূর্বশর্ত হল মেনসে সর্বাধিক নম্বর তুলে নেওয়া। তা করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সঠিক এবং যথাযথ একটি প্ল্যানিং বা স্ট্র্যাটেজী তৈরী করা। তারপর প্রয়োজন ওই স্ট্র্যাটেজীকে নিখুঁত ভাবে কাজে লাগানো। সঠিক পরিকল্পনা এবং তার যথার্থ রূপায়নের মাধ্যমেই আসতে পারে কাঙ্খিত সাফল্য। স্ট্র্যাটেজী বা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মেনসের সিলেবাসটিকে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল, কম্পালসরি পেপারগুলির সিলেবাসের উল্লেখ থাকে নামমাত্র যার দ্বারা একটি ফিজিবল স্ট্র্যাটেজী তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ এর প্রশ্নপত্র গুলিকে নিয়ে কাঁটাছেড়া করতে হবে, করতে হবে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ। প্রশ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করে সিলেবাসের একটি রূপরেখা তৈরী করতে হবে। সেই মতো নিতে হবে প্রস্তুতি। এরপর আসছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি— তোমার দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতিকে সর্বোত্তমভাবে পরীক্ষার খাতায় নামিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে তোমার প্রতিনিধি হিসাবে PSC -র কাছে যাবে A4 সাইজের একটি OMR শীট। সুতরাং নিজের প্রস্তুতিকে ম্যাক্সিমাম নম্বরে কনভার্ট করার একমাত্র মাধ্যম হল OMR শীট। বহু পরীক্ষার্থী শুধু পড়েই যায় দিন রাত এক করে। কিন্তু মকটেস্ট বা মহড়া পরীক্ষা দেয় না। খ্যাতনামা অভিনেতা, খেলোয়াড় কিংবা শিল্পী সকলেই নিয়মিত অনুশীলন বা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকেন, তবেই আসল মঞ্চে চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স করতে পারেন। কিন্তু আমরা, WBCS পরীক্ষার্থীরা, কি করে ভেবে নিই যে কোন অনুশীলন বা মকটেস্ট ছাড়া PSC -র আসল পরীক্ষায় বাজিমাত করবো। এটি চূড়ান্ত মূর্খামীরই নামান্তর। সুতরাং শুধু ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে গেলেই চলবে না, দরকার নিয়মিত মকটেস্ট দেওয়া। মকটেস্ট গুলি অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড এবং লেটেস্ট হবে। এ ধরনের মকটেস্ট একমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনেই নেওয়া হয়। সাফল্যের জন্য নিয়মিত WBCS অফিসারদের সাথে পরামর্শ করা দরকার, তাদের নির্ধারিত পন্থায় প্রস্তুতি নিতে পারলে সাফল্য সহজসাধ্য হয়। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এমন এক সংস্থা যেখানে ক্লাস নেন মূলত সদ্য পাশ করা ব্রিলিয়ান্ট WBCS টপাররা। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম ১০ এর মধ্যে থাকা WBCS অফিসারদের গাইডেন্স একমাত্র এখানেই পাওয়া যায়। নোটস্, ক্লাস টেস্ট, মকটেস্ট তৈরী করেন সুতপা কর ম্যাডাম। সুতরাং একদিকে ভীষণ ভালো ক্লাসরুম গাইডেন্স এবং অপরদিকে উন্নত মানের নোটস ও মক টেস্টের যুগপৎ মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে। এখন শুধু প্রয়োজন তোমাদের পরিশ্রম। হার্ড ওয়ার্ক নয়, স্মার্ট ওয়ার্ক। বাকিটুকু নির্দ্বিধায় অ্যাকাডেমিকের হাতে অর্পণ করতে পারো।

সামিম সরকারের

মিসলেনিয়াস স্ক্যানার এন্ড প্র্যাকটিস সেট

- বিগত বছরের (২০০০-২০১৩) প্রশ্নের বিষয়ভিত্তিক সংকলন ও সমাধান
- ১৫টি প্র্যাকটিস সেট (ব্যাখ্যা ও সমাধানসহ)
- বিভিন্ন পরীক্ষায় আগত ৮০০+ জিকে প্রশ্নোত্তর
- সমাধান সহ প্রচুর পাটিগণিত
- বিগত বছরের প্রশ্নের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস
- ৫০০+ জিকের মডেল প্রশ্নোত্তর
- ৭০০+ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এম.সি.কিউ

প্রকাশ তারিখ ঃ ২৬শে জানুয়ারী, ২০১৮

৯০৩৮৭৮৬০০০/৮৫৯৯৫৫৬৩৩

Practice Set for WBCS Mains-2018

Academic TEST SERIES FOR MAINS

- Practice Set with Answer & Explanation
- Model Set on English & Bengali with Answer
- Suggestive MCQ on S & T and EVS
- Current Affairs Update for Mains-2018
- 700+ Current Affairs MCQ
- Strategy for Success by WBCS Toppers

To be published on : 27th April 2018

৮৫৯৯৫৫৬৩৩, ৯০৩৮৭৮৬০০০

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ৯০৩৮৭৮৬০০০ ৯৬৭৪৭৮৬০০ ৯৬৭৪৭৮৬৪৪

H.O : The Self Culture Institute 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in ■ Centre: Uluberia-9051392240 ✹ Barasat-9073587432 ✹ Berhampur-9474582569 ✹ Birati-9674447451 ✹ Medinipur-9474736230 ✹ Darjeeling-9832041123 ✹ Siliguri-9474764635

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

January, 2018
R.N.I. No. 19740/69

আমাদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

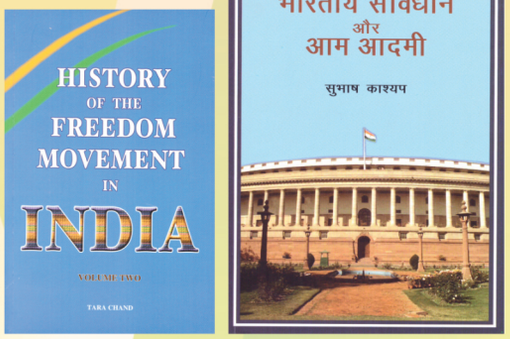

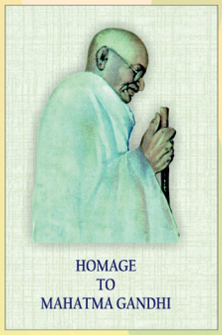

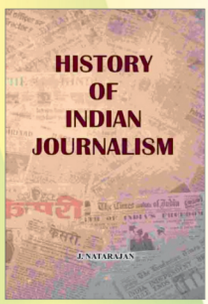

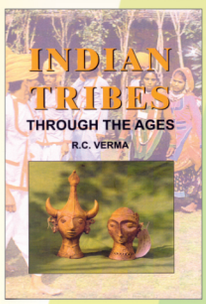

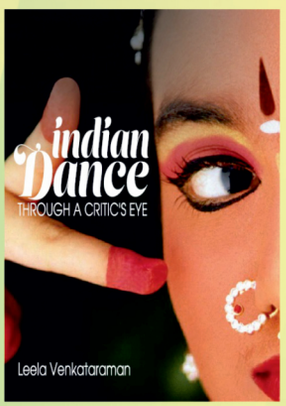

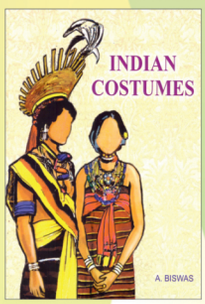

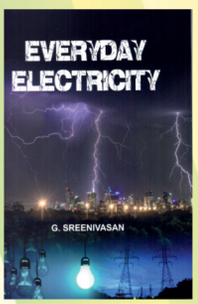

বিক্রয়কেন্দ্র :
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০০৬৯
(এসপ্ল্যানেড পোস্ট
অফিসের পাশে)

অনলাইনে কিনুন **www.bharatkosh.gov.in** থেকে

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-৮০৩০/৬৬৯৬/২৫৭৬ ই-মেল : **kolkatase.dpd@gmail.com**

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার
সূচনা ভবন, সি. জি. ও. কমপ্লেক্স, লোধি রোড, নয়া দিল্লি-১১০০০৩
ওয়েবসাইট : **www.publicationsdivision.nic.in**
@DPD_India **www.facebook.com/KolkataPublicationsDivsion**

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮,এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।